মানিক সাহিত্য সমীক্ষা

কেন লিখি

কথা জানানো
ই আমি লিখি।
এ বিষয়ে কোন
স প্রশ্নের জবাবও এই।
অভিজ্ঞতা। ছেলেবেলা
র চেয়ে বেশি। প্রতিভা
জে। আত্মজ্ঞানের অভাব
নিরাপত্তার জন্য প্রতিভাবানেরা
সিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও
প্রক্রিয়াটির চাপ ও তীব্রতা সহ্য
গুলি বিশ্লেষণযোগ্য বোধগম্য কারণে
বা কমে। আড়াই বছর বয়স থেকে
ইতিহাস আমি মোটামুটি জেনেছি।ও
ক ও অন্য দশটা ঝোঁকের মতোই। অঙ্ক শেখা,
শেষ স্থানে খোঁজা, খেলতে শেখা, গান গাওয়া,
ইত্যাদির দলেই লিখতে চাওয়া। লিখতে পারা
তে চাওয়ার উগ্রতা আর লিখতে শেখার একাগ্রতার
নির্ভর করে। বক্তব্যের সঞ্চয় থাকা যে দরকার সেটা
বলাই বাহুল্য, বক্তব্য উপলব্ধির চাপ ছাড়া লিখতে
ওয়ার উগ্রতা কিসে আনবে।

নারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত

মানিক-সাহিত্য সমীক্ষা

নারায়ণ চৌধুরী
সম্পাদিত



পুস্তক বিপণি ॥ ২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক :
শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
জুন ১৯৪১

প্রচ্ছদ :
শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
এস. পি. প্রসেস
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীমতী রেখা দে
শ্রীহরি প্রিণ্টার্স
১২২/৩ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৪

সম্পাদকের নিবেদন

'মানিক-সাহিত্য সমীক্ষা' প্রকাশিত হলো। এতে সমসাময়িক বাংলার এগারো জন বিশিষ্ট লেখক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বাস্তববাদী কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সৃষ্টি সম্বন্ধে নানামুখী আলোচনা করেছেন। আলোচনার ধারার ভিতর সংশ্লিষ্ট লেখকদের প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা ও সমাজমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গী সুপরিস্ফুট। সুবিজ্ঞ লেখকগণ বিভিন্ন দিক্ থেকে মানিক সাহিত্যের উপর আলোকপাত করেছেন, সেই সঙ্গে কারও কারও রচনায় মানিকের জীবন ও ব্যক্তিসত্তার দিকটিও অনালোচিত থাকেনি। আবার সামগ্রিক ভাবে যেমন আলোচনা আছে, তেমনি দুটি প্রসিদ্ধ উপন্যাস ('পুতুলনাচের-ইতিকথা' ও 'পদ্মানদীর মাঝি') এবং ছোটগল্পগুলির মূল্যায়ন-মূলক অনুপুঙ্খ আলোচনাও এই সংকলনের একটি বিশেষ আকর্ষণ। মুখ্যতঃ কথাশিল্পী রূপে পরিচিত ও ক্রিয়াশীল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা ও প্রবন্ধ রচনার পরিমাণ তুলনায় অনেক কম হলেও সেগুলির অনন্যতা লক্ষ্য না করে পারা যায় না। কবিতায় কল্পনার স্বাতন্ত্র্য এবং প্রবন্ধে বক্তব্যের মৌলিকতা স্পষ্টতই মানিককে এই দুই খাতে আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। সুতরাং প্রত্যাশিতভাবেই মানিকের কবিতা ও প্রবন্ধও এই সংকলনের আলোচনার বিষয়ীভূত হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাশিল্পের সর্ববাদীসম্মত কুললক্ষণ হলো—বাস্তবতা। সে বাস্তবতাও আবার একটা বিশেষ গুণে বিশেষিত—সমাজ-বাস্তবতা। পূর্ববর্তী বাস্তবতার ধারার লেখক শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতি-ভূষণ, জগদীশ-শৈলজানন্দ-অচিন্ত্য-প্রেমেন্দ্র-মনোজ-প্রবোধকুমার প্রমুখের রচনার সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করলে দেখা যায় মানিক এঁদের অনুশীলিত Critical Realism-এর স্তর পেরিয়ে তাঁর শিল্পদৃষ্টিকে অনেক দূর সম্প্রসারিত করে যাকে বলে Socialist Realism বা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা, তার বৃত্তসীমার মধ্যে এসে প্রবেশ করেছেন। ফলে পূর্বোক্ত লেখকদের সঙ্গে মানিকের রচনার বিষয়বস্তুর ভিন্নতাই শুধু প্রকাশ পায়নি, লক্ষ্যের ভিন্নতাও প্রকাশ পেয়েছে। পূর্বোক্ত লেখকরা সকলেই বাস্তবতার চর্চাকারী হলেও বর্তমানের প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে ভেঙে-গুঁড়িয়ে তার জায়গায়

নতুন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনের কথা বলেননি। কিন্তু মানিক-সাহিত্যে এই প্রয়োজনের গুরুত্বের বোধ সুস্পষ্টরূপে উচ্চারিত। তিনি শুধু বর্তমান সমাজকে বিশ্লেষণই করেন না, তাঁর দায়বদ্ধতা স্বীকার করে তাকে বদলাবারও মন্ত্রণা দেন।

Critical Realism বলতে বাংলায় ঠিক কী প্রতিশব্দ ব্যবহার করা যায় সহসা তার আন্দাজ মেলে না। তাকে 'মানবতাবাদী বাস্তবতা' বললে বোধ হয় ওই শব্দের অর্থের অনেকটা কাছাকাছি জায়গায় পৌঁছানো যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানবতাবাদী ছিলেন নিঃসন্দেহে, তবে তাঁর মানবতাবাদের জাত আলাদা। বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী সমাজের গণ্ডীর মধ্যে সচরাচর যে-ধরনের মানবতাবাদের চর্চা করা হয়—একাধিক প্রচলিত মূল্যবোধকে বাঁচিয়ে রেখে তথা বহুতর গতানুগতিক অভ্যাস ও বিশ্বাসের হাতে-ধরা হয়ে চলে একজাতীয় উদার অথচ নিরাপদ মানবিকতার অনুশীলন, তেমন মানবিকতা থেকে মানিক বহুদূরে অবস্থিত ছিলেন। তাঁর সুতীক্ষ্ণ সমাজচিন্তার বেষ্টনীর মধ্যে প্রচলিত মূল্যবোধ কিংবা গতানুগতিক অভ্যাসের কোন স্থান ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে-মধ্যবিত্ত মানসিকতা আমাদের বাঙালী শিক্ষিত ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের বড়ই আদরের জিনিস, তার কক্ষপুটে লালিত প্রায় প্রতিটি মূল্যবোধকেই তিনি তাঁর লেখায় আঘাত করেছেন। মধ্যবিত্ত সমাজের আচরিত অভ্যাসগুলিকে অশ্রদ্ধেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। পক্ষান্তরে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর মানুষদের সংগ্রামী জীবনের আদর্শকে সুযোগ পেলেই অভিনন্দিত করেছেন। বিশেষতঃ তাঁর শেষের দিকের লেখায় এই ভাবটি খুবই প্রবল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কথা-সাহিত্যের কুহরে কুহরে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, বিদ্রোহ ও বিপ্লবের বার্তা পূরে দিয়েছেন; তার পঞ্জরে পঞ্জরে বইয়ে দিয়েছেন শোষণ ও অত্যাচার থেকে মুক্তির প্রাণকাড়া বাতাস। তথাকথিত মানবতাবাদী বাস্তবতার সাধ্য নয় এ-জাতীয় তির্যক্, বলিষ্ঠ সমাজ বাস্তবতার নাগাল ধরতে পারে। মানবিকতা উদার আর মহানুভব হওয়াই যথেষ্ট নয়; একই সঙ্গে তা প্রতিরোধী হওয়াও দরকার। এই সুরটিই বোধ হয় উত্তরকালীন মানিক-সাহিত্যের মূল সুর।

সংকলিত প্রবন্ধগুলিতে সর্বত্রই যে মানিক-মূল্যায়নে একই বা অনুরূপ দৃষ্টিকোণের প্রতিফলন ঘটেছে এরূপ মনে করা ঠিক হবে না। মতভেদের প্রতিফলনও লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণতঃ কথাশিল্পী হিসাবে মানিক উত্তর জীবনেও ফ্রয়েডীয় প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পেরেছিলেন কিনা এই

প্রশ্নে কারও কারও লেখায় মতদ্বৈধ দেখা যায়। উত্তর জীবনে মানিক প্রকাশ্যেই মার্কসীয় চিন্তা-বিশ্বাসের বলয়ের মধ্যে আপনাকে ধরা দিয়েছিলেন এবং তাঁর লেখার ধাঁচ-ধরনও ওই পর্ব থেকে ওই নয়া বিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন আর ব্যবচ্ছেদধর্মী ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মবিশ্লেষণের অভ্যাসের অন্ধকার থেকে তিনি মার্কসীয় সমাজবিজ্ঞানসম্মত সমষ্টিজীবনের বহির্মুখ চেতনায় উত্তরিত হয়েছিলেন কিন্তু তবু বোধহয় আত্মনিবেশী মনোবিকলনের পেছুটান তিনি পুরাপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এই সন্দেহ কোন কোন প্রবন্ধকারের আলোচনায় স্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে—পাঠক সন্দেহটির গুণাগুণ স্বয়ং পরীক্ষা করে দেখবেন।

সংকলনের অন্তর্গত লেখকেরা সকলেই সম্পাদক ও প্রকাশকের আহ্বানে যথোচিত পরিমাণে সাড়া দিয়ে এই সংকলনটির পরিপুষ্টি সাধনে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছেন এবং লেখনীকে এই উদ্দেশ্যে নিজ নিজ লেখন কর্মে দ্রুত নিযুক্ত করেছেন। তাঁদের প্রত্যেককে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র অনুজপ্রতিম সুহৃৎ প্রীতিভাজন ডক্টর শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এই গ্রন্থের অন্যতম লেখকও বটেন, সম্পাদকীয় সহযোগীও বটেন—গ্রন্থের পরিকল্পনার প্রথম ধাপ থেকে মুদ্রণের শেষ ধাপ পর্যন্ত তিনি সম্পাদকের কাজের সঙ্গে সহায়ক রূপে যুক্ত থেকে তাঁর শ্রম লাঘবের কারণ হয়েছেন। পুস্তক বিপণির নবীন প্রকাশক শ্রীমান্ অনুপকুমার মাহিন্দারের উৎসাহ ও আগ্রহ এবং কর্মিষ্ঠতাও এই উপলক্ষ্যে প্রীতির সঙ্গে স্মরণ করি। বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন সুপরিচিত চিত্রশিল্পী শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে গভীর প্রীতির সম্পর্ক মনে রাখলে তাঁকে আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ জানানো বাহুল্য মনে করি।

যে-উদ্দেশ্যে এই বইখানির প্রচার—বাঙালী পাঠক সমাজে মানিক-সাহিত্যের অসামান্যতার ধারণার সঞ্চার এবং মানিক-সাহিত্যের গভীরে প্রবেশ-ইচ্ছুক জিজ্ঞাসুদের হাতে তাকে বোঝবার একটি চাবিকাঠি তুলে দেওয়া—, এই উদ্দেশ্য জয়যুক্ত হলে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করবো।

সূচীপত্র

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও শিল্প

সরোজমোহন মিত্র

মাত্র আটচল্লিশ বছরের জীবন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কিছুতেই তাকে দীর্ঘ বলা যায় না। ১৯শে মে, ১৯০৮ (৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ) থেকে ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৫৬ (১৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩) এই ত মানিকের জীবন পরিধি।

সাঁওতাল পরগণার দুমকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। তাঁর পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সেটেল্‌মেণ্ট বিভাগের কানুনগো। এই দুমকা সহরে তিনি চাকরী সূত্রে দীর্ঘ এগারো বছর বাস করেন।

তাঁদের পৈত্রিক নিবাস ছিল ঢাকা বিক্রমপুরের মালপজিয়া গ্রাম। তার পূর্বে তাঁদের আদি নিবাস ছিল ঢাকা বিক্রমপুরের সিমুলিয়া গ্রাম। হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতামহ করুণাচন্দ্র তাঁর মাতুলালয় মালপজিয়া গ্রামে লালিত পালিত হন এবং সেখানেই আজীবন বসবাস করেন। সেই সূত্রেই মালপজিয়া মানিকের পৈতৃক নিবাস।

যাজনিক ক্রিয়া ছিল হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পারিবারিক বৃত্তি। বাল্যকালে হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়কেও পুরোহিতগিরি করতে হয়েছিল। তারপর নানা অর্থকষ্ট এবং দারিদ্র্যের মধ্যেও তিনিই প্রথম কেবল ঐ গ্রামে নয় আশেপাশে গ্রামের মধ্যেও প্রথম বি. এ. পাশ করেন ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর কিছুদিন কোলকাতায় শিক্ষকতার অবশেষে বদলির চাকরি। এই পাশ করার মধ্য দিয়ে হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক গ্রামবাংলার সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেল। ঔপনিবেশিক শিক্ষাপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত শহুরে ভদ্রলোক শ্রেণীতে তিনি উন্নীত হলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যে।

মাতার নাম ছিল নীরদাসুন্দরী দেবী। মানিকের মাতুলালয় ছিল মালপজিয়ার অনতিদূরে গাওদিয়া গ্রামে। হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তান সন্ততির সংখ্যা ছিল অনেক—চৌদ্দজন। আটটি পুত্র এবং ছয়টি কন্যা। মানিক ছিলেন হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পঞ্চম পুত্র।

মানিকের ভালো নাম ছিল প্রবোধকুমার। "কিন্তু বোধ হয় তার গায়ের উজ্জ্বল কালো রং ও সুন্দর মুখশ্রী দেখেই সেই যে আঁতুড় থেকেই তার নামকরণ হল কালোমানিক—সেই মানিক নামটিই রয়ে গেল আজীবন।" সেও এক আকস্মিকের ধাক্কা। বন্ধুদের সঙ্গে বাজী রেখে গল্প লিখে পত্রিকায় দিয়ে এলেন প্রকাশের জন্য। ভাবলেন, এক উচ্ছ্বাসময় গল্প, নিছক পাঠকের মন ভুলান গল্প, এতে নিজের নাম দেবেন না। পরে যখন নিজের নামে ভাল লেখা লিখবেন তখন এই গল্পের কথা তুলে লোকে নিন্দা করবে। এই ভেবে বন্ধু ক'জনকে জানিয়ে, গল্পে দিলেন তাঁর ডাক নাম—মানিক। কিন্তু এই পাঠকের মন ভুলান গল্পই মানিককে এত প্রশংসা এনে দিল যে পরে আর নিজের ভাল লাগা গল্প লেখাই হোল না। মানিক নামটাই খ্যাত হয়ে রইল। এই গল্পটির নাম 'অতসীমামী'।

মানিক শিশুকাল থেকেই ছিলেন অতিমাত্রায় দুরন্ত—'হাসিখুশি চঞ্চল—নির্ভীক প্রাণবন্ত শিশু।' হাঁটতে শেখার পর থেকেই এই দুরন্তপনার শুরু। তাঁর সর্বাঙ্গে চিরস্থায়ী হয়ে ছিল দুরন্তপনার চিহ্ন। দুরন্তপনার সঙ্গে আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল মানিক চরিত্রের, তা হোল অদ্ভুত জিদ এবং সহনশীলতা। ভয় ডর বলতে তিনি কিছু জানতেন না। ছোটবেলায় এই দুরন্তপনার জন্য তাঁকে শাস্তিভোগও কম করতে হয়নি। কিন্তু যত বয়স বাড়তে লাগল তিনি আরও জেদী এবং খেয়ালী হয়ে উঠলেন।

মানিকের পিতার ছিল বদলির চাকরি—ছ মাস বা দু এক বছর পরে পরেই তাঁকে এক মুল্লুক থেকে আর এক মুল্লুকে ছুটতে হোত। "হয়ত কুমিল্লা থেকে ময়মনসিংহ এবং সেখান থেকে একেবারে ঘাটাল অথবা মেদিনীপুরে।" ফলে মানিকের লেখাপড়াও কোথায়ও বাঁধাবাঁধি নিয়মে হয়নি। কখনো মহিষাদলে, কখনো টাঙ্গাইলে, কখনো ব্রাহ্মণ-বেড়িয়া। সমস্ত স্কুল জীবনটাই যেন ছন্নছাড়া। ক্লাসের পড়া খুব ভাল লাগত না। খেলায় ঝোঁক ছিল বেশী। মন মাঝে মাঝে দুর্দান্ত হয়ে উঠত। কখনো বা একা বসে বসে চিন্তা করতেন।

স্কুল জীবনের কথা বলতে গিয়ে মানিক পরবর্তীকালে লিখেছেন, "আমার স্বভাব ছিল ভারি মন্দ। একদিকে যেমন ভালবাসতাম লাল ধুলো-ভরা সহরের নোংরা পুরানো ঘিঞ্জি লোকালয়, মোটেই হিসাব থাকত না যে যাদের সঙ্গে মিলছি-মিশছি, খেলাধুলো হৈ চৈ করছি, তারা বয়সে বড় অথবা

ছোট, সংসারের মাপকাঠিতে ভদ্র অথবা ছোটলোক—তেমনি ভালবাসতাম সহরের আশেপাশে শুধু কয়েকটা কুঁড়েঘর নিয়ে গড়া ছোট-ছোট গ্রাম, বর্ষায় ভরা আর শীতের শুকনো নদী, ফাঁকা মাঠ আর বুনো গাছের জাম এবং ছড়ানো সবুজ শালের ঐ বন।"

মানিকের প্রথম শিক্ষারম্ভ হয় তাঁর বড়দার তত্ত্বাবধানে কলকাতার মিত্র ইনষ্টিটিউশনে। বড়দার নাম ছিল সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি কৃতী ছাত্র। এম. এস, সি., পি. আর.এস., ডি.এস.সি.। প্রথম জীবনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। পরবর্তীকালে ভারত সরকারের আবহ বিভাগের প্রধানকর্তারূপে উন্নীত হয়েছিলেন। তিনি চাকরী নিয়ে কোলকাতার বাইরে চলে যাওয়ায় মানিককে লেখাপড়ার জন্য পিতার কাছে টাঙ্গাইলে চলে যেতে হয়। তারপর টাঙ্গাইলে, মহিষাদলে, ব্রাহ্মণবেড়িয়ায়, মেদিনীপুরের নানা জায়গায় পড়াশুনা করেন। মেদিনীপুর জিলা স্কুল থেকেই মানিক ১৯২৬ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করেন।

সম্ভবত টাঙ্গাইলে থাকবার সময়েই মানিকের জীবনে এক প্রচণ্ড আঘাত আসে। ডবল নিমোনিয়ায় মানিকের মায়ের মৃত্যু হয় ১৯২৪ সালের ২৮শে মে। মানিকের জীবনে এই মৃত্যু এক অপরিসীম ক্ষতি। এই পরিবারের বিরাট স্নেহচ্ছায়া অপসারিত হয়ে গেল। মায়েরাই বাঙালী মধ্যবিত্ত সংসারে কেন্দ্রবিন্দু। তাঁকে ঘিরেই একটা পারিবারিক শৃঙ্খলা এবং ঐক্য গড়ে ওঠে। মানিকের মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর পিতা অনেকদিন চেষ্টা করেছিলেন এই সংসারের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে। কিন্তু অনিবার্য নিয়মেই তা ধীরে ধীরে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। মায়ের মৃত্যুর পর মানিকদের পরিবারের বাস উঠে যায়। সকলেই চলে আসেন কাঁথিতে। মানিকের মেজদা সন্তোষবাবু তখন সবে ডাক্তারি পাশ করে সেখানে প্র্যাকটিশ আরম্ভ করেছেন। মানিক ভর্তি হন কাঁথি মডেল হাইস্কুলে। কিন্তু বেশীদিন তাঁর সেখানে পড়া হয়নি। মানিক হঠাৎ আক্রান্ত হন কালাজ্বরে। মানিককে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মেদিনীপুরে তাঁর বড়দির কাছে। দীর্ঘকাল রোগভোগের পরে মানিক মেদিনীপুর জিলা স্কুল থেকেই পরে ম্যাট্রিক পাশ করেন।

তারপর মানিক ভর্তি হন বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ন কলেজে। সেখান থেকে ১৯২৮ সালে তিনি আই. এস-সি. পরীক্ষায় পাশ করেন। এই কলেজটি মিশনারীদের কলেজ। এই কলেজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মানিক পরে লিখেছেন. "বাঁকুড়া

কলেজে 'জ্যাকসন' নামক এক অধ্যাপক আমার উপর খুব প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি আমাকে বাইবেল পড়ান। সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স কোরে ভর্তি হই এবং কাজ শিখি এবং ডিপ্লোমা পাই। বাইবেল আমি খুব যত্ন করে পড়েছিলাম, এই সময়ে আমার মন থেকে ধর্ম বিষয়ে সকল রকম গোঁড়ামি দূর হয়ে যায়।"

১৯২৮ সালে মানিক এসে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। মানিকের কথায় "বাংলা তেরোশ' পঁয়ত্রিশ সাল। কলেজে পড়ছি বি. এস. সি। অনার্স নিয়েছি অঙ্কে। অঙ্কের মতন এমন আর কি আছে? এত জটিলতার এমন চুলচেরা নিয়ম। রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা ত অভিনব কাব্য—ছ্যাবলামি, নেকামি, হাল্কা ভাবপ্রবণতার চিহ্নও নেই।"

মানিক প্রাণমন দিয়েই এই বিজ্ঞান শিক্ষা করেছিলেন। মুগ্ধ হয়ে ক্লাসের লেকচার শুনতেন আর মশগুল হয়ে ল্যাবরেটরিতে এক্সপেরিমেণ্ট করতেন। ছেলেবেলা থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জানবার তাঁর যে প্রবল আগ্রহ ছিল বিজ্ঞান শিক্ষা করতে এসে তা আরও বৃদ্ধি পেল। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিশ্লেষণপ্রিয়তা তাঁর পরবর্তী জীবনে খুবই কাজে লেগেছিল।

বৈজ্ঞানিকের মতন তাঁর মন এবং দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছিল। সেজন্য কল্পনার রঙীন ফানুস ওড়াতে তিনি চাননি। হৃদয়াবেগের চেয়ে সহজ যুক্তি-বিজ্ঞানের উপর তিনি নির্ভর করতেন বেশী। বৈজ্ঞানিকের মতই তিনি জীবনকে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ করে তার থেকে একটি সামান্য সূত্র আবিষ্কার করতেন। একটা ছক কেটে, তৈরি হয়ে, পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী।

তাঁর সব পরিকল্পনা বিপর্যস্ত হয়ে গেল এক আকস্মিকতার ধাক্কায়। সেই সম্পর্কে মানিক পরবর্তীকালে লিখেছেন. "একদিন কলেজের কয়েকজন বন্ধু সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছে। শৈলজানন্দ, প্রেমেন, অচিন্ত্য, নজরুল—এদের নিয়ে সম্প্রতি হৈ চৈ পড়ে গিয়েছে বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে—সাহিত্যের দুর্গরক্ষী সিপাইরা কাঠের বন্দুক উঁচিয়ে দুমদাম চীনা পটকা ফাটিয়ে লড়াই শুরু করেছে। আলোচনা গড়াতে গড়াতে এসে ঠেকল মাসিকপত্রের সম্পাদকদের বুদ্ধিহীনতা, পক্ষপাতিত্ব, দলাদলি প্রবণতায় ও উদাসীনতায়।

"নামকরা লেখক ছাড়া ওরা কারুর লেখা ছাপায় না। দলের লেখক

হলে ছাপায়—ব্যস। অন্য কেউ পাত্তা পাবে না।

"একজনের তিনটি লেখা মাসিকের আপিস থেকে ফেরত এসেছিল। সে সম্পাদকদের কুৎসিত একটা গাল দিল—কলেজের ছেলেরা যা দেয়। সম্পাদকদের না হোক অন্যদের আমিও যে ধরনের গাল গায়ের জ্বালায় কম বয়সে দিয়েছি।

"তর্কে আমার চিরদিনের বিতৃষ্ণা। অবিবেচক ছেলেটার অন্যায় মন্তব্যে বড় রাগ হল।

"...অনেক কথা কাটাকাটির পর বাজি রাখা হল।...বাজি হল এই: আমি একটি গল্প লিখে তিন মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ, প্রবাসী বা বিচিত্রায় ছাপিয়ে দেব। যদি না পারি—সে কথা আর কেন?

"আমি জানতাম পারব। কোনদিন এক লাইন লিখিনি, কিন্তু গল্প ত পড়েছি অজস্র। সাহিত্য হবে না, সৃষ্টি হবে না, কিন্তু সম্পাদক-ভুলান গল্প নিশ্চয় হবে।"

গল্প লেখা ঠিক হোল কিন্তু কী নিয়ে গল্প লিখবেন তা নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। চিরাচরিত পথে যেতে তাঁর মন উঠল না। এ সম্পর্কে পরে মানিক নিজেই লিখেছেন, ভাবতে লাগলাম কি নিয়ে গল্প লিখব। প্রেমের গল্প? হ্যাঁ, প্রেমের গল্পই লিখতে হবে। বাংলা মাসিকের প্রায় সব গল্পই একরকম প্রেম নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেখা হয়। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে, তাদের প্রেম হল, বিয়েতে বাধা পড়ল, বাধা কেটে মিলন হল। এই রকম গল্প একটা লিখব ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে! মন সায় দিল না। মন বলল প্রেমের গল্প লিখতে চাও লেখ, কিন্তু পচা দুর্গন্ধ ছ্যাবলামির গল্প লিখ না—বাংলার ছেলেমেয়েগুলো যে গোল্লায় গেল এক রকম গল্প পড়ে পড়ে।

"...তখন মনে পড়ল পূর্ববঙ্গের এক স্বামী-স্ত্রীর কথা। বাস্তব জীবনে নাটকীয় প্রেমের চরম অভিজ্ঞতা ওদের দেখেই আমি পেয়েছিলাম।... এদের অবলম্বন করে এক ঘোরাল ট্র্যাজিক প্লট গড়ে তুলে গল্প লিখলাম। নাম দিলাম 'অতসীমামী'।"

এই গল্প তিনি দিয়ে আসেন বিচিত্রা আপিসে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের হাতে। মানিক বাজী জিতে গেলেন। তাঁর গল্প শুধু ছাপাই হোল না, বিচিত্রার সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্বয়ং গল্পের জন্য পারিশ্রমিক দিয়ে গেলেন পনেরো টাকা আর এক খণ্ড বিচিত্রা এবং দাবী জানিয়ে গেলেন

আরো গল্প চাই।

হঠাৎ একটা গল্প লিখে মানিক লেখক হয়ে গেলেন। লেখক হবার ইচ্ছে সম্বন্ধে সচেতনতা মানিকের অনেকদিন থেকেই ছিল। 'স্কুল জীবনের শেষের দিকে ইচ্ছেটা অল্পে অল্পে নিজের কাছে ধরা পড়েছিল।" অধিকাংশ স্কুল কলেজে হাতে লেখা মাসিকপত্র থাকে। সারা বাংলায় ছড়ানো গোটা দশেক স্কুলে আর মফস্বল ও কলকাতায় গোটা তিনেক কলেজে তিনি পড়েছেন। কিন্তু কোথাও তিনি লেখার চেষ্টাও করেননি। কারণ মানিক নিজেই লিখেছেন, "কোন ভরসায় লিখবো? লেখা তো ছিনিমিনি খেলা নয়। বাড়িতে লুকিয়ে লেখার চেষ্টাও আমি কখন করিনি।" (লেখকের কথা)। সেজন্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বহু জায়গায় বলেছেন এবং লিখেছেন 'অতসীমামী'ই তাঁর প্রথম লেখা। এই প্রথম লেখার সার্থকতাই তাঁকে লেখার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত করে ফেলল।

তখন থেকেই মানিক লেখার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। পরপর তিনি লিখে চললেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক উপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের তাগিদেই তিনি তাঁর দ্বিতীয় কাহিনী 'ব্যথার পূজা' বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশিত করেছিলেন। কিন্তু "এ তো গল্প নয়। এ যে অসম্পূর্ণ কাহিনী। মাসিকের পাতায় জীবনের খণ্ডিত একপেশে অসম্পূর্ণ কাহিনী ছাপানোর ছেলেমানুষির জের তো গল্প সঙ্কলনে টানা চলে না।" সেজন্য অতসীমামী গল্প সঙ্কলনে তিনি 'ব্যথার পূজা'কে গ্রন্থিত করেননি। তেইশ বছর পরে তাকে তিনি উপন্যাসে পরিণতি দিয়েছেন।

মানিক যখন বাংলা সাহিত্যের আসরে যোগ দেন তার পূর্বেই কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতির আবির্ভাব ঘটেছিল। সাধারণ বাঙালী পাঠক তখন শরৎচন্দ্রের গল্পে মশগুল ও কাজী নজরুল ইসলামের ভক্ত পাঠক। প্রবাসী, ভারতী, বিচিত্রা তখন অভিজাত পত্রিকা। আর সাহিত্যে এসেছে আধুনিকতা। ইউরোপেরই মনের প্রাণের একটি বিপর্যয়ের ফলে এই আধুনিকতা গড়ে উঠেছিল। শরৎচন্দ্রের ভাষায় "...পূর্বের মত রাজা-রাজড়া জমিদারের দুঃখদৈন্য দ্বন্দ্বহীন জীবনেতিহাস নিয়ে আধুনিক সাহিত্য-সেবীর মন আর ভরে না। তারা নীচের স্তরে নেমে গেছে।" বিষয়বস্তু নির্বাচনে, চরিত্র রূপায়নে, কাহিনী রচনায় তাঁরা রবীন্দ্র-স্বর অতিক্রান্ত।

এই আধুনিক সাহিত্য গড়ে উঠেছিল ইউরোপেরই মনের প্রাণের একটা

বিপর্যয়ের ফলে! ইউরোপের চেতনার ধারার সঙ্গে তার ছিল জীবন্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। আমাদের দেশের চেতনায় সে সকল জিজ্ঞাসা সজীব সার্থক হয়ে দেখা না দিলেও প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে যে অর্থ নৈতিক বিপর্যয়, বেকারী এবং হতাশা পাশ্চাত্যে দেখা দিয়েছিল এদেশেও তার ধাক্কা এসে লেগেছিল, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত সমাজে। তৎকালীন আধুনিক সাহিত্যে মধ্যবিত্ত মানসের সেই বিদ্রোহই নানাভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

মানিকের মন কিন্তু এই আধুনিকতাতেও তৃপ্ত হতে পারেনি। ভদ্রজীবনের সীমা পেরিয়ে নীচের স্তরের দরিদ্র জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আর 'কেন' নামক রোগের তীব্রতায় তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, "ভদ্র জীবনে অনেক বাস্তবতা কৃত্রিমতার আড়ালে ঢাকা থাকে, গরীব অশিক্ষিত খাটিয়ে মানুষের সংস্পর্শে এসে ওই বাস্তবতা উলঙ্গরূপে দেখতে পেতাম, কৃত্রিমতার আবরণটা আমার কাছে ধরা পড়ে যেত। মধ্যবিত্ত সুখী পরিবারের শত শত আশা-আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থাকায়, শত শত প্রয়োজন না মেটার চরম রূপ দেখতে পেতাম নীচের তলার মানুষের দারিদ্র্য-পীড়িত জীবনে।" গরীবের রিক্ত বঞ্চিত জীবনের কঠোর উলঙ্গ বাস্তবতা মানিকের মধ্যবিত্ত ধারণা বিশ্বাস ও সংস্কারে আঘাত করত। সেজন্য সমকালীন বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতা ও বলিষ্ঠ জীবনের অভাবে তাঁর মন পীড়িত হোত। মানসিক এই সংঘাত থেকেই মানিকের লেখক হবার তীব্র সাধ জাগে, মধ্যবিত্ত ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ নিয়েই তিনি সাহিত্য সৃজনে ব্রতী হন।

বি. এস. সি. পাশ করা আর মানিকের জীবনে হোল না। একাধিকবার তিনি অবশ্য চেষ্টা করেছিলেন। সাহিত্যের দুরন্ত নেশা তখন তাঁকে পেয়ে বসেছে। তিনি তখন অবিরাম লিখে চলেছেন। এ নিয়ে মানিকের পরিবারে অশান্তির শেষ নেই। মধ্যবিত্ত পরিবারের সকলেই চায় ছেলে লেখাপড়া করে ভালো পাশ করুক, ভালো চাকরী করুক। ভালো গাড়ী বাড়ি হবে। মানিকের উপরেও সেই চাপ এসেছিল বারবার। তা নিয়ে তিক্ততাও কম হয়নি।

মানিকের তখন দারুণ সংগ্রামের জীবন। আর্থিক উপার্জন নেই। নিজের মনের কথা অভিভাবকদের বোঝাতে পারছেন না। পরীক্ষায় বারবার ব্যর্থতায় বিড়ম্বনার শেষ নেই। পারিবারিক আশ্রয় ছেড়ে মানিককে অসহায় অবস্থায় মেস-জীবনে আশ্রয় নিতে হয়। অন্যদিকে

মানিকের কোন ক্লান্তি নেই। অবিরাম চলেছে লেখার পালা। অতসী-মামীর ট্রাজিক ঘোরালো প্লট দিয়ে যার আরম্ভ, ব্যথার পূজা, একটি দিন (দিবারাত্রির কাব্যের প্রথম গল্পরূপ), জননী, পুতুল নাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি, প্রাগৈতিহাসিক, সরীসৃপ, মহাকালের জটার জট এবং আরও অনেক ছোটগল্পের মধ্যে বাস্তবের সঙ্গে মানিকের ভাবপ্রবণতার সংঘাত ক্রম-উত্তরণের পথে এগিয়ে চলেছিল। ভীষণ অস্থিরতার মধ্যে তিনি একটি পথের সন্ধান করছিলেন। হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপের কাল্পনিকতায় সজ্ঘাত-জর্জর জীবনবোধের অস্পষ্ট হলেও একটা আশা জেগেছিল। ভাঙাচোরা মানুষগুলোকে নিয়েই একটি সুন্দর বসতি গড়ার স্বপ্ন তখন তাঁকে পেয়ে বসেছিল।

মানিকের এই পথ সন্ধান পরিণতি লাভ করল মার্কসবাদের দীক্ষায়। জীবনের গভীরতম আবেগগুলোর মধ্য দিয়েই তিনি অতি দ্রুত পদক্ষেপে রাজনৈতিক ধারণার দিকে এগিয়ে গেলেন। মধ্যবিত্ত জীবনের কৃত্রিমতা, ন্যাকামি এবং ভণ্ডামির প্রতি স্বভাব বিরূপতা অন্যদিকে চাষী মজুরদের বলিষ্ঠ জীবনের প্রবল আকর্ষণ এবং বৈজ্ঞানিক নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গী ও পর্যবেক্ষণ মানিককে স্বাভাবিকভাবেই মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। সহরতলী উপন্যাসে সত্যপ্রিয়ের কুটিল ষড়যন্ত্রে যশোদার পরোপকারী, সম্পূর্ণ মানবিক এবং বলিষ্ঠ চরিত্রেরও পরাজয় মানিককে নিশ্চয়ই খুব পীড়িত করেছিল।

ত্রিশ দশকের ফ্যাসিবাদের অপ্রতিহত নগ্ন নির্লজ্জ অব্যাহত জয়যাত্রা সমস্ত বিশ্বের সাধারণ মানুষ, শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানীদের বিস্ময়বিমূঢ় করে তুলেছিল। তাঁরা সোচ্চারে বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। বাংলাদেশে এই আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করল চল্লিশের দশকে যখন ফ্যাসিবাদী জাপানের বিমান আক্রমণ বাংলা দেশের মানুষকেও ভীত সন্ত্রস্ত এবং সাহসী করে তুলেছিল। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার সাম্যবাদী আদর্শ এ দেশের মানুষকে তখন অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল। স্বাভাবিক ভাবেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হলেন, ক্রমে এই আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িত হয়ে পড়লেন।

মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয়ের পর মানিকের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে। তাঁর লেখায় যে ভ্রান্তি, মিথ্যা আর অসম্পূর্ণতার ফাঁকি ছিল তা নিজেই স্পষ্ট

এবং আন্তরিক ভাবে উপলব্ধি করলেন। বুঝতে পারলেন,—"মার্কসবাদই যখন মানবত্তাকে প্রকৃত অগ্রগতির সঠিক পথ বাতলাতে পারে, অতীত কি ছিল, বর্তমান কি হয়েছে এবং কিভাবে কোন্ ভবিষ্যৎ আসবে জানিয়ে দিতে পারে তখন মার্কসবাদ সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে সাহিত্য করতে গেলে এলোমেলো উল্টোপাল্টা অনেক কিছু তো ঘটবেই।" (সাহিত্য করার আগে)। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি আকৈশোর মধ্যবিত্ত জীবনের কৃত্রিমতা ও যে বিকার প্রত্যক্ষ করেছিলেন মার্কসবাদ যুক্তি বুদ্ধি ও সমাজ বিজ্ঞানের দ্বারা তাঁর সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে তুলল।

তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দিলেন প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের মধ্যে, ছাত্রদের মিছিলে, কৃষকের তেভাগা আন্দোলনে, রাজনৈতিক কর্মীদের উপর সরকারী নির্যাতনের প্রতিবাদ সভায়, আইন অমান্য আন্দোলনে, গ্রামে শহরে দূর-দূরান্তে বিভিন্ন সাহিত্য সংস্কৃতির সভায়।

বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তিনি। জীবনকে যে ভাবে এবং যত ভাবে তিনি উপলব্ধি করেছেন অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেওয়ার তাগিদেই তিনি লিখতেন। তিনি 'কেন লিখি' প্রবন্ধে নিজেই স্বীকার করেছেন, ছেলেবেলা থেকেই অনেকের চেয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা বেশী। সেই কথাগুলো, অভিজ্ঞতাগুলো জানাবার জন্যই তিনি লিখতেন।

তবে তিনি মনে করতেন—লেখক নিছক কলম পেষা মজুর। কলম পেষা যদি কাজে না লাগে তবে রাস্তার ধারে বসে যে মজুর খোয়া ভাঙে তার চেয়েও জীবন তার ব্যর্থ, বেঁচে থাকা নিরর্থক।

"কলম-পেষার পেশা বেছে নিয়ে প্রশংসায় আনন্দ পাই বলে দুঃখ নেই। এখনো মাঝে মাঝে অন্যমনস্কতার দুর্বল মুহূর্তে অহঙ্কার বোধ করি বলে আপসোস জাগে যে, খাঁটি লেখক কবে হবো।"

এখানেই মানিকের অনন্যতা। পুতুলনাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি, সহরতলী, সার্বজনীন, সোনার চেয়ে দামী প্রভৃতির মত উপন্যাস, প্রাগৈতিহাসিক, সরীসৃপ, মহাকালের জটার জট, হারানের নাতজামাই, বাগদীপাড়া দিয়ে, ছোট বকুলপুরের যাত্রী, কালোবাজারে প্রেমের দর, উপায় প্রভৃতির মত ছোটগল্পের যিনি স্রষ্টা তিনিও বড় লেখক বলে কোনদিন অহঙ্কার বোধ করেননি। বরং খাঁটি লেখক হবার জন্য মজুরের মতই জীবনকে দেখার এবং রূপ দেবার জন্য সারাজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে গিয়েছেন।

ইচ্ছে করলে তিনি বড় চাকরী করতে পারতেন। বঙ্গশ্রীর অফিসে বছর খানেক সহ-সম্পাদকের চাকরী আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ন্যাশনাল ওয়ারফ্রন্টে বছর তিন চারেকের চাকরী ছাড়া তিনি কখনো চাকরী করেন নি। জীবনের শেষদিকে যখন চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাতেন তখন তাঁর কাছে সরকারী বড় চাকরির প্রলোভন এসেছিল। কিন্তু সরকারী পৃষ্ঠপোষণায় তার খাঁটি লেখক হবার সাধনায় বিঘ্ন হবে জেনে তিনি সরকারী চাকরী গ্রহণ করেননি। এমন কি ১৯৪৮-৪৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টির উপর যখন সরকারী আক্রমণ নির্মম হয়ে আসে, বড় বড় প্রকাশকের দ্বার যখন মানিকের কাছে রুদ্ধ হয়ে যায়, তখনো মানিকের দৃঢ়তার অভাব ঘটেনি।

সারা জীবন তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করেছেন। এক সুস্থ সুশৃঙ্খল সুখী সমাজের বাস্তবরূপ দেখতে চেয়েছেন।—পুতুলের সমাজ ভেঙে মানুষের সমাজ গড়তে চেয়েছেন। মৃত্যুর পূর্ব বৎসরে হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে তিনি লিখেছেন, "আমি মার্কসবাদী, আমি বৈজ্ঞানিক, আমি সব জানি। সংস্কার বা ভাবপ্রবণতার ধার আমি ধারি না। আমি লড়ায়ে শ্রমিক শ্রেণীর যোদ্ধা কমিউনিস্ট—আমার হৃদয় পাথর।" সেজন্যই তিনি মনে করতেন শিল্পীর যথার্থ পরিচয় বাস্তবের রাজত্বে। কল্পনার ক্ষেত্রে রোমান্টিকতার মধ্যে গেলে, মাল মসলা যোগাড় করে ঠিকাদারের বাড়ী তৈরির মতো ইটের স্তূপ হবে। শিল্প-নৈপুণ্য থাকবে না। যাদের কখনো দেখেননি শুনেননি তাদের ব্যথা-বেদনার ইতিহাস লিখতে চাননি। বাংলা সাহিত্যে অনেক লেখকের আবির্ভাব তিরোভাব হয়েছে কিন্তু মানিকের মত শোষিত সংগ্রামী শ্রেণীর এমন বলিষ্ঠ অনুভব আর কারো মধ্যে দেখা যায়নি। বাংলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে এমন একজন লেখককে হারাতে হোল।

১৯২৮ সালে অতসীমামীর রচনাকাল ধরলে মানিকের সাহিত্য চর্চার জীবন মাত্র উনত্রিশ বছরের আর ১৯৩৫ সালে প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের সময় থেকে ধরলে মাত্র বাইশ বছর। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি আটত্রিশ খানা উপন্যাস, ২৬৮টি গল্প, একটি নাটিকা এবং গোটা পঞ্চাশেক কবিতা রচনা করেছেন। ৩৮টি উপন্যাস ছাড়াও তাঁর তিনটি অসমাপ্ত উপন্যাস আছে। সংখ্যার দিক থেকে এগুলো পরিমাণে কম নয়। তবে কেবলমাত্র সংখ্যার

হিসেবেই বাংলা সাহিত্যে তিনি কৃতিত্বের দাবীদার নন। ম্যাক্সিম গোর্কী যদি একমাত্র 'মা' উপন্যাসই লিখতেন তাহলে তাঁর খ্যাতি কিছুমাত্র কম হোত না। লিও টলস্টয় ক'খানা উপন্যাস লিখেছেন? বাংলা সাহিত্যে সংখ্যার দিক থেকে অনেকে বহু সাহিত্য কীর্তির অধিকারী কিন্তু কালজয়ী এবং সার্থক সৃষ্টির তো হিসেব করতে হয়। মানিকের বিশ্বজোড়া খ্যাতি তাঁর পুতুল নাচের ইতিকথা এবং পদ্মানদীর মাঝির জন্য। কিন্তু এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য তাঁর সহরতলী, চিহ্ন, স্বাধীনতার স্বাদ, সোনার চেয়ে দামী এবং সার্বজনীন উপন্যাস।

ঔপন্যাসিক হিসেবেই মানিকের খ্যাতি। তিনি কেন উপন্যাস রচনায় ব্রতী হলেন সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "আমার বিজ্ঞান-প্রীতি, জাত বৈজ্ঞানিকের কেন-ধর্মী জীবন-জিজ্ঞাসা, ছাত্র বয়সেই লেখকের দায়িত্বকে অবিশ্বাস্য গুরুত্ব দিয়ে ছিনিমিনি লেখা থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি কতগুলি লক্ষণে ছিল সুস্পষ্ট নির্দেশ যে, সাধ করলে কবি হয়তো আমি হতেও পারি: কিন্তু ঔপন্যাসিক হওয়াটাই আমার পক্ষে হবে উচিত ও স্বাভাবিক।" "বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি সমাজ জীবন ও মানুষের চেতনায় বিশেষ পরিবর্তন ঘটানোর ফলেই সাহিত্যে উপন্যাসের আঙ্গিক প্রয়োজনীয় ও আদরণীয় হয়।" "নিত্য নতুন আবিষ্কারে বিজ্ঞান বদলে দিয়ে চলে সমাজ ও জীবনকে, বদলে দিয়ে চলে মানুষের চেতনাকে। এই চেতনায় জাগে সাহিত্যের কাছে নতুন চাহিদা এবং এই চেতনা প্রতিফলিত হয় নতুন আঙ্গিকে উপন্যাস রচনায়।" মানিকের উপন্যাসে আছে এই নতুন নতুন আঙ্গিকের পরিচয়। এই দিক থেকে তাঁর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'চিহ্ন'। অতি দ্রুত ঘটে যাওয়া ঘটনার সঙ্গে তাল রেখে মানিক লিখেছেন রাজপথের এক অপরূপ কাহিনী। কোন বিশেষ চরিত্রকে অবলম্বন না করেও জনতার বিচিত্রতা এবং বিভিন্নতা বজায় রেখে নাটকীয় ঔৎসুক্য সৃষ্টির এক চমৎকার নিদর্শন।

তিনি কেবল আঙ্গিকের দিকেই লক্ষ্য রাখেন নি। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যে নতুন নতুন চেতনার বিকাশ ঘটেছে, তারও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আছে তাঁর উপন্যাসে। চল্লিশের দশকে যে রাজনৈতিক সচেতনতা মুখর হয়ে উঠেছিল বাংলা উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই তার শ্রেষ্ঠ রূপকার।

বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দান অপরিসীম।

মানিক গভীর ভাবে লক্ষ্য করেছেন, মানুষের মনোজীবনে রয়েছে অনেক পাপ ও ক্লেদ। 'সর্পিল' তার গতি। আদিম হিংস্রতার অন্ধকার এখনো সেখানে বর্তমান। সর্পিল, প্রাগৈতিহাসিক, সরীসৃপ প্রভৃতি গল্পে যেন সত্যি আছে 'মহাকালের জটার জট'। প্রথম প্রথম কিছু গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই জটের জটিলতার পরিচয় দিতে গিয়ে তার সুন্দর মনোবিশ্লেষণ করেছেন। তার মধ্যে আছে মূর্ছাহত মুমূর্ষু মধ্যবিত্ত সমাজের স্বরূপ।

পরে তিনি উপলব্ধি করেছেন, সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভেঙে বিরাট জীবন্ত সমাজে আত্মবিলোপ ঘটার মধ্যেই আগামী দিনের অফুরন্ত সম্ভাবনা। তিনি উপলব্ধি করেছেন, মানুষের প্রকৃত আত্মীয়তা রক্ত সম্পর্কের মধ্যে নয়, শ্রেণী সম্পর্কের মধ্যে। একদিকে যেমন ধনতন্ত্রের চরম আঘাতে সামন্ততন্ত্রীয় একান্নবর্তিতা ভেঙে পড়ছে তেমনি অন্যদিকে শ্রেণী শোষণে নতুন করে গড়ে উঠেছে শ্রমভিত্তিক একান্নবর্তিতা। মানিক যেন তারই 'গায়েন'। তাঁর গল্পে আছে নতুন আদর্শ নতুন চেতনা। এই চেতনায় ধর্মের গোঁড়ামি আর জমিদার-পুলিশের ভয় তুচ্ছ। তাঁর গল্পে কৃষক আন্দোলন শ্রমিক আন্দোলন উদ্বাস্তু আন্দোলন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে পারি তাঁর 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী', 'হারানের নাতজামাই', 'কংক্রিট', 'উপায়' প্রভৃতি গল্প।

মানিকের লেখায় ক্লান্তির ছাপ নেই। তিনি "সব সময় সর্বত্র জীবনকে দর্শন করার বিরামহীন শ্রম" করে গিয়েছেন। সেজন্য তাঁর সাহিত্য শিল্পে ছিল যেমনি সজীবতা তেমনি নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য।

কথাকারের ইতিকথা

ক্ষুদিরাম দাস

একালের বাঙালির বৈজ্ঞানিক সমাজ-ইতিহাসের প্রয়োজন যদি কোনো কালে হয় আর আদর্শ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়তে হলে সাধারণ জনের মানসিক পরিসংখ্যানের গুরুত্ব যদি কোনো কালে উপলব্ধি করা যায় তাহলে যেমন শরৎচন্দ্রের তেমনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসগুলি অপরিহার্য মৌল উপাদান হিসেবে বিবেচিত হবে। এ দুই লেখকের উদ্দেশ্য এবং প্রণালীতে বহু পার্থক্য থাকলেও—যেমন বলা যেতে পারে যে শরৎ মুখ্যভাবে সামন্ততান্ত্রিক নিয়তির এবং মানিক ধনতান্ত্রিক নিয়তির রূপকার, অথবা শরৎ যেমন সেন্টিমেন্টাল ও আদর্শপ্রবণ, মানিক সেই পরিমাণেই বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতর অনুসন্ধিৎসু—তবু সাধারণ বাঙালির মানসিক গঠন ও পরিবেশ পরিচিতির যথাযথতায় এ দুয়ের রচনাই সমানভাবেই মূল্যবান। সমকালবর্তী তারাশংকর বিভূতিভূষণও যদ্যপি গ্রাম জীবনের রূপকার, তবু তাঁদের ছবির মধ্যে অতীতের উদাসীন বিমূঢ়তা যে-পরিমাণে প্রশ্রয় পেয়েছে, সমকালীন সংশয়-প্রশ্ন-মুখর চাঞ্চল্য সে পরিমাণে নেই। চরিত্র ও পরিবেশের বিস্তার ও জটিলতার স্বরূপ দেখানোর প্রয়াসেও মানিক এঁদের থেকে বিভিন্ন। ঠিক এই কারণেই মানিক তাঁর উত্তর-চল্লিশের রচনাবলীতে পর্যাপ্ত পরিমাণে চিত্তাকর্ষী হতে পারেননি এবং হয়ত চানও নি। অবশ্য তাঁর ঋজুতা ও প্রখর অনুসন্ধিৎসার আক্রমণ থেকে অনবদ্য ছোটগল্পগুলি অবশ্য রক্ষা পেয়ে গেছে, কালের স্বাক্ষর নিয়েও স্থায়ী চমৎকারের আশ্রয় হয়েছে, ইতিকথা ও পদ্মানদীর সাহিত্যিক সমসূত্রে পাঠকচিত্তে গ্রথিত হয়ে রয়েছে। সহানুভূতির শক্তির দিক থেকে বিচার করলে শরৎচন্দ্র অপরিমেয়, তারাশংকর বিশেষ দৃষ্টিকোণে সীমিত, বিভূতিভূষণ শরতেরই উত্তর সাধক, মানিক ঐ গুণ আশ্রয় ক'রেও সমাজদ্বন্দ্বের অভিমুখেই শেষ পর্যন্ত অগ্রসর। মানিকের সময়ে বা পূর্বে চেতন-অবচেতন-বিজড়িত ব্যক্তি মানুষকে এমনতর স্বরূপে-উদ্‌ঘাটিত হতে, এমন কি স্থানে স্থানে ভয়ংকর ভাবেও আমরা দেখিনি, আর সংগ্রামী পুরুষ-নারী অনিবার্য

স্নেহ-মমতার সঙ্গে কতখানি তেজস্বিতাময় মনুষ্যত্ব বহন করে তারও পরিচয় পাইনি। তাঁর পর্যবেক্ষণ-পটুতা ও প্রত্যয়ের তেমন পূর্ব সূত্র দুর্লভ। আর যে-পথ তিনি খুলে দিয়েছেন তার পদচারী আজ থাকলেও ঠিক ঐ নিবিড় নিষ্ঠায় আরও অগ্রবর্তী কিনা সন্দেহ।

শরৎচন্দ্র পল্লীর উপর অনুরাগ, লাঞ্ছিত মানবত্ব, বিশেষত নারীত্বের উপর গভীর সহানুভূতি আর সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য-প্রধান সমাজের জঘন্য স্বার্থপরতা ও মানবিক অধঃপতন—মূলত এই তিনটি সম্বল নিয়ে যাত্রা করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক সমাজ-সচেতনতা সহকারে অবক্ষয়ের মর্মমূল পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করেননি। আবার মানুষের অন্তরতম নিভৃতে যে বাসনা ও সংস্কারের কর্তৃত্ব চলেছে, যা রহস্যময় বিকারের ছল নিয়ে বাইরে দৃশ্যমান হয়, তার প্রকৃতি চিহ্নিত করার প্রয়াসও করেননি। মানিকের সমকালীন অন্য দুই মহারথী তারাশংকর ও বিভূতি বন্দ্যোর মধ্যে কেউই পর্যবেক্ষণ যন্ত্র সহযোগে উপরিচর তরঙ্গলীলার নিচেকার চেতনাপ্রবাহ ধরার প্রয়াস করেননি। বিভূতিভূষণ দারিদ্র্যপ্রিয় হলেও সমাজ-সচেতন ও প্রতিবাদী কখনোই হতে পারেননি। সেক্স্ বিষয়ে অতিরেকী দৃষ্টান্তের দিক তিনি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। তারাশংকরের লেখনী যৌনতা স্পর্শ করেছে। কিন্তু বিকারের যাবতীয় দায়িত্ব নিম্নবর্গের ও বেয়াড়া চরিত্রে তিনি আরোপ করেছেন। উচ্চবর্ণের জীবনাচরণকে তিনি মূল্যবোধের রস-ধারায় অভিষিক্ত করেছেন। এ বিষয়ে বিশ্লেষণের কঠিনতর পথও তিনি পরিত্যাগ করেছেন। তারাশংকর নিজ সীমিত পরিসরে অবশ্য প্রবল সমাজ-সচেতন লেখক হিসেবে পরিগণিত, কিন্তু তাঁর কাছে সমস্যার দিকটা কেবল সামন্ততান্ত্রিক বা পুরাতন উপদেবতাকেন্দ্রিক জীবন-সংস্কার ও বাণিজ্যিক নীতিহীনতার দ্বন্দ্বেই সীমায়িত। পুরাতনের অবক্ষয়িত অবস্থার মধ্যে প্রাচীনকে প্রকারান্তরে নূতন নৈতিক আবরণে ঘিরে রাখার প্রয়াস। বিশেষ একটি সীমানা ছাড়িয়ে মধ্যবিত্ত জীবন তিনি আঁকেননি, আর মানিকের মত বিচিত্র রঙে প্রকাশিত মধ্যবিত্তের জীবনলীলার মধ্যেকার জঘন্য সুবিধাবাদ ও ভণ্ডামির কালো ছবিও তাঁর চোখে পড়েনি। তারাশংকর ও বিভূতিভূষণ দুজনেই নিজ নিজ কক্ষে ভাববাদী। ঈর্ষা-কলহ-মিলিত পারিবারিক সমস্যা, মাটি ও নিসর্গের আহ্বান, কষ্টিপাথরে অপরীক্ষিত মানবিকতা এবং আধ্যাত্মিক আদর্শে উন্নীত সমন্বয়ী জীবন মহিমা

ভিন্ন আধারে দুয়েরই লেখায় পরিস্ফুট। এই তিনের ঐক্য কেবল এক জায়গায়—পশ্চিমা সাহিত্যের অনুসরণ বর্জনে। এইখানে কল্লোল-গোষ্ঠীর সঙ্গেও এঁদের স্বাতন্ত্র্য।

মানিকের জীবন অধ্যয়নে কোনো ভাবপ্রত্যয় কার্যকরী হয়নি। যৌন কামনা, রুগ্ন সমাজ, মুনাফার শাসন তাঁকে ভুয়া মোহের আবেষ্টনীতে বাঁধতেই পারেনি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সাম্যবাদী আন্দোলন, মহাযুদ্ধ, কণ্ট্রোল, মন্বন্তর, রাষ্ট্রের সহযোগিতায় শিল্পপতিদের লীলা—একত্র এতগুলি দুর্লভ ব্যাপারের ভুক্তভোগী তিনি। ফলে সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত জীবনের সবচেয়ে নির্মোহ সমালোচকের ভূমিকা নিতে হয়েছিল তাঁকে। তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরেকার উচ্চবিত্ত-জীবনের ছবি আঁকার প্রয়োজনে তাঁর লেখনী কোনক্রমে দায়িত্বটা সেরে নিয়েছিল এই মাত্র। কিন্তু সমাজ যেখানে কুটিল দুর্গ্রহের মত মানুষের পিছনে ফিরেছে, বাঁচা মানে যেখানে পশুর মত বাঁচা, সেখানে সংঘাতের মধ্য দিয়ে নিত্য দ্বন্দ্বে নিযুক্ত মানুষ তার হার-না-মানা প্রতিজ্ঞা নিয়ে তাঁর লেখনী মুখে বার বার আবির্ভূত হয়েছে। বস্তুত নিগৃহীত নিম্ন বর্ণের ও নিতান্ত স্বল্পমূল্যে শ্রম বিক্রেতা মানুষের জীবন-ছবি আঁকতেই মানিকের লেখনী সবচেয়ে সহজগতি ও সার্থক হয়েছে। মধ্যবিত্ত জীবনের সংকীর্ণ স্বার্থপরতা, ভীরুতা, যৌন বিকার ও সুলভ আত্মবিক্রয়ের প্রচুর খণ্ড কাহিনীর উপহার পাঠকদের যদিচ তিনি দিয়েছেন, এরকম কাহিনীগুলিকে সমন্বিত ক'রে কেন্দ্রীয় কোনো সাহিত্যিক বাঁধনে বেঁধে পাঠকদের কোনো রসবস্তু উপহার দেওয়ার দায়িত্ব তিনি স্বীকার করেননি। তাঁর দেখানোর বিচিত্র দিক শেষ হলেই তিনি ইতিকথার ইতি টেনেছেন। এর ফলে এমনও দেখা যায় যে মাত্র একটা সূত্র সহায়ে সম্মিলিত বহু বহু চরিত্রের আচরিত বহু কার্য ও ঘটনার সংঘটন বিষয়ে 'কেন' ব্যাখ্যা পাবার আগ্রহ পাঠকের মনে উদিত হলেও নীরব চিত্রকর যেন বলতে চেয়েছেন—ঘটনা উপলক্ষ মাত্র ধরে নিয়ে মানসিকতার প্রকটনেই আমি গুরুত্ব আরোপ করেছি, চরিত্রগুলির কথাবার্তায় আচরণে মানসিক প্রতিঘাতের পরিস্ফুটনই আমার উদ্দিষ্ট হয়েছে, আমি বিচ্ছিন্নবিসৃষ্ট, সামগ্রিক পূর্ণাঙ্গ অর্থাৎ আদি-মধ্য-অন্ত সংবলিত সুবিন্যস্ত সাহিত্যিক চরিত্র গঠনের দায় আমার নেই। সামাজিক অমোঘ যন্ত্রচালনের নিয়ন্তিতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী সম্প্রদায় কিভাবে উঠছে পড়ছে নড়ছে-চড়ছে

তা দেখানোর অতিরিক্ত গঠন-করা কিছু আঁকতে তিনি নারাজ। আর্ট ও শিল্পের দায়িত্ব তিনি কৃত্রিমভাবে পালন করতে চাননি। লেখকের অলিখিত এই প্রতিজ্ঞা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পীড়াদায়ক সন্দেহ নেই, তবু কালের গতিমুখ লক্ষ্য করে, ঠিক সাহিত্যিক নয়, জীবন পরিচায়ককে আমরা ক্ষমা ক'রে বরণ করেই নিয়েছি। আবার এ হ'ল এক দিককার কথা। আর এক দিকে যেখানে লেখক সংগ্রামশীল জনতার সহযাত্রী ব্যক্তি মানুষের মধ্যে অসামান্যতা সুলভ ক'রে তুলেছেন, এমন কি নারীর চারিত্র্যেও অপ্রত্যাশিত মানবিক মহিমা দেখিয়ে বুর্জোয়াপদলেহীদের স্তব্ধ ক'রে দিয়েছেন, সেখানে বাস্তবতা রক্ষার সঙ্গে সাহিত্যিকতায় অনায়াস উত্তরণের দৃষ্টান্তে আমরা অভিভূত হয়েছি।

তাঁর এককোটিতে মধ্যবিত্তের জীবন, অন্যকোটিতে নিম্নশ্রেণীর জীবন। দুইই স্ব স্ব পরিধিতে নিজ নিজ সমস্যায় আন্দোলিত।

পুতুলনাচের ইতিকথাকে গাওদিয়া গ্রাম-পরিবেশ থেকে ক্ষণিকের জন্য বিচ্ছিন্ন ক'রে যদি সারসংগ্রহ ক'রে নেওয়া যায় তাহ'লে বলতে হয় যে এ আখ্যান মানিকের মধ্যবিত্ত আচরণ নিয়ে লেখা যাবতীয় উপন্যাসের সূত্র। যান্ত্রিক নিয়তির একটা সাধারণ চেহারা সর্বত্রই ব্যঞ্জিত। সেই বিমূঢ়তা, সেই ভীরুতা, দুর্দাম জীবন-বেগের অনুপস্থিতি। এই সাধারণত্বের ব্যতিক্রম হ'ল নিতান্ত নিম্নমানের মানুষের ছবি। এরা সংগ্রামশীল, এরা ক্রূর নিয়তি যে-কোনো বেশ ধরেই আসুক তাকে প্রতিহত করায় উদ্যোগী। তুলনায় তারাশংকর যদ্যপি নাগিনী কন্যার কাহিনী ও হাঁসুলি বাঁকে নিম্নজীবন স্পর্শ করেছেন, তাকে আধুনিক যন্ত্রণার মধ্যবর্তী হিসেবে অনুভব করেননি, চিরাচরিত দৈব সংস্কারের ক্রীড়নক হিসেবে উপলব্ধি করেছেন। তাদের জীবন সেই বিশিষ্ট সীমানাতেই অবরুদ্ধ। অনস্বীকার্য নবাগত দৈত্যশক্তি ও তার সঙ্গে সামূহিক সংগ্রামে জীবনকে প্রাণপণে চাওয়ার স্বাভাবিক বাসনা তাদের জীবনে তারাশংকর লক্ষ্য করেননি। এর প্রয়োজনও হয়ত বোধ করেননি। তারাশংকরের ধ্যানে জমিদারি-যুগান্ত ও পণ্যবাহী নবযুগের দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতিই আসল সমস্যা—জাতি বর্ণ ও জীবিকায় সুতরাং সুশৃঙ্খল প্রাচীন অর্থনীতিতে বিন্যস্ত গ্রামজীবনে ভাঙন ধরেছে। এই অবস্থার উদ্ধারকর্তা আসবেন মধ্যবিত্ত জীবন থেকেই। মেলাবেন, তিনি মেলাবেন। এ থেকে সূক্ষ্মতর অর্থনৈতিক সমস্যার আক্রমণ তারাশংকরের

দৃষ্টিতে ছিল না। আর শহর ও শহরগুলির যন্ত্রপিষ্ট কুটিল ও বিমূঢ় জনজীবনের বার্তা তাঁর কানে পৌঁছায় নাই। তিনি বিশেষ ভাবাদর্শ নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন—পুরাতন ভদ্রাসন, চলতি বর্গা ও ভাগচাষ অক্ষুণ্ণ থাকবে, মধ্যবিত্ত জীবন হবে উদার ও ভোগবিলাসহীন, আর এরই সূত্রে পরম পরিতুষ্ট নিম্নবর্ণের ও মেহনতি মানুষের জীবনও চরিতার্থতায় পূর্ণ হয়ে উঠবে একদিন। একদা প্রগতি-লেখকগোষ্ঠীর মধ্যবর্তী থেকেও তিনি রক্ষণশীল জীবন রসায়নকেই আগামী যাবতীয় সমস্যার অংস্থ মহৌষধ ব'লে ধরে নিয়েছিলেন। সমাজকে না ভেঙে, উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণের চিরশোষক ও চিরশোষিতের ভাবুকতাময় মহাশোভাযাত্রা তিনি কল্পনা করতেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এরকম মোহ, এ ধরনের ভাবস্বপ্ন ছিল না। এ বিষয়ে তিনি যথোচিত ভাবে বৈজ্ঞানিক, তার্কিক ও বিশ্লেষণধর্মী ছিলেন। সমাজ-পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে তিনি দেখেছিলেন সমূহকে, নেতা হিসেবে দেখেছিলেন ঐ সমূহেরই প্রতিনিধিকে। এই জন্যই নিশ্চিন্তে অনায়াসে তিনি বস্তুবাদের সত্যে বিশ্বাসী হতে পেরেছিলেন।

অনেকে মনে করেন হাঁসুলি বাঁক ও নাগিনী কন্যায় তারাশংকর কৌম-জীবনের দুর্লভ রূপকার হয়েছেন। এ ধারণা ঠিক নয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গ্রামের ও মিলকলের পাশাপাশি থাকা অন্ত্যজ মানুষগুলিকে ঠিক কৌম-জীবনের মানুষ বলে ধরে নেওয়া ন্যায়সংগত হয়নি। এদের জীবনে দৈবাগত সংস্কার যদি কিছু জমেও থাকে, শহর-জনপদের কুটিল আবর্তের পাকে এসে এদের মনে নোতুন ধরনের লোভ, নোতুন ধরনের যৌন লালসা, অতৃপ্তিবোধ প্রভৃতির সৃষ্টিও হতে থাকে ক্রমশঃ। নতুবা স্বাধীন আরণ্য জীবনে নারীরা কোনোমতে আত্মবিক্রয় করে না, পুরুষরাও লালসার আবেগে অস্থির থাকে না। পরকীয়া-ধর্ষণ ও কথায় কথায় রঙ্‌তামাসা কৌম জীবনে অত্যন্ত অসংগত ব্যাপার। বস্তুত তারাশংকর এক্ষেত্রে মধ্য ও নিম্নমধ্য আধুনিক জীবনের গোপন গ্লানিই এদের উপরে আরোপ ক'রে বসেছেন। পুতুলনাচের ইতিকথা, দিবারাত্রির কাব্য, চতুষ্কোণ, অমৃতস্য পুত্রাঃ প্রভৃতির মধ্যে যান্ত্রিক অভ্যাসের অসুস্থ জীবনে গোপন অভিলাষের পরিচয় পাওয়া যায়। এ এক ধরনের রুগ্নতা যা ঐ জীবনেই প্রাপ্তব্য। প্রাগৈতিহাসিকের নায়ক বা পদ্মানদীর কুবীর রুগ্ন যৌনতার অধীন নয়, বলিষ্ঠ জীবন পিপাসায় একান্ত সংগতিপূর্ণ। এরা অবশ্য অজ্ঞাতচরিত্র কৌম-জীবনের মানুষও নয়।

মানিক নির্মোহ জীবনচিত্রকর। মার্কস্‌বাদে এসে তাত্ত্বিকতায় জড়িত হয়ে অর্থাৎ সাহিত্যিক সংগতি বিসর্জন দিয়ে কমিটেড্‌ হয়ে পড়ে কেবল শ্রেণীসংগ্রামেরই ইতিবৃত্ত নির্মাণ করেছেন, এরকম মনে করা উদ্দেশ্যমূলক অবিচার হবে। মনোভাবের ও বুদ্ধির সংগতি থাকলে কোন্‌ লেখকই বা কোথাও কমিটেড না হয়ে পেরেছেন? একে স্বাভাবিক অনায়াস সংক্রমণ বলে। এই অর্থেই সুকান্ত কমিটেড্‌, মানিক কমিটেড্‌। আমাদের দেশের গুরুকরণসহ ধর্মমার্গে দীক্ষা নেওয়া সেও তো কমিটেড্‌ হওয়া। অবশ্য মানব-সমাজ বিষয়ে পরিস্ফুটভাবে ঐ মতবাদের সংস্পর্শে এসে তাঁর লেখনী যে যথার্থতায় সমৃদ্ধ হয়েছে তা মানিক নিজেই স্বীকার করেছেন। অথচ এও দেখা যায় যে তিনি কোনো মার্কস্‌বাদী সাহিত্যিকের অনুবর্তী নন। তাঁর নিজের পথ তিনি নিজেই আবিষ্কার করেছেন, কেবল দৃষ্টিটাকে নিপীড়িত মানবিক ক্ষেত্রে নিবদ্ধ রাখার বলিষ্ঠতা অর্জন করেছেন এই মাত্র। আমরা বলি, এদেশের বিশেষ কাঠামোর মধ্যে যারা (সামন্ততান্ত্রিক) সামাজিক ও (ধনতান্ত্রিক) অর্থনৈতিক দু'দিক দিয়েই শোষিত তাদের মধ্যেই তিনি মানুষ-জীবনের অতলান্ত রহস্য পেয়েছেন যা সাহিত্যিক মাত্রেরই চির-অভিলষিত। সুনির্দিষ্ট আকৃতিহীন বিমিশ্র গ্রামীণ জীবন নিয়ে এক্সপেরিমেন্টের পর এবং মধ্যবিত্তের পুতুলনাচ দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে সমতল নিম্নভূমিতে নেমেই তিনি সুস্থির হয়েছেন। পাঠকেরা এই সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন যে মধ্যবিত্ত আচরণ বর্ণনায় তাঁর ভাষা ভঙ্গিতেও অসংলগ্নতা এসেছে। চরিত্রের রেখাগুলি যেমন যাবতীয় বিন্দুকে স্পর্শ করছে না, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অপূর্ণতা থেকে যাচ্ছে পদে পদে, তেমনি বাক্যগুলিও তর্কশাস্ত্রের এপিকাইরিমা আশ্রয় করেছে। অবশ্য লেখনী-চালনার বিরাম-হীন দ্রুততাও এরকম যুক্তি ব্যাখ্যা ডিঙিয়ে যাওয়ার ও ভাষাগত দুর্বলতা সৃষ্টির একটা কারণ হতে পারে! তবু এই সঙ্গেই দেখা যায় যে উপন্যাসগুলি এই ধরনের ত্রুটি বহন করলেও গল্পগুলি চিন্তাধারার অক্ষুণ্ণতা বহন করে প্রায়শই এক একটি অনবদ্য সৃষ্টি হয়ে উঠেছে।

মানিকের প্রথমদিকের উপন্যাসে যৌন আবর্তে ভূতগ্রস্তের মত চরিত্র, রুগ্ন ও অস্বাভাবিক হেরম্ব, কি রাজকুমার, কি নিতান্ত পরিবেশতাড়িত সুনীল কিছুটা তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিদর্শন মাত্র। সবগুলিতেই একাধিক নায়িকা-কোটির মধ্যে নিক্ষিপ্ত একক নায়কের বিহেভিয়ারের পরীক্ষা। এরকম

অভীপ্সা নোতুন হলেও লেখক পরীক্ষায় সফল হয়ে নোতুনতর কোনো দিগন্ত দেখাতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। আসলে ফ্রয়েডীয় বিজ্ঞানের কোনো প্রতিপাদ্যকে পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন কিনা তাতেও আমরা সন্দেহ প্রকাশ করি। অবদমিত কাম, বাস্তবের সঙ্গে ঐ কামমূলক অবচেতনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, স্বপ্নরহস্য, শিশু-যৌনতা—এসবই ফ্রয়েডের বিস্ময়কর অবদান। অথচ এগুলি মানিকের রচনায় উপেক্ষিত হয়েছে। 'যশোদা' কি 'পরমেশ্বর' অবদমিত কামের মূর্ত প্রতীক হিসেবে দাঁড়ায়নি। কেবল প্রণয় ও দাম্পত্যের ব্যাপারেই লেখক যৌনতাকে সীমিত রেখেছেন। সুতরাং মানিককে ফ্রয়েডীয় বিজ্ঞানবাদী না বলে এসব অংশে কল্লোল-গোষ্ঠীর যৌনমনস্তাত্ত্বিক মাত্র দু'একজন কথাকারের প্রসারিত প্রতিরূপ হিসেবেই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। যদিও সেই সঙ্গে একথাও সত্য যে পুতুলনাচের অবদমিত যৌনতা বা যৌন চরিতার্থতা এবং প্রাগৈতিহাসিকের বুভুক্ষার ভয়ংকর সিদ্ধি ও দিবারাত্রির বিভিন্ন যৌন আত্মদান প্রভৃতি পূর্বেকার কল্পনাচারিতা থেকে কতকটা পৃথক্ ব্যাপার। সন্তান-বাৎসল্য মানিকের উপন্যাসে বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। জননীর পূর্ণাঙ্গ মূর্তিও তাঁর লেখনীতে সুলভ অথবা চিত্তাকর্ষক নয়। পুরুষ সঙ্গলিপ্সাময় যৌনতার প্রভাবে সন্তানদ্বেষিণী জননীই বরঞ্চ সুলভ! তবু যেখানে সামাজিক অন্যায়ের নিষ্পেষণে মানুষ জর্জর সেখানে করুণাময়ী জননীমূর্তির ঝলক আপনা থেকেই প্রদীপ্ত হয়েছে, যেমন, যশোদা, কি মাসী-পিসী, কি ময়নার মা। অবশ্য শেষ বিচারে এই কথা বলাই ঠিক যে মাতৃত্ব ও নারীত্বের দ্বান্দ্বিক গুরুত্বের মূল্যায়নে নারীত্বই তাঁর কাছে সমধিক প্রশ্রয় পেয়েছে। আর এই তাত্ত্বিকতাই তো সৃষ্টিরহস্য ও জীবনযাপনের শেষ সত্য কথা।

অভিজ্ঞতা, অনুভব ও বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ ক্ষমতা—লেখার শক্তির মূল দিকটি বাদ দিলে—এই তিনটিই যে-কোনো কথাকারের প্রধান গুণ। এগুলির মধ্যে শেষেরটি মানিকের মধ্যে বিশেষভাবেই বর্তমান ছিল। কিন্তু বাঙালি পাঠকের মন এ যাবৎ ইমোশন্ ও সেন্টিমেন্টে অভ্যস্ত থাকায় মানিকের যেসব উপন্যাসে বৌদ্ধিক রীতির আধিক্য ঘটেছে তা পাঠকের হাতে তেমন সমাদৃত হয়নি। তার উপর তাঁর লেখায় ভঙ্গি কয়েকটি ক্ষেত্রে এতই বহির্মুখ ও হৃদয়হীন যে তা খুঁটিয়ে পড়া সাধারণ পাঠকের পক্ষে অধ্যবসায়ের সামিল হয়ে থাকে। তবু ঐ সব ক্ষেত্রে বিষয়টির যথার্থতা স্বীকার করে নিয়েও বলা যায়,

লেখকের রচনার স্থায়ী একটি অসামান্য গুণ—কথার পিঠে কথা বসানোর অর্থাৎ সংলাপের বক্রতাময় নৈপুণ্যগুণ পাঠককে একেবারে বিমুখ করে না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রুটিহীন সাহিত্যিক ও শরৎচন্দ্রের মত ভাষার কারুশিল্পী হয়ত নন, কিন্তু বলিষ্ঠতার যে পথে তিনি স্বকীয় সেখানে তিনি স্বয়ং একটি গোষ্ঠী। দারিদ্র্যের সঙ্গে কেবল লেখনী-সহায়ে সংগ্রাম করেছেন তিনি। পর্যুদস্ত হয়েও ধৈর্য হারাননি। আরও দেখা যায় অভিজ্ঞতার বহু বিচিত্র পথে তাঁর খেয়ালী অভিযাত্রিক মনোভাবই তাঁর উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রের নিয়ামক হয়েছে। পরবর্তী আজকের লেখকদের ঐভাবে বাধা ডিঙিয়ে একাগ্রভাবে এগিয়ে চলার নজির মানিকের কাছ থেকেই সংগ্রহ করতে হবে।



মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পী-ব্যক্তিত্ব

নারায়ণ চৌধুরী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যে একটি অনন্য নাম। তাঁর চিন্তা আলাদা, দৃষ্টিকোণ আলাদা, জীবন ও সমাজকে বিশ্লেষণ করার পদ্ধতিও আলাদা। বাংলা সাহিত্যে সমাজ-বাস্তবতার তিনি পথিকৃৎ তো বটেই, অদ্যাবধি এই ক্ষেত্রে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বীও বটেন। এখনও পর্যন্ত বাস্তবতার রূপায়ণে কি তীক্ষ্ণতায় কি গভীরতায় আর কোন লেখক তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে পারেননি।

অবশ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ববর্তী জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা গল্পে ও উপন্যাসে এক ধরনের বাস্তবতার প্রবর্তন করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের রচনায় প্রভূত শক্তিমত্তার পরিচয় থাকলেও উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা ছিল না। কেন তাঁরা কথা-সাহিত্যের আধারে বাংলার সমাজের বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন সে বিষয়ে তাঁদের চিন্তা স্বচ্ছ ছিল কিনা সন্দেহ। তাঁদের লেখায় মানবতার আবেগ যথেষ্টই ছিল কিন্তু মানবতার আবেগকে সমাজ-পরিবর্তনের প্রকরণ হিসাবে ব্যবহার করবার কথা তাঁদের কখনও মনে হয়নি। আর মনে যদি বা হয়েও থাকে, তাতে ইচ্ছার বা আন্তরিকতার জোর ছিল না।

এঁদের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এখানেই পার্থক্য। মানিক তাঁর কথাসাহিত্যকে সচেতনভাবে সমাজ পরিবর্তনের কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি জেনে-বুঝে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর প্রকাশ-মাধ্যম, অর্থাৎ ছোটগল্প ও উপন্যাসের শিল্পকে ব্যবহার করেছিলেন। অন্ততঃ চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে আরম্ভ করে তাঁর মৃত্যুর দিন (১৯৫৬) পর্যন্ত সময়-সীমার মধ্যে তিনি যা-কিছু লিখেছিলেন তাতে যে এই উদ্দেশ্য বিশেষ সক্রিয় ছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। উদ্দেশ্যটি আর কিছু নয়, এই পচনশীল ঘুণে-ধরা মুমূর্ষু সমাজ-ব্যবস্থাকে গুঁড়িয়ে ফেলে তার সমাধি-ভূমির উপর সমসমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করা—এমন সমাজ, যেখানে অন্যায় থাকবে না, ধনী-নির্ধনের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে শ্রেণীহীন

সমাজের উদ্ভব হবে। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই মানিক তাঁর শেষ পর্যায়ের যাবতীয় লেখা লিখেছিলেন। তাঁর লেখনী চালনার আর ভিন্নতর কোন লক্ষ্য ছিল না।

পূর্বোল্লিখিত লেখকদের সামনে এমন কোন উদ্দেশ্যের পোষকতা ছিল তার প্রমাণ নেই। তাঁদের মানবতার আবেগ মানবতার আবেগে এসেই ঠেকে গিয়েছিল, মানবতাকে ছাপিয়ে ও ছাড়িয়ে তা সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে সমুত্তীর্ণ হতে পারেনি। জগদীশ-শৈলজানন্দ-প্রেমেন্দ্র প্রমুখের বাস্তবতা অনির্দেশ্য ও অসংজ্ঞেয় বাস্তবতা, মানিকের বাস্তবতার মত তাকে লক্ষ্যবেধী বাস্তবতা বলা চলে না।

শুধু তাই নয়, এঁদের সঙ্গে মানিকের আরও তফাৎ এখানে যে, মানিক *শুধু সাহিত্যের অঙ্গনেই সমাজ-পরিবর্তনের জন্য কাজ করেননি, জীবনের এলাকাতেও সমাজ-পরিবর্তনের উদ্দেশ্যকে জয়যুক্ত করবার জন্য কাজ করে-ছিলেন। তিনি একাধারে ছিলেন শিল্পী ও কর্মী। শিল্পচর্চার সঙ্গে কর্মিষ্ঠতার এমন সংযোগ লেখকদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না।* তিনি চল্লিশের দশকের প্রায় মাঝামাঝি সময় থেকে, ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যপদভুক্ত হন এবং একজন নিষ্ঠাবান্ রাজ-নৈতিক দলীয় কর্মীর মত দলের সমস্ত শৃঙ্খলা-বিধি, কর্তব্য কর্মের নির্দেশ পরম বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করেন। সেই সঙ্গে চলতে থাকে তাঁর অবিশ্রান্ত সাহিত্যের অনুশীলন। ভগ্নস্বাস্থ্য ও দারিদ্র্য বারে বারে তাঁর সাধনা বিপর্যস্ত করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন বিপ্লবী আদর্শে দীক্ষিত ও সেই আদর্শের বাস্তব রূপায়ণে সংকল্পবদ্ধ, সেই কারণে শত বাধা-বিপত্তির মধ্যেও তাঁর সংগ্রামশীলতা তথা শিল্পনিষ্ঠা অজেয় থেকেছে। কোন কিছুতেই তাঁকে অবদমিত করতে পারেনি। শুধু শিল্পী হলে এরকম কঠিন যুদ্ধ একনাগাড়ে তিনি চালিয়ে যেতে পারতেন কিনা সন্দেহ, তাঁর দলীয় শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্যপরায়ণতা ও কর্মীর ভূমিকাই তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

লোকে বলে, রাজনীতির বন্ধন শিল্পীর পক্ষে মারাত্মক ; তাঁকে প্রায়শঃ শিল্পীর স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত করে প্রচারবাদীতে রূপান্তরিত করে। এ কথা যে কত ভুল, তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেলায় চোখে পড়ে। বরং দেখা যায়, রাজনৈতিক দীক্ষায় দীক্ষিত হওয়ার পর থেকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পী-সত্তার প্রকৃত স্ফুরণ হয়েছিল। তাঁর প্রথম দিক্‌কার রচনায় ফ্রয়েডীয়

মনোবিকলনের রীতির প্রতি অনুরক্তিবশতঃ যে অত্যধিক মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের অভ্যাস লক্ষ্য করা যায়, তা উত্তরকালের লেখায় বহুল পরিমাণে মন্দীভূত হয়েছিল এবং তার ফলে লেখার ধারা অনেক বেশী সহজ, সরল ও বহির্মুখ হয়ে উঠেছিল। মানুষের নির্জ্ঞান ও অর্ধজ্ঞান মনের অন্ধকারে যে-সকল কুটিল ও অসুস্থ চিন্তা ঘুরপাক খেয়ে মরে এবং মানুষের প্রবৃত্তিকে নিম্নগামী করবার চেষ্টা করে, তার উপর মনোবিকলনের তীব্র সন্ধানী আলো ফেলে তাকে চিরে-ফেঁড়ে ব্যবচ্ছেদ করবার একটা ঝোঁক প্রথম বয়সের রচনার পর্বে মানিককে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে, তা একটা দুরারোগ্য আবেশের মত হয়ে দাঁড়ায়। এ আবেশ অন্তর্নিবেশমূলক, কাজেই আত্মকেন্দ্রিক। সমষ্টি ভাবনায় মানিকের উদ্ভাসিত হওয়া না পর্যন্ত মানিক এই আত্ম-কেন্দ্রিকতার অভ্যাস থেকে মুক্তি পাননি—তাঁর রচনায় বহির্জীবনের রৌদ্রালোক ছড়িয়ে পড়েনি।

মানিকের লেখক-জীবনে এই বহিশ্চেতনার স্ফুরণ হয় তাঁর মার্কস্‌বাদী আদর্শে দীক্ষা গ্রহণের পরে। তখন থেকে তাঁর লেখনীর আর ব্যক্তিভিত্তিক মনোবিকলনের প্রক্রিয়ায় আগের উৎসাহ দেখতে পাইনে, বরং দেখি যে, তিনি সমষ্টিভূত সাধারণ মানুষের সংগ্রামশীল জীবনকে গল্পে ও উপন্যাসে চিত্রিত করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। ব্যক্তি মনের অন্ধকার গলি-ঘুঁজিতে পথ-পরিক্রমা করার বদলে এখন থেকে তাঁর কাজ হয়ে দাঁড়ালো সংগ্রামী জনতার সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকে কথাশিল্পের আঙ্গিকে প্রণালীবদ্ধ রূপ দেওয়া। অর্থাৎ ফ্রয়েডকে বর্জন করে তিনি মার্কস্‌কে তাঁর শিল্পশক্তির নিয়ামকরূপে গ্রহণ করলেন। মানিকের উত্তর-পর্বের রচনায় দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌলিক রূপান্তর বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

আমাদের সাহিত্যের অন্যান্য কথাকারদের মত মানিক কেবল সমস্যা উত্থাপন করেই ক্ষান্ত থাকেননি, তিনি সমস্যা প্রতিকারের পথও বাতলে দিয়েছেন তাঁর লেখায়। এইভাবে তাঁর বাস্তবতা পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। কোথাও অর্ধপথে থেমে থাকেনি। মানিক দেখিয়েছেন, এই অসাম্য-বৈষম্য-অত্যাচার-প্রপীড়িত সমাজে সবলের হস্তে দুর্বলের লাঞ্ছনা কখনই অপরিবর্তনীয় বিধানস্বরূপ গণ্য হতে পারে না, বেঁচে থাকতে হলে অন্যায়ের প্রতিরোধ করা চাই, মারের বদলে মার দেওয়া চাই। বিনা প্রতিবাদে মুখ বুজে সব সহ্য করে গেলে অত্যাচারকে উৎসাহিত করা হয়

অত্যাচারীকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ইতিহাসের তা কখনও অভিপ্রায় হতে পারে না।

মানিক আরও দেখিয়েছেন, মধ্যবিত্ত তথাকথিত ভদ্রলোকের সমাজ ভিতরে ভিতরে একেবারেই ফোঁপরা হয়ে গেছে, ফাঁকি ও মেকিতে তার আগাপাশতলা ভরা। ভণ্ডামি এই সমাজের কুলচিহ্ন বললেও চলে। জোড়াতাড়া দিয়ে এই সমাজকে টিকিয়ে রাখা যাবে না, এর ধ্বংসই কাম্য। অন্যপক্ষে যাদের আমরা ছোটলোক আখ্যা দিয়ে প্রায়শঃ তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখি, সেই শ্রমিক ও কৃষক সমাজের মানুষগুলির মধ্যে রয়েছে অনন্ত বিকাশের সম্ভাবনা। তাদের লড়াকু জীবনই তাদের অস্তিত্বের সার্থকতার সবচেয়ে বড় নিশানা। মানিক শেষের দিকে যত ছোটগল্প লিখেছেন তার সব কটিরই মূল উপজীব্য এই বক্তব্য। বিষয়বস্তুর রূপায়ণে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের প্রভাব নেই, প্রতিটি গল্পের বক্তব্য ঋজু, স্পষ্ট, জটিলতার কুয়াসা বর্জিত। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে সমষ্টি জীবনের দিকে চিন্তার মোড় ফেরার ফলেই যে এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সমষ্টি-চেতনার মত প্রতিষেধক আর নেই। তা অনেক রোগের নিদান, অনেক অভিশাপ থেকে মুক্তির উপায়। আত্ম-কেন্দ্রিকতার ব্যাধিই যে অভিশাপগুলির মধ্যে প্রধান, সেকথা বলাই বাহুল্য। মানিকের শিল্প-জীবনে ফ্রয়েডীয় অপবিজ্ঞানের প্রভাব গোড়ার দিকে তাঁকে ভুল পথে চালিত করেছিল, এটা কল্লোলীয় লেখকদের প্রভাবসঞ্জাত তাৎকালিক সাহিত্যিক পরিবেশেরই ফল বলে সন্দেহ হয়; পরে ওই পথ থেকে তিনি সম্পূর্ণ সরে আসেন। বিজ্ঞানসম্মত সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রভাবে তাঁর মুক্তিস্নান ঘটে। যৌনতা নয়, অর্থনীতিই মানবীয় সমাজ-প্রবাহের মূল নিয়ামক,—এই বোধে উদ্দীপ্ত হওয়ার পর থেকে তাঁর শিল্পের গতিমুখের আমূল ক্ষেত্র-বদল হয়।

মানিক-সাহিত্য বাংলাভাষায় ফ্রয়েডবাদ থেকে মার্কসবাদে উত্তরণের এক মহোজ্জ্বল শৈল্পিক প্রতিরূপক। সমাজ-বাস্তবতার এমন নিখুঁত ও সুদক্ষ কলাকার এখন পর্যন্ত বাংলা কথাসাহিত্যে আর দ্বিতীয় আবির্ভূত হননি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্যের গভীরে যতই প্রবেশ করা যায় ততই দেখা যায়—এ লেখক এমন এক অসাধারণ মনের অধিকারী যার

অনন্যতা তাঁর বাল্যের জীবন থেকেই স্পষ্ট। অন্য কারও সঙ্গে তাঁর মনের গড়ন মেলে না। তাঁর সম্পর্কিত জীবনী-গ্রন্থগুলির পরিচিতি এবং অন্যান্য সূত্র থেকে আহৃত তথ্যাদি থেকে দেখা যায়—ছোটবেলা থেকেই তিনি গতানুগতিকতা-বিরোধী, সাহসী, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়। একদিকে দুরন্ত, চঞ্চল, বেপরোয়া, অন্যদিকে নির্জনতাপ্রিয়, একাচারী, ভাবুক। চিন্তাশীলতা তাঁর স্বভাবের এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। হাস্যপরিহাসপ্রবণতা, উচ্ছলতা, স্ফূর্তিমত্ততা, উৎসাহের আধিক্য এসব তাঁর স্বভাবের বিপরীত ছিল। বরং এক ধরনের গাম্ভীর্য, অন্তর্লীনতা, আত্মমগ্নতা, সততা তাঁর ব্যক্তিত্বকে ঘিরে থাকত, যাতে তাঁকে বাইরে থেকে ভুল বোঝার অবকাশ ছিল। সঙ্গী হিসাবে তিনি যে খুব স্পৃহনীয় ছিলেন তা বলা যায় না, বরং এই বললেই ঠিক বলা হয় যে, তাঁর সহজাত আত্মমগ্ন স্বভাব ও ভাবুকতা বন্ধুত্বকে আকর্ষণ করার পরিবর্তে বন্ধুত্বকে প্রতিহত করতেই বেশী সাহায্য করত। উচ্ছ্বাস তাঁর আসত না, সব কিছুরই তল পর্যন্ত অনুসন্ধান করে দেখার প্রবৃত্তি ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কারণ বিচার করে দেখার অভ্যাস তাঁর স্বভাবে এমন একটা বৈজ্ঞানিক নির্মোহ ও নিরপেক্ষতার সৃষ্টি করেছিল যে, তার সংস্পর্শে এলে উচ্ছ্বাসের প্রবণতা পালাবার পথ খুঁজে পেত না। তাঁর বৈজ্ঞানিক নির্বেদ তাঁর আত্মরক্ষার একটা উপায় ছিল। কখনও কখনও সেটা দাম্ভিকতা বলে মনে হওয়াও আশ্চর্য ছিল না।

অথচ মানুষটি ছিলেন ভিতরে-ভিতরে গভীর মানবপ্রেমী। মানুষের দুঃখে' দৈন্যে কাতর। অন্তরে মানুষকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন অথচ বাইরে সে মনোভাবের প্রকাশ দৃশ্যতঃ হৃদয়তাপ-বর্জিত, কতকটা শুষ্ক—এই বৈপরীত্যের যে নিয়তি, অর্থাৎ ভুল-বোঝা, তার শিকার তাঁকে প্রায়শঃই হতে হয়েছে। পরিবারেই কি তিনি কম ভুল-বোঝার শিকার হয়েছেন? পরিবারের অন্যান্যরা তাঁকে ভাল বুঝতে পারত না। আর এই বিমূঢ়তার মূলে ছিল তাঁর আপন প্রহেলিকাময় স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ মনোভঙ্গী।

পিতা সরকারী কাজ থেকে অবসর নিয়ে পুত্রদের সঙ্গে ছিলেন, ভাইয়েরা সকলেই মোটামুটি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন, বিশেষ জ্যেষ্ঠাগ্রজ উচ্চ সরকারী দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত, তিনি ছিলেন কলকাতা আবহাওয়া অফিসের প্রথম ভারতীয় অধিকর্তা। অথচ ভায়েদের সংসারের এই স্বাচ্ছল্যের পরিবেশ এই সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত অসাম্য ও বৈষম্যের কারণে তাঁর অস্বস্তিকর মনে

হতো এবং তার গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য তাঁর প্রাণ ছটফট করত। মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনযাত্রা যে সকল অভ্যাস ও সংস্কারের উপর দাঁড়িয়ে আছে সেগুলির কৃত্রিমতা, অসারতা, ভণ্ডামি খুব ছোট বয়স থেকেই তাঁর চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর মন বিদ্রোহ করেছিল। *প্রকৃতপক্ষে মানিক-সাহিত্যের অন্যতম এক স্থায়ী ভাবই হলো—ফাঁকি ও মেকিতে ভরা জীবনাদর্শের বিরুদ্ধে এক কঠোর সমালোচনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী।* মধ্যবিত্ত মানসিকতার এমন আপসহীন বৈরী বাংলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয় দেখা যায় না।

এ এক অদ্ভুত মানুষ, যিনি সাচ্ছল্যের আবহাওয়ায় হাঁসফাঁস করেন এবং স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যের স্তরে নেমে আসবার জন্য পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হতেও দ্বিধা করেন না। বস্তুতঃ তিনি উত্তর-জীবনে তা-ই হয়েছিলেন, declassed হবার সাধনায় কার্যতও দারিদ্র্যের কোঠায় নিজেকে নামিয়ে এনেছিলেন। গরিবের খাতায় তিনি নাম লিখিয়েছিলেন বাধ্যবাধকতার চাপে ততটা নয়, যতটা বিত্তকৌলীন্যের ফাঁপা আদর্শের প্রতি তাঁর ঘৃণা প্রকাশের জন্য। কেননা মানিক সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতেন যে, অসাধু উপায়ে ছাড়া এ সমাজে কেউ ধনী হতে পারে না। একজনকে বড় হতে গেলে অন্যের পায়ের কড়া মাড়াতেই হবে, বহু মানুষের ন্যায়সঙ্গত বাঁচার দাবিকে গলা টিপে হত্যা না করে একজনার পক্ষে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা জমানোর কোনই সম্ভাবনা নেই এই সমাজে—এমনি মজ্জাগত অবিচার ও অন্যায়ে ভরা এই সমাজ-কাঠামো। এ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, শোষণ ও পাপ। একে ভেঙে ফেলাই এর অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র পথ।

মানিকের এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে তাঁর দক্ষিণ কলকাতার ভায়েদের সংসারের বনেদী পরিবেশ ছেড়ে উত্তর কলকাতার বরানগর অঞ্চলের বনহুগলীর পাড়ায় চলে আসা একটা রূপকের তাৎপর্য ধারণ করে। মুষ্টিমেয়ের সুখভোগের সংস্কারকে পরিত্যাগ করে এ জনমানুষের ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে মেলাবার আন্তরিক প্রয়াসেরই এক প্রতীক। এই স্বেচ্ছা-দারিদ্র্য বরণ অগণিত সাধারণ খেটে-খাওয়া লোক নিয়ে গঠিত শ্রেণীহীন মানুষের মেলায় সামিল হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ। এক গোত্র থেকে অন্য গোত্রে চলে আসার দ্যোতক। গণসাহিত্য রচনা করতে হলে সত্যসত্যই

গণমানুষের একজন হতে হবে, এই বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত এই ঘটনার অন্তর্নিহিত মনোভাব। মনোভাবটির পিছনে যে কী পরিমাণ ও কী কঠিন আত্মবিলোপ লুকিয়ে আছে তা একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারব। আমরা মুখে গোত্রান্তরণের কথা বলি, ধরতাই বুলির মত declassed হওয়ার আওয়াজ কপচাই, কিন্তু declassed হওয়া, গোত্রান্তরিত হওয়া যে কী দুঃসাধ্য ব্যাপার মানিকের দৃষ্টান্ত থেকে বোধ হয় তার কতকটা আঁচ পাওয়া সম্ভব।

এই থেকেই বোঝা যাবে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনটি কী অসামান্য ধাতুতে গড়া ছিল। গতানুগতিকতার ধাত তাঁর একেবারেই ছিল না। ছোটবেলা থেকেই গড়পড়তা চিন্তার ধারা থেকে তাঁর চিন্তা ভিন্ন রাস্তা বেয়ে চলত। এইজন্য তাঁকে আয়াস-প্রয়াস করতে হয়নি, অন্য দশজনার থেকে আপনাকে স্বতন্ত্র প্রতিপন্ন করবার চেষ্টার লোক-দেখানো অঙ্গ এটা ছিল না; এ ছিল তাঁর একান্ত স্বাভাবিক প্রকৃতি। চিন্তাশীলতার অভ্যাস তাঁতে সহজাত ছিল।

চিন্তা অনিয়ন্ত্রিত হলে সেটা ব্যাধির পর্যায়ে পড়ে। কথাতেই বলে চিন্তারোগ। মানিকের প্রতিভার প্রতি কোনরূপ কটাক্ষ করা অবশ্যই আমার অভিপ্রায় নয়, তা সত্ত্বেও বলছি, তাঁর অতিরিক্ত চিন্তাপ্রবণতা তাঁর পক্ষে পুরোপুরি শুভংকর হয়নি। তা কখনও কখনও তাঁকে অসুস্থতার কিনারায় নিয়ে ফেলত। তাঁর স্বীয় জবানী থেকেই আমরা জানতে পারি বালককাল থেকেই তাঁর বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ছিল অফুরন্ত। কার্য-কারণের রহস্য তাঁকে ভাবিয়ে তুলত। প্রতিটি জিনিসের 'কী ও কেন' খুঁটিয়ে বিচার করে তার শেষ অবধি না দেখা পর্যন্ত তাঁর চিত্তের তৃপ্তি ছিল না। কি জাগতিক ঘটনা, কি মানবীয় আচরণ, তার মূলে গিয়ে বিষয়টির তাৎপর্য অনুসন্ধান না করা পর্যন্ত তাঁর চিন্তার আবেশ ঘুচত না।

এই আবেশ থেকেই তাঁর প্রথম বয়সের সাহিত্য-সৃষ্টিতে ফ্রয়েডীয় মনো-বিকলনের অভ্যাসের জন্ম। প্রাগৈতিহাসিক, সরীসৃপ, টিকটিকি, 'বৌ' পর্যায়ের গল্প প্রভৃতি বিভিন্ন ছোটগল্প বলুন আর জননী, দিবারাত্রির কাব্য, পুতুলনাচের ইতিকথা, এমনকি পদ্মানদীর মাঝি প্রভৃতি উপন্যাস বলুন—তাঁর প্রথম দিককার বড়ছোট প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে চিন্তার আতিশয্য প্রকট। মানুষের অন্তর্জীবন ও তৎসঞ্জাত মনস্তত্ত্বকে চিরে-ফেঁড়ে বিশ্লেষণ-ব্যবচ্ছেদ

করবার প্রবৃত্তি তাঁর ভিতর এমন একটা obsession বা আচ্ছন্নতার সৃষ্টি করত যে, এটা প্রায় তাঁর দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়ে পড়েছিল বললেও চলে। দ্বিতীয় স্বভাব বলছি এই কারণে যে, পরবর্তী জীবনেও তিনি এই অভ্যাস থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেননি, যদিও মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক সমাজদর্শনের প্রভাব তাঁর এই আবেশ দূরীকরণে বহুল পরিমাণে তাঁকে সহায়তা করেছিল। সমষ্টি চেতনার পাবক-স্পর্শে তাঁর ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনার অগ্নিশুদ্ধি ঘটেছিল।

আসলে মানিকের সাহিত্যে যে সহজ দার্শনিকতা ও ভাবুকতার পরিচয় পদে পদে দেখতে পাওয়া যায়, তা তাঁরই মনের প্রক্ষেপ। প্রথম জীবনে ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞানতত্ত্বের প্রভাবে তা আত্মকেন্দ্রিক বিকৃতির পথে চলেছিল, পরে মার্কসীয় বিজ্ঞানের আরোগ্য-ক্ষমতার কল্যাণে তা সুস্থ পথে সংস্থিত হয়। মানিক আত্মস্থ হয়ে ওঠেন। তবু তিনি জন্ম-ভাবুক, জন্ম-দার্শনিক। বৈজ্ঞানিক কৌতূহল তাঁর এই মানসিক বৈশিষ্ট্যকে আরও তীক্ষ্ণতর করে তুলেছিল মাত্র। 'সোনার চেয়ে দামী' তাঁর উত্তর-জীবনের উপন্যাস। সেখানে ব্যক্তি-চেতনাকে দাবিয়ে রেখে গণ-চেতনার কথাটাই বিশেষভাবে বলবার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু সেখানেও মানিক এক জায়গায় বলছেন—"সব মানুষেরই দর্শন আছে, দার্শনিক আলোচনা ছাড়া কোনও মানুষের চলে না। জীবনদর্শন ছাড়া মানুষের জীবন নেই কোন স্তরের। হয়তো সেটা পণ্ডিতদের দর্শন নয়, ছাঁকা তত্ত্বের জটিল দর্শন নয়। নিজেরই জ্ঞান-বুদ্ধি অভিজ্ঞতা শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কারের দর্শন, নিজের জীবন আর জগৎটার একটা নিজের বোধগম্য মানে খাড়া করার দর্শন।"

এই জাতীয় দর্শন মানিকের মানস-গঠনের ভিতর বিলক্ষণ মাত্রায় ছিল এবং প্রথম থেকে শেষাবধি তাঁর জীবনকে অধিকার করে ছিল—তার প্রমাণ তাঁর সাহিত্য। তবে প্রথম বয়সের তুলনায় শেষের দিকে তার প্রভাব কমে এসেছিল এবং মার্কসীয় বিজ্ঞানের বহির্মুখ সমষ্টি-চেতনার ঝোঁক তাঁর আত্ম-কেন্দ্রিকতার প্রতিষেধক হয়েছিল। বহু মানুষের কল্যাণের চিন্তা যখন মনের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন আপনাকে কেন্দ্র করে আপনি আবর্তিত হওয়ার যে অন্তর্নিবেশমূলক অভ্যাস ব্যক্তিকে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে দেয়, তার থেকে তার মুক্তি ঘটে। মানিকের জীবনে ও সাহিত্যে শেষের দিকে এমন মুক্তি ঘটেছিল। ফ্রয়েডবাদ থেকে মার্কসবাদে উত্তরণ

তাঁর চিন্তার গতিপথকে সুস্থখাতে চালিত করেছিল, তাঁর দার্শনিকতাকে খাদমুক্ত করেছিল।

অবশ্য এ কথা মনে রাখা দরকার যে, মানিক মূলতঃ সাহিত্যিক, শিল্পী গোত্রের মানুষ; আকাডেমিক মেজাজের দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক নন। উত্তর-জীবনে তিনি মার্কস্ এঙ্গেল্স-এর গ্রন্থাবলী নাড়াচাড়া করলেও তার থেকে কতটা চিন্তার ডিসিপ্লিন আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন, বলা শক্ত। অথবা, বিজ্ঞানের 'কী ও কেন'• নিয়ে তিনি সবিশেষ ভাবিত ছিলেন বলে প্রায়ই যে আত্মপ্রসাদের ভঙ্গীতে প্রচার করতেন সে-আত্মপ্রসাদও যথেষ্ট সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল কিনা সন্দেহ। সত্যি কথা বলতে, যথার্থ বিজ্ঞানের জগৎ থেকে তিনি বহু বহু দূরে অবস্থিত ছিলেন। তাঁর একটা তাজা ধরনের কাঁচা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ছিল মাত্র, বিজ্ঞানের প্রণালীবদ্ধ বস্তুনিষ্ঠ চিন্তা অনুশীলনের সুযোগ বা সামর্থ্য তাঁর ছিল না।

আসলে তিনি ছিলেন একান্তভাবেই শিল্পী, কিতাবী ধারার বাইরের জগতের মানুষ। অ্যাকাডেমিক শৃঙ্খলা বা পরিচ্ছন্নতা তাঁর ছিল না, সে তাঁর ভাষার অগোছালো আদর্শ দেখলেই বোঝা যায়। বোঝা যায়, চিন্তার কম-বেশী অসংলগ্ন ভঙ্গী থেকে। তবু এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক অসামান্য প্রতিভাধর সাহিত্যিক। তাঁর ভাববার ধরনটাই আর দশজনার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। গতানুগতিকত্বের লেশ মাত্র ছিল না তাঁর স্বভাব বা ব্যক্তিত্বের মধ্যে। তিনি ছিলেন সহজাত প্রতিভার অধিকারী, প্রতিভাই তাঁকে আর সকলের থেকে আলাদা করে গড়ে তুলেছিল।

তবে প্রতিভা কাঙ্ক্ষণীয় গুণ হলেও তার বিপদও আছে। প্রতিভা প্রায়ই ব্যক্তিবাদের বদ্ধজলায় ঠেকে সমাজ-জীবনের বৃহত্তর স্রোতোধারা থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, মানিকের বেলায় এটা ঘটেনি। বরং ওই প্রতিভারই দৌলতে তিনি উত্তরোত্তর জনজীবনের কাছাকাছি চলে এসেছেন—অগণিত নিপীড়িত শোষিত ভাগ্যহত মানুষের মুক্তির স্বপ্নকে তাঁর সাহিত্যের মূল উপজীব্য বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রথম বয়সের লেখায় আত্মকেন্দ্রিকতার ঝোঁক ছিল, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যধর্মী প্রতিভাসুলভ সমাজবিচ্ছিন্নতার মেজাজ ছিল—এই দুই অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে ক্রমে ক্রমে তিনি জনসমাজের সন্নিকট হয়েছেন, অত্যাচারিত অপমানিত

লাঞ্ছিত মানুষের দুঃখের অবসানকেই তাঁর সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য বলে মেনেছেন। তাদের মুখে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের ভাষা জোগাতে গিয়ে নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা ভুলেছেন, তাদের সঙ্গে আপনাকে সম্পূর্ণ একাত্ম করে দিয়েছেন। গণনাহীন আর্ত-পীড়িত মানুষের কাম্যের সঙ্গে নিজ কাম্যকে এরূপ মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা সচরাচর প্রতিভার বিপরীতধর্মী ব্যাপার, কিন্তু মানিকের প্রতিভার এখানেই বৈশিষ্ট্য যে, তাঁর প্রতিভা ক্রমশঃ ওই বিরল পথ বেয়েই অগ্রসর হয়েছিল এবং এক সময়ে সম্পূর্ণ গোত্রান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।

মানিকের শিল্পী-ব্যক্তিত্বের বিবর্তন ও উদ্বর্তনের ইতিহাসে 'সহরতলী' (১ম পর্ব ১৯৪০, ২য় পর্ব ১৯৪১) উপন্যাস একটি উল্লেখযোগ্য দিক্‌চিহ্ন স্বরূপ। এই রচনার সাক্ষ্য থেকেই প্রথম সংশয়াতীতরূপে বুঝতে পারা গেল—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আর পূর্বের মত ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের কায়দায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক অন্তর্নিবেশচর্চায় উৎসাহী নন, ইতোমধ্যে মনোযোগের ক্ষেত্রবদল হয়ে গিয়েছে, তিনি সমষ্টি-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। সমাজ-কল্যাণ-ভাবনা তাঁর শিল্পচর্চার এক প্রধান উপজীব্যে পরিণত হয়েছে।

এই পর্ব থেকেই মানিকের শিল্পের এক নয়া চেহারা। সেটা দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের কাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘূর্ণাবর্তের কবলে পড়ে বাঙালী সমাজে ইতোমধ্যে প্রচণ্ড ওলট-পালট ঘটে গিয়েছে। গ্রামের চাষীজীবন ছিন্নবিচ্ছিন্ন, মৃত্তিকা থেকে উৎপাটিতপ্রায়। শহরের কলকারখানার শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ চরম অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে, তারা বিক্ষোভে-বিদ্রোহে ফেটে পড়তে চাইছে। যুদ্ধের বিপর্যয়কর আঘাতে-সংঘাতে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের লালিত মূল্যবোধগুলির অনেক কটিরই ভরাডুবি ঘটতে চলেছে, প্রাণান্তকর অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে তাদের সনাতন নীতিবোধ ধূলিসাৎ হবার উপক্রম। টিকে থাকাই যেখানে সমস্যা, সেখানে ভদ্রলোক শ্রেণীর 'ভদ্রলোকী' চালচলন প্রকৃত অবস্থা ঢাকবার পোশাকী আবরণ মাত্র হয়ে উঠেছে, তার বেশী কিছু নয়—তাদের জীবনযাত্রা ফাঁকি ও মেকিতে ভরে উঠেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তর্ভেদী শিল্পদৃষ্টিতে বাংলার এই হৃতদশা গোপন থাকেনি—তাঁর গভীর পর্যবেক্ষক চোখ বাইরের খোলস ভিঙিয়ে সমাজের তল পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল। তাই দেখতে পাওয়া যায় এই পর্যায়ে

আর তিনি আত্মলীনতায় আবদ্ধ নন, ব্যক্তির অবচেতন মনের অন্ধকার গলিঘুঁজিতে ঘুরে ব্যক্তিক আচরণের ব্যাখ্যা সন্ধান করার 'মর্বিড' কৌতূহলের নিবৃত্তি আর তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারছে না। মানুষের মনোলোকের অন্ধকার থেকে বাইরের রৌদ্রালোকে বেরিয়ে এসে তিনি সমষ্টি-জীবনের মধ্যে তাঁর শিল্পের উপকরণ—চিত্র ও চরিত্র খোঁজার কাজে ব্যাপৃত হয়েছেন। অন্তর্মুখী মন বহির্মুখী হয়ে উঠেছে। তাঁর সাহিত্যে বিবরের অন্ধকার ঘুচে গিয়ে চরিত্রগুলি বাইরের আলোয় ভেসে উঠেছে।

বহির্মুখীনতাকে সচরাচর আমরা একটু খাট দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত, অন্তর্মুখীনতাকে সেই তুলনায় অনেক বেশী মূল্য দিয়ে থাকি। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে সমষ্টি-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বহির্মুখীনতা মন্দ অভ্যাস নয় বরং বাঞ্ছিত একটি গুণ। তা অতিরিক্ত চিন্তারোগের প্রতিষেধক এবং কার্যশক্তির উজ্জীবক। তা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার অবলোপকারী সুস্থ সামূহিক এক প্রবণতা।

একে একে তিনি লিখলেন দর্পণ, অহিংসা, হরফ, জীয়ন্ত, চিহ্ন, স্বাধীনতার স্বাদ, সার্বজনীন, শুভাশুভ, আরোগ্য, সোনার চেয়ে দামী, হলুদ নদী সবুজবন প্রভৃতি উপন্যাস। প্রত্যেকটি উপন্যাসে কম বা বেশী পরিমাণে গণচেতনা তথা সংগ্রামী মনোভাবের স্বাক্ষর স্পষ্ট। সেই সঙ্গে রচিত হলো তাঁর মধ্য ও শেষ পর্যায়ের অনবদ্য ছোটগল্পগুলি—অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধই যেগুলির প্রাণ। যেমন হারানের নাতজামাই, পেটব্যথা, বাগদীপাড়া দিয়ে, মাসিপিসি, টিচার, কংক্রীট, শিল্পী, ছোট বকুলপুরের যাত্রী, ওরা ছিনিয়ে খায় না কেন, ইত্যাদি। ফেরিওলা আর দুঃশাসনীয় ভিন্ন রসের গল্প, যুদ্ধকালীন বস্ত্র-সংকটের দুই মর্মান্তিক করুণ চিত্র, বেদনার আর্তিতে বিষাদ-বিধুর, কিন্তু সেখানেও প্রতিরোধের ইঙ্গিত আছে।

মোটকথা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেতনায় যে সংগ্রামের ভাবাদর্শ, লড়াকু মনোভাব খুবই সক্রিয় হয়ে উঠেছে উত্তরকালীন এইসব গল্প আর উপন্যাসসমূহের মধ্যে তার অসংশয় পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠক আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করবেন, এই পর্বের রচনায় ব্যক্তি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিকলন আর তাঁকে আকর্ষণ করতে পারছে না; সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের সমস্যাগুলি তাঁর চোখে ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে। সমাজের কায়েমী-স্বার্থবাদীদের অবদমন-অত্যাচার-শোষণের পিঠে সাধারণ মানুষের অস্তিত্ব-

রক্ষার সংগ্রাম এবং সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের চিত্র তাঁর লেখায় উত্তরোত্তর বেশী মাত্রায় জায়গা জুড়তে শুরু করেছে। একদিকে মালিকের অনিচ্ছুক হস্ত থেকে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার লাভের লড়াই, অন্যদিকে জমিদার-জোতদার-মহাজনদের জোটবদ্ধ নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে গ্রামের কৃষকশ্রেণীর রুখে দাঁড়ানোর ঘটনাবৃত্তে মিলে মানিক-সাহিত্যে বলতে গেলে এখন থেকে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ঘটনার সারিবদ্ধ মিছিল চোখে পড়তে লাগলো। সেই সঙ্গে চললো শহরে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের 'ভদ্রলোগামি'র মুখোসটি খুলে ধরার ক্ষমাহীন প্রক্রিয়া। এই পচনশীল ঘুণে-ধরা 'নড়্‌বড়ে' সমাজ-ব্যবস্থাটাকে রিফুকর্ম করে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টায় যে কারও কোন লাভ নেই, তাকে ভেঙে ফেলাই সকলের পক্ষে মঙ্গল—এই বিপ্লবী বাণীই হয়ে উঠলো তাঁর নূতন পর্যায়ের রচনাগুলির মূল অন্বিষ্ট। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই ছিল তাঁর অমলিন সাহিত্য-বেদ।

২

দীর্ঘাকৃতি চেহারা, লম্বায় ছ'ফুটেরও উপরে, গায়ের রঙ কালো, দোহারা গড়ন, মাথার চুল অবিন্যস্ত, মুখের ভাবে ঋজু কাঠিন্য, চোখের দৃষ্টি প্রখর—এই হলো সংক্ষেপে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেহ-গঠনের বৈশিষ্ট্য। শিল্পীদের চেহারা সাধারণতঃ যে রকমের হয়ে থাকে—মুখের রেখায় নরম কোমল আদল, চোখের দৃষ্টিতে স্বপ্নালুতা, বড় বড় এলানো চুল, চালচলনে সযত্ন ঔদাস্য, কথায় বার্তায় মার্জিত উচ্চারণের পালিশ—এ সবের সঙ্গে এ মানুষটির ধরন-ধারণ, করণ-কারণ, চলন-বলনের আদৌ কোনও মিল নেই। বরং দেখলে প্রথম দৃষ্টিতে কাঠখোট্টা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। চোখের ও মুখের রেখার কাঠিন্য মানুষজনকে ঘনিষ্ঠ হতে আমন্ত্রণ জানায় না, উল্টো, প্রতিহতই করে। আকর্ষণ অপেক্ষা বিকর্ষণেরই ভাব জাগায় বেশি।

কথায় বার্তায়ও তেমনি ঠোঁটকাটা ভাব, যা কখনও কখনও রূঢ়তার ধার ঘেঁসে যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'আমার সাহিত্য জীবন' স্মৃতিকথায় একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যার থেকে মানিকের স্বভাবের এই দিকটার অর্থাৎ তাঁর পরুষভাষিতার কিছু আভাস মেলে। তারাশঙ্কর

।রে তাঁর 'মহানগরী' উপন্যাসে একই ঘটনাকে নাম আড়াল করে বর্ণনা করেছেন কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয় না মানিকই তাঁর বর্ণনার লক্ষ্য। এই ঘটনার বর্ণনায় মানিকের যে-রূপ ফুটে উঠেছে তাকে শুধু কাঠখোট্টা বললেই যথেষ্ট বলা হয় না, বলা উচিত কতকটা বা চোয়াড়ে। একবার ট্রাম ভ্রমণ উপলক্ষে কোনও এক ট্রাম-কণ্ডাক্টরের সঙ্গে বচসা হয়, বচসা নিছক কথাকাটাকাটিতেই সীমিত থাকেনি, হাতাহাতি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল, যার উল্লেখ পাওয়া যায় ডক্টর সরোজমোহন মিত্রের 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য' বইয়ের জীবনী অংশে। মানিক স্বয়ং তাঁর আত্মকথায় কবুল করেছেন প্রকাশকের কাছে পাওনা থাকলে তিনি প্রয়োজন হলে গলায় গামছা দিয়ে সে টাকা আদায় করতে পেছপা হতেন না।

আকৃতি ও আচরণ গত এইসব বিবরণ থেকে মনে হতে পারে মানুষটা ছিলেন প্রেমহীন—ভব্যতা ও শিষ্টতা বর্জিত এক চাঁচাছোলা উদ্ধত প্রকৃতির ব্যক্তি। কিন্তু যাঁরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুব কাছে থেকে দেখেছেন ও তাঁর সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত আছেন তাঁরা জানেন মানিক একেবারেই বিপরীত স্বভাবের লোক ছিলেন। মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অন্তহীন ভালবাসা ; বিশেষ, নির্যাতিত ও শোষিত স্তরের ভাগ্যহত লোকজনের প্রতি তাঁর দরদের সীমা-পরিসীমা ছিল না। স্বীয় সাহিত্য কর্মকে দলিত-বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষের দুঃখ-বেদনার উপযুক্ত ভাবপ্রকাশক সৃষ্টি-মাধ্যমে পরিণত করে তোলার জন্য তাঁর নিরন্তর প্রয়াস ও অশ্রান্ত যত্ন লেখক হিসাবে নম্র-বিনীত সত্তার প্রতিই অঙ্গুলিক্ষেপ করে, তাঁকে অশিষ্ট বলে আদৌ চিহ্নিত করে না। নিজের লেখাকে সর্বপ্রকার ফাঁকি ও মেকি থেকে মুক্ত করবার জন্য নিজের উপর সতত যে ক্ষমাহীন দাবির বহর চাপাচ্ছেন তার থেকে তার সত্যনিষ্ঠ প্রকৃতি, আন্তরিকতা মণ্ডিত স্বভাব ও নিজের ভুলত্রুটি সম্পর্কে সচেতন এক আত্মসমালোচক সত্তার পরিচয়টাই সব ছাড়িয়ে বড় হয়ে ওঠে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'লেখকের কথা' বইতে নিজের লেখাকে উত্তরোত্তর সত্যময় করে তোলবার জন্য, অর্থাৎ জন-জীবনের ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর নৈকট্যে উন্নীত করবার জন্য যে-অবিরত আত্ম-পরীক্ষার মধ্যে ছিলেন ও সর্বদা অতৃপ্তির যন্ত্রণায় ভুগতেন তার কথা লিখেছেন। এ তাঁর যথার্থ শিল্পীজনোচিত স্বভাবের ইঙ্গিত দেয় ও তাঁকে একজন প্রথম শ্রেণীর সত্যানুরাগীর মর্যাদায় ভূষিত করে। সরোজবাবুর বইয়ের বিবরণ

থেকে পাই, যে-মানুষকে বহিরঙ্গ বিচারে রুক্ষকঠোর বলে মনে হতো সেই মানুষই তাঁর আপন লেখা গল্প ও উপন্যাসের অনুকৃত সমালোচনা সোভিয়েত সুহৃদ্ সঙ্ঘ ও প্রগতি লেখক সঙ্ঘের বৈঠকাদিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপার ধৈর্য ও বিনয়ের সঙ্গে শুনতেন। সমালোচকের বিরূপ মন্তব্যে চটে যেতেন না, বরং সমালোচকের বক্তব্য সহিষ্ণুতার সঙ্গে বোঝবার চেষ্টা করবেন এবং তাঁর সমালোচনায় প্রণিধানযোগ্য কিছু থাকলে তাকে গ্রহণ করতেন। নিজের ভুলত্রুটি শোধরাবার জন্য তাঁর বিরামবিহীন চেষ্টা ও সদাসজাগ দৃষ্টি তাঁর এমনই একটি সত্তার সঙ্গে আমাদের পরিচিত করায় যাতে করে তাঁকে একজন অবিশ্রাম যত্নপ্রয়াসী পরীক্ষাপাশে বদ্ধপরিকর স্কুলের ছাত্রের সঙ্গে তুলনা করতে সাধ জাগে।

এই অপার নম্রতা ও বিনয় কি তারাশঙ্করের বর্ণিত ঘটনার ঔদ্ধত্যের সঙ্গে মেলে? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাহ্যিক চলনে-বলনে কথায় আলাপে সব সময় হয়ত প্রচলিত সমাজ ব্যবহারের 'নর্ম' মানতেন না, তা বলে তাঁকে কি সংবেদনশীলতার অভাবের দায়ে দোষী করা যায়? এত বড় যিনি লেখক তাঁর বাইরেটা যেমনই হোক অন্তরের গভীরে অনুভূতির অতলতা না থেকে কি পারে? বাইরে তিনি কখনও-সখনও আপাতরূঢ়তার নির্মোক ধারণ করতেন কিন্তু সে শুধু এই হৃদয়হীন ক্রুর সংসারের আত্মীয়তার তাপ বর্জিত শুষ্ক পরিবেশের নিষ্করুণ্যের ভিতর প্রাণান্তিক আত্মরক্ষার তাগিদেই। সময় বিশেষে এই সমাজে পরকে ঘা না দিয়ে চলা যায় না। এই অসুস্থ ও অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতা তাড়িত সংসারে সকলেই যেখানে নিজ নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির আশায় উদ্দাম বেগে ধেয়ে চলেছে, অপরের পায়ের কড়া না মাড়িয়ে যেখানে চলার উপায় নেই, এমনকি পরকে ল্যাং মারতেও আটকায় না; সেস্থলে নিছক টিকে থাকবার গরজেই সময় সময় প্রত্যাঘাত করবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মানিককেও সম্ভবতঃ এই প্রয়োজনেই মাঝেমধ্যে রূঢ়ভাষী হতে হয়েছে। তিনি নিজেই লিখেছেন, র‍্যাশন না তুললে যে-লেখকের সংসারে পরের দিন হাঁড়ি চড়বে না, সে-লেখকের পাওনা নিয়ে 'আজ-নয়-কাল' গড়িমসি করা, প্রকাশকের সঙ্গে মিষ্ট-মধুর বিশ্রম্ভালাপের চালে কথা বলা সাজে না। তাঁকে আবশ্যকমত নরম-গরম দু চারটে কথা শুনিয়ে দিতে হয়ই। প্রয়োজনে হক্ কথা শুনিয়ে দেবার মত ক্ষমতা যে-কোনো অভাবগ্রস্ত লোকেরই থাকা উচিত। মানিক অভাবগ্রস্ত ছিলেন,

সুতরাং তাঁর বেলায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবার কোনো কারণ ছিল না।

আসলে এই অসামান্য স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত লেখকটি প্রকৃতিতে ছিলেন রোমান্টিক মানসিকতার ঘোরতর বৈরী। তাই কি প্রচলিত লোক-ব্যবহারে কি সাহিত্যে সৃষ্টিতে তিনি সুযোগ পেলেই রোমান্টিক ধাত-ধরনের বিরোধী মনোভাবের আনুকূল্য করতেন। তেমন প্রয়োজন দেখা দিলে রোমান্টিক মানসপ্রবণতার পর্দা দু'হাতে ছিঁড়ে ফেলতেও ইতস্ততঃ করতেন না। এই সমাজের বাহ্য রূপ যেমনই হোক, তার ভিতরকার প্রকৃত চেহারা জানতে তাঁর বাকী ছিল না। বিশেষতঃ যে-মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে অন্য অনেক বাঙালী লেখকের মত তিনি এসেছিলেন তার অস্থি-সন্ধি হাড়-হদ্দ তাঁর জানা ছিল। মধ্যবিত্তের পোশাকী ভদ্রতার অন্তরালে যে কী বিচিত্র ধরনের নীচতা, ভণ্ডামি ও মিথ্যাচার লুকিয়ে আছে একজন সূক্ষ্মদর্শী মনস্তাত্ত্বিক কথা-সাহিত্যের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে তিনি তার তল পর্যন্ত তলিয়ে দেখার ক্ষমতা রাখতেন। কথাসাহিত্যিক সমাজ-প্রবাহের উপরকার স্রোতটুকু মাত্র লক্ষ করেন, অন্তঃসঞ্চারী স্রোতধারার অস্তিত্ব প্রায়শঃ টের পান না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পী-ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য এখানে যে, তিনি বাঙালী মধ্যস্তরের সমাজজীবনের স্রোতের বহিঃপ্রবাহ ও অন্তঃপ্রবাহ ওই দুয়েরই সন্ধান রাখতেন এবং ওই স্রোতঃপ্রবাহের তলায় কী অপরিমাণ ক্লেদ ও আবর্জনা লুকিয়ে আছে তার তত্ত্বও বিলক্ষণ তাঁর জানা ছিল। সমাজের লোকব্যবহার ও প্রচলিত মূল্যবোধগুলির ধাঁচ-ধরন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে মানিক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, তথাকথিত ভদ্রলোক শ্রেণীর জীবন ফাঁকি ও মেকিতে ভরা, ভিতরে ফোঁপরা আর ঝরঝরে হয়ে গেলেও বাইরের ঠাট-ঠমক বজায় রাখতে তারা সদাসচেষ্ট। প্রত্যেকেটি 'ভদ্রলোক' এক-এক জন মুখোশধারী। পক্ষান্তরে যারা গায়ে-গতরে খেটে খায়, দৈহিক শ্রম বিনিয়োগ করে জীবিকার উপায় করে, সেই শ্রমিক ও কৃষক-সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যেই যা-কিছু সততা ও সাধুতা বিদ্যমান। সততার আসল ভিত্তি হলো মজুরি, আর এই মজুরি কলে-কারখানায় ক্ষেতে-খামারেই শুধু লভ্য।

এ-রকম চিন্তার গড়ন যাঁর তাঁর মধ্যে রোমান্টিক মনোবৃত্তি বেশীক্ষণ বাসা বেঁধে থাকতে পারে না। তাঁর মধ্যে রোমান্টিক মনোবৃত্তির সবচেয়ে কোমল ও পেলব যে-অংশ—প্রেম—তাকেও এই মানুষ সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে

অভ্যস্ত। প্রেমের মধ্যে অতীন্দ্রিয় ধারণার আরোপ, জৈব কামনা-বাসনার তাড়না থেকে মুক্ত করে তাকে 'বিশুদ্ধ' একটা অনুভূতি রূপে দেখা—এ জিনিস মানিকের শিল্প-পরিকল্পনার বহির্ভূত ছিল। তিনি প্রেমের ধারণা থেকে রোমান্টিকতার অবলেপ নিঃশেষে মুছে ফেলে তাকে নিতান্ত দেহ-ভিত্তিক এক আবেগ হিসাবে রূপ দিতে সচেষ্ট হন। এ কথার প্রমাণ স্বরূপে 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসটির সবিশেষ উল্লেখ করা চলে। 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'অহিংসা', 'চতুষ্কোণ' প্রভৃতি বইয়ের প্রেম-চিত্রণকেও এ কথার নজীর হিসাবে খাড়া করা চলে। এ সবই তাঁর মানসিকতার ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের প্রভাবের ফল। ফ্রয়েডের 'লিবিডো' তত্ত্ব যদিও মানিক পরবর্তীকালে অর্থাৎ যখন থেকে মানিক সজ্ঞানে *সাম্যবাদী দর্শনের প্রভাব-পরিধির মধ্যে আপনাকে স্থাপন করেন, অস্বীকার করবার চেষ্টা করেছিলেন, তাহলেও সেই কুহক তিনি তাঁর লেখার ধরন*-ধারণ থেকে একেবারে মুছে ফেলতে পারেননি। একটি কম-বেশী স্থায়ী পশ্চাৎটানের মত এই প্রভাব তাঁর উত্তরকালীন চিন্তাতেও সংলগ্ন হয়ে ছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গীর অতিরিক্ত দেহসর্বস্বতা অবশ্য সঙ্গতভাবেই সমালোচ্য, তবে এর স্বপক্ষে বলবার কথা এই যে, একে রোমান্টিকতার প্রতিষেধরূপে গণ্য করা যেতে পারে। কি ফ্রয়েডীয় স্তরে কি মার্কসীয় স্তরে, মানিক রোমান্টিক কাব্যপ্রবণতার কুজ্ঝটিকা থেকে মুক্ত ছিলেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রার সীমাবদ্ধতার মধ্যে মোটা-মুটি সম্পন্ন গৃহেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলা যায়। তাঁর পিতা ছিলেন সেটেলমেন্টের কানুনগো। ভায়েদের মধ্যে সবার বড় যিনি তিনি সরকারের দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে আসীন ছিলেন। অন্য ভাইদের মধ্যেও কেউ কেউ কৃতী ছিলেন। গোড়ায় একান্নবর্তী যৌথ পরিবারে বাস করতেন, পরে ওই এজমালী পরিবারের বন্ধন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করেন। কিন্তু তিনি কি দারিদ্র্যবিলাসী ছিলেন? সচ্ছলতার পরিবেশ থেকে ইচ্ছা করে সরে গিয়ে গরিব হতে চেয়েছিলেন? কেউ তা চায় না, তিনিও চাননি। তবে কেন তিনি এই কাজ করতে গেলেন? করতে গেলেন এই জন্য যে, তিনি বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তঃসার-শূন্যতার কবল থেকে এই উপায়ে আপনার সত্তাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। শ্রেণীজীবনের কলুষপ্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে শ্রেণীহীন জীবনের স্তরে লগ্ন হয়ে

বাস করবার স্বাদ পেতে চেয়েছিলেন। তিনি যাকে বলে 'ডিক্লাশড' হওয়া তার সাধনায় ব্রত হয়েছিলেন। এদেশের কৃষকেরা ও শ্রমিকেরা চিরাগত-ভাবে দরিদ্র। বিশেষত শহরের উপকণ্ঠ-আশ্রয়ী বস্তিবাসী শ্রমিকদের দুর্দশার সীমা-পরিসীমা নেই। তিনি নিজেকে তাঁদের স্তরে নামিয়ে এনে তাঁদেরই একজন হয়ে বুঝতে চেয়েছিলেন মধ্যবিত্ত জীবন আর শ্রমিক জীবনে কোথায় ফারাক এবং তৌলদণ্ডের পরিমাপে মধ্যবিত্ত অপেক্ষা নিম্নবিত্তের মনুষ্যত্বের পাল্লা ভারী না লঘু। ভারী বলেই তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল, তা নয়তো তিনি সচ্ছল জীবনের স্বচ্ছন্দতার মোহ ছেড়ে আসতে পারতেন না। লক্ষ করবার বিষয়, পরিণত বয়সে তিনি নিজেকে সাহিত্যিক বলতেন না, বলতেন কলমপেষা মজুর। মজুর শ্রেণীর সঙ্গে শুধু শারীরিক নৈকট্য স্থাপনের জন্যই নয়, আত্মিক নৈকট্য প্রতিষ্ঠার জন্যই তাঁর আপনাকে ওই ভাবে বর্ণনা করা। কারখানার মজুর থেকে তিনি কোন মতেই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতেন না। কেবল তফাতের মধ্যে ছিল তাঁর হাতিয়ারের পার্থক্য। কারখানার শ্রমিকের মূল হাতিয়ার তাঁর হাত, আর মানিকের হাতিয়ার তাঁর কলম। কলমও অবশ্য হাতেই গোঁজা থাকে তবে কলম পিষতে হলে পেশী অপেক্ষা মস্তিষ্কের ক্রিয়াশীলতার প্রয়োজন বেশি হয়। ওইখানেই যা ফারাক।

আমি এই প্রবন্ধে অন্যত্র বলেছি, মানিকের দক্ষিণ কলকাতার যৌথ পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশ থেকে স্খলিত হয়ে উত্তর কলকাতার আলমবাজার অঞ্চলের এক দরিদ্র জীর্ণ বস্তি এলাকায় বাসস্থান পরিবর্তন শুধু ওই দুই কলকাতার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যই বোঝায় না, তা একটা গূঢ়ার্থব্যঞ্জক রূপকের তাৎপর্যও বহন করে। ওই রূপক আর কিছু নয়, এক শ্রেণী থেকে আরেক শ্রেণীতে অবতরণের ইঙ্গিতবাহী। অর্থাৎ মধ্যবিত্ত থেকে ভ্রষ্ট হয়ে নিম্নবিত্ত সমাজের সামিল হওয়া রূপ পরিবর্তনের দ্যোতক। কিন্তু এই পরিবর্তনকে অবতরণই বা বলি কেন? উত্তরণ কেন বলব না? কেন একে নিম্নাভিমুখী গতি বলব? এটি উর্ধ্বাভিমুখী গতি নয় কেন? কে কী ভাবে সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তনকে বিচার করে তার উপরেই নির্ভর করে ওই পরিবর্তনের স্বরূপের বর্ণনা। উত্তরণ অবতরণ উর্ধ্ব-অধঃ উচ্চ-নীচ এ সবই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্ন। দৃষ্টিভঙ্গীর বদল হলে নিম্ন উচ্চে রূপান্তরিত হতে কতক্ষণ?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অতিশয় আদর্শবাদী লেখক ছিলেন। আদর্শের সঙ্গে রফা করে চলার নীতিতে তিনি বিশ্বাস করতেন না—সর্বদাই আদর্শের জন্য মূল্য দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। জীবনের শেষ পর্বে নানা কারণে তিনি ঘোরতর দারিদ্র্যের প্রকোপে পড়েছিলেন। আদর্শের সঙ্গে আপস করে চলার পথ ধরলে তিনি সহজেই তাঁর এই দারিদ্র্যদশা ঘুচাতে পারতেন কিন্তু তিনি তাঁর আদর্শ থেকে একচুলও হেলেননি বা বেঁকেননি। তিনি বরং সপরিবারে উপোস করে থাকবেন তবু বাজারী পত্রিকাগুলিতে লেখা দিয়ে নিজেকে ছোট করতে রাজী ছিলেন না। ওই সব সূত্র থেকে মোটা রকমের অর্থপ্রাপ্তির লোভ সংবরণ করে তিনি তাঁর একাধিক শারদীয় সংখ্যার গল্প সামান্য অর্থের বিনিময়ে অথবা সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে লিটল ম্যাগাজিন-গুলিকে দিয়েছেন। এই থেকেই মানুষটির ধাত বোঝা যায়।

এ শুধু গতানুগতিক ত্যাগস্বীকারের দৃষ্টান্ত নয়। এর মধ্যে মহৎ চরিত্র-বত্তার প্রমাণও প্রতিফলিত। আমাদের দেশের কয়জন প্রতিষ্ঠাপন্ন নামী লেখক আদর্শের খাতিরে এ রকম চরিত্রের দৃঢ়তা দেখাতে পেরেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশের শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রথম মহাযুদ্ধের ভয়াল উপস্থিতিতে সমগ্র বিশ্ব যে সব অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিল তার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া সেকালের জনজীবনকে আমূল পরিবর্তিত করে। পরবর্তীকালের সমাজ-ইতিহাস রচয়িতারা এই সামাজিক বিপর্যয়কে বিস্তৃতভাবে বিচার করে দেখিয়েছেন যে, যুদ্ধের মাশুল স্বরূপ সারা ইউরোপ খণ্ডে, আফ্রিকা এবং এশিয়া মহাদেশে সমস্ত প্রচলিত মূল্যবোধে নাড়া জাগে। টি. এস. এলিয়টের The Waste Land কাব্য এবং ডি-এইচ. লরেন্সের Lady Chatterley's Lover উপন্যাসে যুদ্ধের খেসারত হিসাবে জনজীবনে এবং ব্যক্তি মানুষের জীবনে যে-ভাঙাগড়া শুরু হয়েছিল তার দীর্ঘ বিস্তৃত বর্ণনা আছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যে (দ্র: "ঝড়ের খেয়া") এই যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী বলে উল্লেখ করতে দেখি। কবি বিশ্বাস করেছেন এই মারণযজ্ঞ, দেশে-দেশে এই লড়াইজনিত ধ্বংস এক নব অরুণোদয়ের ঘোষণা করবে। যুদ্ধ শেষ হল এবং তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ একদিকে যেমন কত তরুণ প্রাণ নিশ্চিহ্ন হল, তেমনি র‍্যাফল ওয়ালের গায়ে ধ্বনিত হল সদ্যোজাত অবৈধ শিশুর উচ্চকণ্ঠ।

ঠিক এই প্রেক্ষাপটে 'কল্লোল' পত্রিকার লেখক সম্প্রদায়ের জন্ম। ইতোমধ্যেই রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র নারীর মূল্য আলোচনায়, বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠনে, দুঃসাহসী প্রেমের সামাজিক মূল্য নির্ণয়ে উপন্যাসকে মাধ্যম করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে বোহেমিয়ান দৃষ্টি আশা করা আমাদের উচিত নয়। এজন্য প্রয়োজন হল এমন এক লেখকগোষ্ঠী যাঁরা যৌন মনস্তত্ত্বের পৃষ্ঠা উল্টে নরনারীর জটিল সম্পর্ক খুঁজে ফিরলেন, নিসর্গের হিমশীতল ছায়া, ঘন রাত্রির জ্যোৎস্নাময় বিহ্বলতা কিংবা রিক্তা নারীর শিকল কঠিন আবেশালিঙ্গন তাঁদের কথাসাহিত্যের মূল প্রেরণা হল। তাঁদের উপন্যাসে সোভিয়েত-উপন্যাসের প্রেরণায় সমাজতন্ত্রবাদ উচ্চারিত হতে পারত? কিন্তু সেই জীবন-উদ্দীপ্ত লাভাস্রোত কল্লোলীয় উপন্যাসে

প্রেরণা যোগাতে পারল না। বরং সেই জায়গায় স্থান পেল ফ্রয়েড-এলিস প্রতিষ্ঠিত মনোবিকলনতত্ত্ব এবং যৌনতত্ত্ব। 'The Modern Writer and His World' গ্রন্থের লেখক G. S. Fraser-এর মতে—'As for the new sexual freedom······often treated as a natural result of the war.' (P-48)। সেকালে সারা পৃথিবীতে তরুণ সম্প্রদায়ের চিত্তে দেহের তটপ্লাবী গন্ধবহ আকর্ষণ তীব্রতম হয়ে ওঠে। ফ্রয়েড-ইয়ুং এবং হ্যাভলক এলিস নরনারীর প্রেমের ক্ষেত্রে দেহকামনার বেপরোয়া পরিচয় আঁকলেন। উপন্যাসে যৌন-উদ্দীপনার সাড়া পড়ে গেল। রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ চৌধুরী, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ সকলেই এই যৌনাশ্রয়ী উপন্যাসের পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত দিতে লাগলেন। যথার্থ অর্থে একে Age of Interrogation বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ চিহ্নিত হলেন classical রূপে। কল্লোলের একজন অগ্রণীর কথায়—'রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল কল্লোল। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মানুষের জনতায়। নিম্নগর্ত মধ্যবিত্তদের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। হপ্রেতায়িত ও পরিত্যক্তের এলাকায়।' (দ্রঃ কল্লোল যুগ, পৃঃ ৮৩)।

প্রশ্ন হল সত্যই কি অবজ্ঞাত, অবহেলিত, নিপীড়িত বস্তি-মানুষের বেদনাকে বাস্তব রূপ দিতে কল্লোলের লেখকরা সফল হয়েছিলেন ? আমরা ঐ গোত্রের লেখকদের মধ্যে যে সব বৈচিত্র্য দেখেছি তা হল—

ক. যুদ্ধোত্তর বাংলার যুব সমাজের অবক্ষয় ও হতাশা।

খ. এর ফলস্বরূপ নূতন পথ খোঁজার অস্থিরতা ও উদ্দামতা।

গ. উদ্দাম যৌবন স্বপ্ন—কলকাতা শহরের ধনী অভিজাত পরিবার (গোকুলচন্দ্রের 'পথিক')।

ঘ. যাযাবর জীবন-প্রবৃত্তি—জীবনের অন্ধকার দিক, বিদ্রোহের অসংলগ্ন প্রকাশ (অচিন্ত্যকুমারের 'আকস্মিক', 'বেদে')।

ঙ. প্রেম ও যৌন-জীবনচিত্র ও নরনারীর সমস্যা (অচিন্ত্যকুমারের 'কাকজ্যোৎস্না', 'প্রাচীর ও প্রান্তর', 'প্রচ্ছদপট', বুদ্ধদেবের 'রজনী হল উতলা')।

চ. রোমান্টিক প্রেম ও সূক্ষ্ম জীবন-রহস্য অন্বেষণ, বিচিত্র স্বপ্নমগ্নতা (বুদ্ধদেব বসুর 'যেদিন ফুটল কমল', 'একদা তুমি প্রিয়ে', 'বাসরঘর',) —লরেন্সের প্রভাব।

ছ. যৌন চেতনায় বলিষ্ঠ দুর্বার প্রাণপ্রাচুর্য (প্রবোধকুমার সান্যালের 'প্রিয় বান্ধবী', 'অগ্রগামী', আঁকাবাঁকা')।

অচিন্ত্যকুমার কল্লোলের লেখক ও উপন্যাস কর্ম সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা পুরোপুরি জানা যায় না। আসলে গোকুলচন্দ্র-অচিন্ত্যকুমার-বুদ্ধদেব-প্রবোধকুমার প্রমুখের প্রত্যেকের রচনা স্বতন্ত্র। হতে পারে তাঁদের দৃষ্টি সমাজের নীচুতলার মানুষের উপর পড়েছিল কিন্তু তার প্রতি প্রবোধ-কুমার-অচিন্ত্যর সহানুভূতি যে কিছু পরিমাণে উৎসারিত হয়—বুদ্ধদেবের মধ্যে তা পাই না। রবীন্দ্রযুগের উপান্তে 'কাক-জ্যোৎস্না'য় নমিতার অকালবৈধব্য দেখে অজয় নমিতাকে বলেছে—"জান, সমাজ আমরা সৃষ্টি করেছি, আমরাই তাকে ভাঙবো। আমাদের ভাঙবার অধিকার না থাকলে আমরা তাকে মানবো কেন?" এমন উক্তি বুদ্ধদেবের কোন চরিত্র করতে পারে না। তিনি সমাজকে, সেখানের নর-নারীকে গভীরভাবে দেখেন না। তাঁর নাগরিক নায়ক-নায়িকারা দেহসর্বস্ব, সৌখীন, হৃদয়স্পর্শহীন।

বরং বলা যায় মানিক-পূর্ব বাংলা উপন্যাসে কল্লোলের শিল্পী প্রবোধকুমার অভিজাত, সুখী উচ্চবিত্ত জীবনকে ত্যাগ করে নেমে এসেছেন পথে। তাঁরই কথায়—"পথে ঘাটে গল্প খুঁজে বেড়িয়েছি—ষ্টীমার ঘাটে, চটকলের ধারে, রেল স্টেশনে, বিদেশের ধর্মশালায়, মফঃস্বলে ওয়েটিং রুমে তীর্থপথের মেলায়।......আমি বড়লোক নিয়ে কিছু লিখতে পারতুম না। আমি লিখতুম মজুর, জেলে, রাজমিস্ত্রি, গাড়োয়ান, মুদি, ফড়ে, এইসব চরিত্র নিয়ে, কারণ তাদের জীবনযাত্রাটা চোখে দেখতে পেতুম।" ('গল্প লেখার গল্প')। এই ধরনের জীবনাচরণ একদিকে শরৎচন্দ্র অন্যদিকে মানিকের সাহিত্য-জীবনে দেখা যায়। ১৯২৮-এ রচিত 'যাযাবর' উপন্যাসে যে স্বপ্নরঙীন জীবনচিত্র আছে তাকে বাদ দিলে 'কলরব' 'প্রমীলার সংসার', 'নবীন যুবক' প্রভৃতি উপন্যাসে চলমান জীবনের কষ্ট, দুঃখ-দারিদ্র্য, সামাজিক অত্যাচার ইত্যাদি ফুটে উঠেছে। তাঁর 'নবীন যুবক' যে স্বপ্ন দেখে (প্রচলিত সমাজ-অসঙ্গতি সে ভাঙবে, হৃদয়হীন নিষ্ঠুর প্রথাকে সে আক্রমণ করবে) তা বাস্তবায়িত হয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে। সে বলেছে—"সবাই মিলে দল বাঁধব,......সবাই মিলে যাব উপনিবেশ গড়তে। আদর্শ সমাজ গড়ব।" আর স্বপ্নের আদর্শ সমাজের রূপটি কেমন? —"এই ধরো, মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ সম্বন্ধ। শিক্ষায়, জ্ঞানে, সভ্যতায়, চিন্তাধারায়

সবাই পরস্পরের অকৃত্রিম বন্ধু। সম্পত্তির সবাই সমান অংশীদার, সবাই সম-অবস্থাপন্ন।" আর মানিকের উপন্যাস 'সার্বজনীনে'র পরিণতিও একই সুরে বাঁধা; পঙ্কজ, পরমেশ্বর, মহেশ্বর, প্রতিমা, সুভাগিনী, ডুমুর, জিতু—সকলের। "সাধন আর সবিতা ভাটিয়ালি সুরে গান গাইছে—দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশার গান—সবাই মিলে তার প্রতিকার করার গান।" প্রবোধকুমারের যা ছিল স্বপ্ন, তা সত্য হল মানিকের উপন্যাসে।

অন্য দুজন লেখক—কল্লোলের যুবনাশ্ব এবং কল্লোল-কালিকলমের শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—অনেক ক্ষেত্রে মানিকের সগোত্রীয়। গোর্কির 'Lower Depths' প্রতিফলিত হয়েছে যুবনাশ্বের গল্প-উপন্যাসে, তেমনি রাণীগঞ্জ-ধানবাদ অঞ্চলের কয়লাকুঠীর মানুষদের পরিচয় পাই শৈলজানন্দের উপন্যাসে। শৈলজানন্দ এমিল জোলার 'Germinal'-কে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। বুদ্ধদেব নিজেই বুঝতেন তাঁর উপন্যাসে জীবন্ত বাস্তব অনুপস্থিত তাই শৈলজানন্দের প্রশংসায় তিনি লিখেছেন—'His quietness, as he does his job, is terrible, his description of a murder as unconcerned as that of a mother sucking her child." শৈলজানন্দই Local colour-এর প্রতিষ্ঠা করালেন কয়লাকুঠী আশ্রয়ী উপন্যাসে। কৃষিনির্ভর মানুষ কিভাবে কয়লাখনির কুলিজীবনে প্রবেশ করে হারায় তার মৃত্তিকার স্বপ্ন, উদার আকাশের নীলিমা—তার প্রত্যক্ষ পরিচয় আনলেন শৈলজানন্দ এবং মানিকের রচনায় সেই শ্রমিক জীবনেরই পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি।

প্রবোধকুমার শৈলজানন্দের এই সব উপন্যাস লেখা হবার পরও তিরিশের দশকে প্রকৃত গণ-উপন্যাসের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। ইতোমধ্যে অবশ্য মানিকও এসে গিয়েছেন। বুদ্ধদেব তাঁকে বললেন 'belated Kallolean' আর অচিন্ত্যকুমার বললেন 'কল্লোলেরই কুলবর্ধন'। এ কথা সত্য শরৎচন্দ্রের উপন্যাসাদি পড়ে তিনি সেগুলির মধ্যে সংস্কারমুক্ত শিল্পীর পরিচয় পান, তবু বস্তুবাদী লেখকের সম্পূর্ণ আস্বাদ পান না। তেমনি কল্লোলের লেখকদের বিষয়ে কিছু প্রশংসা করলেও ('ভাষার তীক্ষ্ণতা, ভঙ্গির নতুনত্ব, নতুন মানুষ ও পরিবেশের আমদানী, নরনারীর রোমাণ্টিক সম্পর্কের মধ্যে বাস্তবতা' তাঁর প্রশংসার কারণ) তাঁদের সমালোচনা করেছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তিরিশের দশকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব থেকে

উপন্যাস রচনা করেছেন—মহাযুদ্ধের অগ্নিগর্ভ যুগে বসে তিনি চিন্তা-ভাবনায় পালাবদল সূচিত করেন, তারপর যুদ্ধ-অবসান এবং দেশবিভাগ লক্ষ্য করেন। যে স্বাধীনতা এলো তার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ মন্বন্তর, মহামারী দুর্নিবার গতিতে সমাজকে গ্রাস করল। স্বাধীনতা-পরবর্তী দেশের জল-হাওয়ায় মানিক আর দশটি বছরও কাটাতে পারেননি। কিন্তু সেই অগ্নিময় সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতির পটভূমিকায় যে বাধা বিপত্তিময় জীবন তাঁকে কাটাতে হয় তার নিখুঁত পরিচয় তাঁর উপন্যাস সমূহে আছে। মানিকের রচনা পড়লে বিস্মিত হতে হয়, কি নেই তাঁর গ্রন্থে। আছে খুনী ডাকাতের পঙ্গু জীবন যাপনের কাহিনী, দাম্পত্য জীবনে অসামঞ্জস্যের কারণ-অনুসন্ধান, আধুনিক জীবনের জটিলতা নিরীক্ষণ, বিবাহিত গ্রাম্য বধূর জীবন ও চরিত্রের ভয়াবহ পরিণাম কল্পনা, পদ্মাতীরের মাঝিদের বৈচিত্র্যহীন কঠোর বাস্তব জীবনের আখ্যান, মধুর প্রেমের উজ্জ্বল ছবি, উদ্বাস্তু জীবনের কঠোর জীবন-সংগ্রাম, বস্তি জীবনের করুণ ইতিবৃত্ত, সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলনের ছবি।

মানিকের উপন্যাসকর্মে ঋতুবদল ঘটেছে একাধিকবার—যে বিষয়টি নিয়ে এখনও সমালোচকদের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই। যে লেখকের কাহিনীচয়ন শুরু হয় ব্যক্তিগত প্রেম-কামকে কেন্দ্র করে, তিনিই অতিক্রান্ত সমষ্টি জীবনকে উপন্যাসের নায়ক করে তোলেন—সুসজ্জিত ড্রয়িং রুম, বেডরুমের স্থান গ্রহণ করে কেতুগ্রামের মত বাংলাদেশের অবজ্ঞাত আরও কত নাম-না-জানা গ্রাম। তারপর আর একবার ঋতুবদল হতে দেখি, যখন তাঁর উপন্যাসে ধরা দেয় শহরতলী এবং নাগরিক জীবন। প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসে ফ্রয়েড ইয়ুং এর যৌনমনস্তত্ত্ব উঁকিঝুঁকি দেয়—মানবমনের দুজ্ঞেয় রহস্য-উন্মোচনেই তখন তাঁর উৎসাহ দেখি। কিন্তু সেই পর্যায়কে কাটিয়ে আসতে তিনি খুব বেশী সময় নেন নি। হয়ত তাঁর অবচেতন মনে প্রথম থেকেই কার্ল মার্কসের অর্থনীতি-চিন্তা জাগরূক ছিল, রুশ বিপ্লবের সদ্য সমাপ্ত সংগ্রামী অধ্যায়ও তাঁর বক্ষে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল, ঔপনিবেশিক শোষণের বিকট রূপ তাঁর কলম থেকে মুক্তি পেতে চাইছিল। তাই 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের (১৯৩৬) অকস্মাৎ প্রকাশ সমস্ত বাংলা সাহিত্যকে ওলোট-পালোট করেছিল। প্রবোধকুমার-শৈলজানন্দ যে জগৎ খুঁজে ফিরছিলেন তার পূর্ণাঙ্গ আবিষ্কার ঘটল মানিকের উপন্যাসে।

মানিকের উপন্যাসগুলিকে প্রাক্-মার্কসীয় এবং মার্কসবাদ-প্রভাবিত—

এই দুটি ধারায় ভাগ করা ভাল। মার্কসবাদ-আশ্রয়ী উপন্যাসগুলির আবার দুটি স্তর—স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী ও স্বাধীনতা-উত্তর। মানিক লিখেছেন :

"লিখতে আরম্ভ করার পর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আগেও ঘটেছে, মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার পর আরও ব্যাপক ও গভীরভাবে সে পরিবর্তন ঘটাবার প্রয়োজন উপলব্ধি করি।"

মানিক উপন্যাস লেখা শুরু করেন ১৯৩৫ সালে আর মৃত্যুর বছরও (১৯৫৬) তিনটি উপন্যাস লেখেন। মৃত্যুর পরও তাঁর লেখা কটি উপন্যাস বার হয়। কালানুক্রমিক ভাবে উপন্যাসগুলি হল :

জননী	মার্চ, ১৯৩৫
দিবারাত্রির কাব্য	ডিসেম্বর, ১৯৩৫
পুতুলনাচের ইতিকথা	১৯৩৬
পদ্মানদীর মাঝি	মে ,,
জীবনের জটিলতা	নভেম্বর ,,
অমৃতস্য পুত্রাঃ	জুলাই ১৯৩৮
সহরতলী ১ম পর্ব	জুলাই ১৯৪০
সহরতলী ২য় পর্ব	১৯৪১
অহিংসা	,,
ধরাবাঁধা জীবন	১৯৪১
প্রতিবিম্ব	১৯৪৩
দর্পণ	জুন ১৯৪৫
সহরবাসের ইতিকথা	ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬
চিন্তামণি	জুলাই ,,
চিহ্ন	জানুয়ারি ১৯৪৭
আদায়ের ইতিহাস	,,
চতুষ্কোণ	১৯৪৮
জীয়ন্ত	জুলাই ১৯৫০
বোমা	১৯৫১
স্বাধীনতার স্বাদ	জুন ১৯৫১
সোনার চেয়ে দামী ১ম খণ্ড	১৯৫১
ছন্দপতন	,,

সোনার চেয়ে দামী ২য় খণ্ড	১৯৫২
ইতিকথার পরের কথা	আগস্ট ১৯৫২
পাশাপাশি	সেপ্টেম্বর ,,
সার্বজনীন	,, ,,
আরোগ্য	মে ১৯৫৩
নাগপাশ	এপ্রিল ,,
তেইশ বছর আগে পরে	অক্টোবর ,,
চালচলন	,,
শুভাশুভ	অক্টোবর ১৯৫৪
হরফ	মে ১৯৫৫
হলুদ নদী সবুজ বন	ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬
মাশুল	অক্টোবর ১৯৫৬
প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান	ডিসেম্বর ,,
মাটি ঘেঁষা মানুষ (অসমাপ্ত)	১৯৫৭
শান্তিলতা	আগস্ট ১৯৬০
মাসির ছেলে	১৯৬০

মৃত্যুর আগে-পরে মিলিয়ে মোট আটত্রিশটি উপন্যাস লিখেছিলেন মানিক। তাঁর কালে ও পরে আর কোন প্রগতিশীল লেখক এত বেশী উপন্যাস লিখতে পারেন নি: তাঁর মাত্র দু'দশকের লেখক জীবনে এ ছাড়াও অনেক অবিস্মরণীয় গল্প ও প্রবন্ধ রচিত হতে দেখি।

মানিকের প্রথম যুগের উপন্যাসগুলির মধ্যে ফ্রয়েড প্রভাবিত একাধিক উপন্যাস নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা তাঁর কালে এবং উত্তরকালে হয়। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট :

"আমার লেখায় যে অনেক ভুল, ভ্রান্তি, মিথ্যা আর অসম্পূর্ণতার ফাঁকি আছে আগেও আমি তা জানতাম। কিন্তু মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার আগে এতটা স্পষ্ট ও আন্তরিকভাবে জানবার সাধ্য হয়নি।"

এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে 'দিবারাত্রির কাব্য' গ্রন্থে। বুর্জোয়া সমালোচকরা মানিকের এই স্বীকারোক্তি সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব, যৌন বিকৃতি, যৌবনোত্তাপকেই মানিক-প্রতিভার প্রথম সাহিত্য-স্ফূরণ রূপে উল্লেখ করেন। মানিক কিন্তু তাঁর ঔপন্যাসিক জীবনের দ্বিতীয় স্তরের

কথাও ভালভাবে উল্লেখ করেছেন। মার্কসবাদ পড়ে তাঁর চিন্তাধর্মের আমূল রূপান্তর ঘটে। তিনি লিখছেন :

"প্রকৃতপক্ষে মার্কসবাদ ঘাঁটতে ঘাঁটতে যখন আমার এতদিনের লেখার ত্রুটি দুর্বলতাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, আমার সাহিত্য সৃষ্টি মানুষকে এগিয়ে যেতে এতটুকু সাহায্য করার বদলে আরও বিভ্রান্ত করছে কিনা সন্দেহ জেগেছিল এবং সোজাসুজি নিজেকে প্রশ্ন করতে হয়েছিল যে, আমার অর্ধেক জীবনের সাধনা কি বাতিল বলে গণ্য করতে হবে ?"

মানিকের এই মন্তব্যে, ভাববাদী সমালোচকদের উল্লসিত হবার কোন কারণ নেই। আসলে এ মন্তব্য তিনিই করতে পারেন কেননা তিনি সার্থক বস্তুবাদী লেখক হতে চান, ডসটয়ভস্কি, গোর্কি, চেকভ, টলস্টয়ের মত। তিনি যথার্থই ভেবেছিলেন, পদ্মানদীর মাঝি কিংবা পুতুলনাচের ইতিকথা অথবা অমৃতস্য পুত্রাঃ উপন্যাসে রোমান্টিকতার ছোঁয়া বা অর্ধ-সত্য জগতের উঁকিঝুঁকি আছে। তিনি ত' শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের বাস্তবতাকে অতিক্রমণে ইচ্ছুক। হৃদয়মুখীনতাকে দূরে সরিয়ে 'ছোটলোকদের অমার্জিত রিক্ত জীবনের রুক্ষ কঠোর নগ্ন বাস্তবতা'কে আঁকতে তাঁর তীব্র বাসনা। ফলত শেষ জীবনের উপন্যাস-গল্পসমূহে তিনি বিশ্বের বস্তুবাদী লেখকদের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পেরেছেন। ১৯৫৫ সালে তাঁকে বলতে শুনি :

"আমি মার্কসবাদী, আমি বৈজ্ঞানিক, আমি সব জানি। সংস্কার বা ভাবপ্রবণতার ধার আমি ধারি না, আমি লড়ায়ে শ্রমিক শ্রেণীর যোদ্ধা কম্যুনিস্ট—আমার হৃদয় পাথর।"

এমন ইচ্ছাকৃত ব্রাত্য জীবনাচরণ একমাত্র রুশ কথাকার গোর্কির জীবনেতিহাসের সঙ্গে মেলে। এমন আপোষবিমুখ লেখক বাংলা উপন্যাসে আর দু'জন আছে কি ? স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যে তাঁর লেখনীর তৃতীয় স্তর সূচিত হয়। এবং ধর্ম, অর্থ, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি সমাজী জীবনের জলন্ত সমস্যা কেন্দ্রান্বিত হয়। উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই যে ক্রমান্বয়ে ঋতুবদল তারই ফলে তিনি 'ভারতীয় সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী লেখক' হিসাবে পরিগণিত হচ্ছেন।

২

মানিকের জীবনই তাঁর সাহিত্য। যে অভিজ্ঞতা নিয়ে চার্লস ডিকেনস্, স্তাঁদাল, ম্যাক্সিম গোর্কি, এবং শরৎচন্দ্র উপন্যাস লিখে বিশ্বখ্যাত হন সেই

জাতীয় ভাঙাগড়া জীবনের সঙ্গে মানিকের আজন্ম পরিচয়। পিতা ছিলেন প্রথম জীবনে শিক্ষক, তাই সততা নামক আদর্শটি তাঁর রক্তে মুদ্রিত হয়ে যায়। কিন্তু সংসার জীবনে তিনি সুখী হতে পারেন নি। দরিদ্র পিতা জীবনের শেষে সামান্য টাকায় যে বাড়ী গড়েছিলেন তা বিক্রী করে পুরো টাকা ছেলেদের হাতে ভাগ করে দিয়ে মানিকের বরাহনগরের বাড়ীতে জীবন কাটাতে থাকেন। এবং আশ্চর্য সেই মানিকের মৃত্যুর শোক সহ্য করে দু' বছর পরে তিনি পৃথিবী ছাড়েন।

এই পিতার কাছ থেকেই মানিক সব কিছুকে যুক্তি দিয়ে বিচার করতে শিখেছিলেন। তিনি উপবীত ত্যাগ করেন পিতাকে দেখেই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে নির্জনতার প্রতি আসক্ত ছিলেন তার সম্ভবতঃ দুটি কারণ। প্রথম তিনি অল্পবয়সে মাকে হারান, এজন্য মনের কোণে প্রথম জীবনে একজন সঙ্গীর অভাব ঘটে। দ্বিতীয় তাঁর বড় ভাইয়ের আচরণে মন-ক্ষতবিক্ষত হয়ে ওঠে। সর্বোপরি মাত্র কুড়ি বছর বয়স থেকেই সাহিত্য সৃজনে নিমগ্ন হওয়ার ফলে তাঁর সঙ্গী হয় নির্জন পরিবেশ।

মানিকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত ডায়েরি থেকে এমন সব তথ্য জানা যায় যার ফলে মনে হতে পারে তাঁর জীবনে একটি মধ্যবিত্ত প্রতিষ্ঠা প্রয়াসী লেখকের পরিবর্তে খেয়ালী, অর্ধ-অসংযমী অথচ নীতির ক্ষেত্রে পর্বতের মত অবিচল চরিত্রের প্রতিফলন। তিনি সংসারে থেকে, পুত্র-কন্যার পিতা হয়েও সংসার-অনাসক্ত; নির্জনতা সন্ধানী হলেও আশ্চর্যভাবে জনতার জীবনের শরিক, তিনি কবিতার খাতায় মৃত্যুর আট দিন আগেও সংসারের খরচাদি লেখেন বটে, কিন্তু সংসারের হাঁড়ির খবর সম্পর্কে তিনি উদাসীন। সুতরাং তাঁর ডায়েরির মধ্যেও স্বতোবিরোধ রয়েছে এবং তাকেই তাঁর সাহিত্য-কার্যের অন্যতম চাবিকাঠি হিসাবে ধরলে ভুল করা হবে।

মানিকের লেখা একটি চিঠি (৯. ২. ১৯৫৫) থেকে জানা যায় পুতুল-নাচের ইতিকথা (১৯৩৬) এবং অন্যান্য কটি বই লেখার সময় যেমন তিনি নিজের শরীরের প্রতি উদাসীন হন তেমনি পরিজনরা তাঁর প্রতি উদাসীন হন। এর মধ্যে একবার তিনি অজ্ঞান হয়ে যান এবং প্রতি দু-একমাস পরপর এমন ঘটতে থাকে। সুতরাং সাহিত্য জীবনের শুরু থেকেই চলে জীবনের সঙ্গে লড়াই—কলেজ জীবনে বন্ধু সংসর্গে তিনি মদ্যপান করতেন; পরে মৃগী রোগের হাত থেকে সাময়িক মুক্তির জন্য মদ্যপানে পুরোপুরি

আকৃষ্ট হন। যাই হোক তাঁর এই বিশেষ নেশা সম্পর্কে একালে কটাক্ষ করা হলেও যেহেতু সাহিত্যের কোন ক্ষেত্রেই তার কোন প্রতিক্রিয়া নেই তাই এই সব জল্পনার অবসান হওয়া উচিত।

বলা যেতে পারে যে, চল্লিশের দশকের শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত মানিক যে ধরনের পারিবারিক অশান্তিতে পীড়িত হচ্ছিলেন তার তীব্রতা না কমলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে বিপর্যস্ত সামাজিক জীবন তাঁকে বহির্জগতের দিকে আকৃষ্ট করে। ধনিক দেশগুলির ভঙ্গুর রূপে এবং সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বিকাশের সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁর প্রত্যয় নিশ্চিত হয়। একদিকে কার্ল মার্কসের রচনাবলী এবং সঙ্গে সঙ্গে বুখারিনের লেখা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কিত আলোচনা এবং লিয়নটিয়েভের ব্যাখ্যাত মার্কসীয় অর্থনীতি তাঁকে নতুন দৃষ্টি খুলে দেয়। অর্থাৎ সাহিত্যিক মানিক মার্কসবাদী শিল্পীতে পরিণত হন। এক্ষেত্রে তিনি কোন 'সৌখীন মজদুরি' করেন নি। মার্কসবাদ তাঁর পূর্বের উপন্যাসগুলির দ্বিধা-বিচ্যুতিকে তুলে ধরল—'প্রকৃতপক্ষে মার্কস্‌বাদ ঘাঁটতে ঘাঁটতে যখন আমার এতদিনের লেখার ত্রুটি আর দুর্বলতাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, আমার সাহিত্যসৃষ্টি মানুষকে এগিয়ে যেতে কতটুকু সাহায্য করার বদলে আরও বিভ্রান্ত করেছে কিনা সন্দেহ জেগেছিল এবং সোজাসুজি নিজেকে প্রশ্ন করতে হয়েছিল যে, আমার অর্ধেক জীবন সাধনা কি বাতিল গণ্য করতে হবে ?" (পুনরুদ্ধৃতি পাঠক ক্ষমা করবেন)

এখানেই মানিকের সততার প্রকৃত বিচার হয়ে যায়। আসলে ১৯৪১-এ ফ্রয়েড দর্শন প্রভাবিত 'অহিংসা' উপন্যাস বার হবার সঙ্গে সঙ্গেই মানিকের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে। এর আগে তাঁর মাত্র আটটি উপন্যাস বার হয় যার মধ্যে সবকটিতেই জীবন-বিমুখতা আছে এমন কথা বলা যায় না। তাই তাঁর 'অর্ধেক জীবন সাধনা' বাতিলের কোন প্রশ্নই ওঠে না। লক্ষণীয় ১৯৪২ সালে মানিক কোন গ্রন্থ লেখেননি। তার কারণ তখন তিনি রাজনৈতিক জীবনে প্রত্যক্ষভাবে প্রবেশের চেষ্টা শুরু করেন এবং সাহিত্যকেও পুরোপুরি সমাজ ও রাষ্ট্র সমস্যার সঙ্গে অন্বিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। এর ফলে বিশেষ সংকটজনক পরিবেশে ১৯৪৪ সালের শেষাশেষি তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। তাঁর সাহিত্যজীবনের এই ঋতুবদলের স্বাক্ষর বৌ (গল্পগ্রন্থ), প্রতিবিম্ব (উপন্যাস), সমুদ্রের স্বাদ (গল্পগ্রন্থ), ভেজাল (গল্প-গ্রন্থ)। অতঃপর তাঁর গল্পের বিষয় হল দোকানীর বৌ, কেরানীর বৌ,

সাহিত্যিকের বৌ, কুষ্ঠরোগীর বৌ, অন্ধের বৌ, জুয়াড়ীর বৌ—অন্যদিকে আছে বিপত্নীকের বৌ, তেজী বৌ, রাজার বৌ—দুটি ভিন্ন গোত্র, ভিন্ন সমাজ, ভিন্ন শ্রেণীর পরিচয়। প্রতিবিম্বর নায়ক তারক কি স্বয়ং মানিক? সে পার্টির গ্রাম শাখার একজন ক্ষত্রিয় কর্মী, চাকরীর পরিবর্তে সে পার্টি কমিশনে জায়গা নেয়। মনোজিনীর জীবন থেকে সে দেখে রাজনৈতিক কর্মীদের আত্মসুখ ত্যাগ করার জন্য কত কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এ উপন্যাসে যৌন প্রসঙ্গকে অন্যতর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখালেন মানিক। তাঁর উপন্যাসে জীবনাশ্রয়ী বস্তুবাদী বিশ্লেষণ এবার পুরোপুরি শুরু হল। তারকের দাদার চরিত্রটি কি মানিকের দাদার চরিত্রের প্রতিবিম্ব নয়?

তবে ১৯৪৫-এ প্রকাশিত দর্পণ উপন্যাসটি একেবারে খাঁটি রাজনৈতিক উপন্যাসের গৌরব পেয়ে গেল। চল্লিশের দশকের সেই মধ্যকালে মানিক পড়তেন বিজ্ঞানের বই, নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন প্রগতি সংঘের বৈঠকে, কৃষক আন্দোলনের খবর রাখতেন নিয়মিত, নির্জনতা-প্রিয় মানুষটি বিভিন্ন পেশার মানুষের সঙ্গে অতি অনায়াসে মিশতে পারতেন।* ছাত্রদের মিছিলে ঢুকে পড়তেন যখন-তখন, পার্টির নির্দেশে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কর্মীরূপে অনলস পরিশ্রম করেন, ১৯৪৬-এর কুখ্যাত দাঙ্গায় শান্তি প্রচারের জন্য উপদ্রুত অঞ্চলে ঘুরে ফেরেন (শুনতে হয় বিদ্রূপ—'শ্যালা কমিউনিষ্ট, "মুসলমানের দালাল") নৌবিদ্রোহের রসিদ আলী দিবসের বা ২৯শে জুলাইয়ের উত্তেজনাময় দিনগুলিতে তাঁকে কখনও দেখা যায় মজদুরদের মিছিলে, কখনও ছাত্রদের সঙ্গে বসে থাকেন রাস্তায়। শিল্পী এভাবেই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে থেকে সংগ্রহ করেন লেখনী-রসদ। তৎকালীন বাংলার সেই জীবনের পরিচয় আছে 'চিহ্ন' (১৯৪৭) উপন্যাসে।

স্বাধীনতালাভের বছর মানিকের বোম্বাইয়ে বক্তৃতা দান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪৮ এসে পড়ে। গান্ধী নিহত হওয়ায় যে প্রতিক্রিয়া তা মানবতাবাদী মানিকের ছবি। ঐ বছর মানিকের যৌন মনস্তত্ত্ব নির্ভর উপন্যাস 'চতুষ্কোণ' বার হওয়া একটি অস্বাভাবিক ঘটনা। কেননা ফ্রয়েডের প্রভাব ইতঃপূর্বেই তিনি ছেড়ে এসেছিলেন। আমরা এ বিষয়ে লেখকের জবানবন্দী শুনেছি ('একজনের মধ্যে অনেককে রূপ দেবার চেষ্টা করছি')। মনে হয় একদিকে যেমন তাঁর প্রথম যৌবনের দু-একটি উপন্যাসের স্মৃতি তাঁর মনে ছিল তেমনি যৌনতাকে তিনি সম্পূর্ণ বর্জনীয় এমনও মনে করেন নি।

সেক্ষেত্রে চতুষ্কোণ তাঁর উপন্যাস ধারায় ভিন্ন সুর হলেও সম্পূর্ণ অবাস্তব বলে মনে করা ঠিক নয়। অবশ্য এ কথা মনে হতেই পারে 'আদায়ের ইতিহাস' (১৯৪৭) রচনার অব্যবহিত পরে 'চতুষ্কোণ' রচনার ঘটনা অদ্ভুত।

ইতোমধ্যে তাঁর জীবনে নানা পারিবারিক সমস্যা এসে পড়ে; কিন্তু তার জন্য সংগ্রামী সত্তা নীরব হয়ে পড়েনি। ট্রাম ধর্মঘট প্রসঙ্গ, চিয়াং-কাইশেকের পতন, ছাত্র ধর্মঘট, পুলিসী সন্ত্রাস ইত্যাদি প্রসঙ্গে তাঁর প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত স্পষ্ট। কমিউনিস্ট সংগঠন বেআইনি ঘোষিত হলেও তিনি সদা সক্রিয়। প্রগতিশীল শিল্পী ও কর্মীদের গ্রেপ্তার করে বক্সায় পাঠানো হলে তাঁর অগ্নিগর্ভ লেখনী ঝলসে ওঠে। এজন্য 'পয়সাওলা কাগজওয়ালারা' তাঁকে 'বয়কট' করে—'ভেজাল' নামীয় রচনা যিনি লেখেন তাঁকে বর্জন করাই ত' বুর্জোয়া পত্রিকার মহৎ কাজ। পঞ্চাশের দশকেই মানিকের সংগ্রাম ও সিদ্ধি। সংগ্রাম দারিদ্র্যের সঙ্গে; আদর্শের জন্য, রাজনৈতিক বিচক্ষণতার জন্য এ কালে তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা হয়ত বেশী নয় কিন্তু সেগুলি জীবন সত্যে উদ্ভাসিত। পেশা, স্বাধীনতার স্বাদ, সোনার চেয়ে দামী (২ খণ্ড), ছন্দপতন, সার্বজনীন, পাশাপাশি, আপোষ ইত্যাদি উপন্যাস কথাসাহিত্যে বাস্তবতার যুগান্তর এনেছিল। এক্ষেত্রে তিনি আবেগের পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালে মানিকের আর্থিক টানাটানি সীমাহীন হয়ে ওঠে—অসুখ ও মানসিক অশান্তিও সীমা ছাড়ায়। আমাদের দেশেই এমনটি সম্ভব। অথচ মানিকের ঔপন্যাসিক প্রতিভা তখন দেশের মাটিও অতিক্রম করেছে, এক বছর আগেই (১৯৫৩) তাঁর 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস সুইডিস ভাষায় অনূদিত হয় 'Roddare Pa Padma' নামে।

যাই হোক তাঁর সেই অবিন্যস্ত চিন্তা-ভাবনা এবং জীবনধারায় তাঁর গণমুখী প্রত্যয় সামান্যমাত্র বিভ্রান্ত হয়নি। তাই ১৯৫৪-তে শুভাশুভ উপন্যাসের প্রকাশ ক্ষণে জানিয়েছেন—"এটি আমার পরীক্ষামূলক উপন্যাস। আমার বিশ্বাস, প্রধান নায়ক ও নায়িকাদের প্রধান স্থান বজায় রেখেও সংশ্লিষ্ট আরও অনেক চরিত্র আমদানি করলে উপন্যাসের শ্রেণীগত সামাজিক বাস্তবতা রূপায়ণে সাহায্য হয়।"

অর্থাৎ মানিক মৃত্যুর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েও উপন্যাসে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন আর তাঁর ধ্রুব, লক্ষ্য ছিল 'উপন্যাসের শ্রেণীগত সামাজিক

বাস্তবতা' রক্ষা করা। অথচ তিনি তখন মনে দেহে ভীষণ অসুস্থ। তার ফলে ১৯৫৫-এর গোড়াতেই তাঁর বাধা সত্ত্বেও তাঁকে ইসলামিয়া হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। অসুস্থ লেখক এসময় নিজ অতীতের কথা ভাবতেন, নিঃসঙ্গতার জন্য কষ্ট পেতেন এবং আশ্চর্যভাবে মার্কসবাদী লেখক অতি-লৌকিক প্রভাবের অনুভব করতেন। ঐ সময়ে তিনি যে ডায়েরি লিখে-ছিলেন তাতে মনে হতে পারে মৃত্যুর প্রতি তিনি নিজেই পদক্ষেপ ফেলে-ছিলেন। কিন্তু তাঁরই কথায়—'আমি মাতাল নই—সাহিত্যিক'। তাই বলি, ব্যক্তিজীবনের যে সব সংকট তাঁকে আদর্শের পথ থেকে বিন্দুমাত্র পথচ্যুত করতে পারেনি. তার কথা ভুললে চলবে না। যাঁরা মানিক জীবনের সমালোচক তাঁদের বুঝতে হবে তাঁর সাহিত্যই তাঁর জীবন। এবং সেই সাহিত্যকর্ম যদি না অর্থের প্রলোভনের কাছে আত্মবিক্রয় করে থাকে তার চেয়ে বড় গৌরব আর কী হতে পারে? শোনা যায় মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর কাছে সবচেয়ে মূল্যবান ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদটি, তাঁর সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত গণদেবতার চিত্র অঙ্কন। এই ব্যক্তিক সত্তা ও সাহিত্যিক সত্তার মধ্যে আদর্শগত মিলনই তাঁকে বৃহত্তর গণজীবনের সঙ্গী করে তুলেছিল। তবে সেই ব্রাত্য জীবনে পৌঁছুবার জন্য তাঁকে কম চেষ্টা করতে হয়নি। সেই স্তর পরিবর্তনের স্বরূপটি তাঁর ক'টি উপন্যাসের আলোচনার সাহায্যেই স্পষ্ট হতে পারে।

৩

ঠিক বিবর্তন বলতে যা বোঝায় তা মানিকের উপন্যাসে অত্যন্ত স্পষ্ট হলেও সেজন্য তিনি বেশী সময় নেননি। এর প্রমাণ 'দিবারাত্রির কাব্য' এবং 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস দুটি রচনার মধ্যে কালগত ব্যবধান মাত্র পাঁচ মাস। অথচ দুটি উপন্যাসের মধ্যে বক্তব্য বিষয়বস্তু সর্বোপরি উপস্থাপনায় কতই না পার্থক্য! নাগরিক জীবন থেকে দারিদ্র্য লাঞ্ছিত গ্রামীণ জীবনে পদার্পণ। তারপর অবশ্য তিনি নানা উপন্যাসে শহর অথবা শহরতলীতে ফিরে এসেছেন কিন্তু 'দিবারাত্রির কাব্যে'র জগত থেকে সেগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসের চরিত্রগুলি কেমন দেখা যাক্। অন্যতম নায়ক হেরম্ব কলেজে ইংরেজী পড়ায়, সে আবেগমুখী—তাই একদিন সে সুপ্রিয়াকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। সেই সুপ্রিয়া আজ রূপাই-

কুড়ার দারোগা অশোকের স্ত্রী। কিন্তু মনের দিক থেকে আজও সুপ্রিয়া তৃপ্ত নয়, তার জীবনদর্শন হল তাৎক্ষণিক সুখ। তাই মাত্র চল্লিশ ঘণ্টার জন্য হেরম্বকে পেয়ে সে ভাবতে বসে—'ছাই সংসার, ছাই ভালমন্দ। ছাই আমার মঙ্গল অমঙ্গল। একজনের অদর্শন সইতে না পেরে আমার যদি শুধু অসহ্য যন্ত্রণাই হতে থাকে, জগতে কিসে তবে আমার মঙ্গল হওয়া সম্ভব শুনি?' এই সুপ্রিয়ার সঙ্গে তবুও হেরম্ব দেহসুখ চায়নি কেননা তার জীবন দর্শন স্বতন্ত্র। তাই বোধ হয় অনাথ-মালতীর অনাহূতা কন্যা আনন্দকে সে মনের কাছাকাছি টেনে নিতে পারে। মা মালতীর কাছে যৌনক্রিয়া ছিল নেশার মত, সে ভাবত,—'জিভকে ছোটলোক না করলে স্বাদ মেটে না।' সে জাতের মেয়ে নয় তারই কন্যা আনন্দ। তাই হেরম্ব প্রাণে এবং দেহে স্থাপন করে আনন্দকে, লেখকের কথায়—'এ এক নব ইন্দ্রিয়ের নবলব্ধ ধর্ম।'

এই পর্যন্ত মানিক ঠিক পথেই কাহিনীকে এগিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু উপন্যাসের তৃতীয় পর্যায়ে সুপ্রিয়া ও আনন্দকে মাঝে রেখে হেরম্বের দোলাচল-চিত্ততা এবং অশোকের হত্যা প্রয়াস, সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের সামনে হেরম্বকে প্রলুব্ধ করার জন্য কাম ক্ষুধিতা সুপ্রিয়ার প্রচেষ্টা এবং হেরম্বের প্রত্যাখ্যান, অনাথের গৃহত্যাগ, মালতীর বিকারদশা, আনন্দের মানুষকে অবিশ্বাস করার প্রবণতা এবং ইচ্ছামৃত্যু ইত্যাদি ঘটনা অনেকক্ষেত্রে অস্বাভাবিক হয়েছে এবং যে-বাস্তববাদ ঈষৎ পরবর্তীকালে মানিকের উপন্যাসে জোরালো কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে তারও অনুপস্থিতি দেখা গেছে। উপন্যাসে প্রেম, প্রেমজনিত দেহমিলন কিংবা চরিত্রের মানস অস্থিরতা থাকবে না এমন কথা আমরা বলছি না, আসলে এই উপন্যাসটি কয়েকটি ব্যক্তি চরিত্রের কামনা-বাসনার উপরে উঠে এসে ব্যাপক সামাজিক প্রেক্ষাপটে ও শ্রেণীবৈষম্যের পরিবেশে উপস্থিত হতে পারেনি। এর একটি প্রধান কারণ রচনাটিতে ফ্রয়েডীয় বক্তব্যের অনুসরণ। এই একই ত্রুটি তাঁর 'জননী' গ্রন্থেও রয়েছে। এরপর 'পুতুল নাচের ইতিকথা' থেকে তাঁর উপর যে মার্কসীয় প্রভাব পড়েছিল তা বুঝতে পারা যায় এবং 'পদ্মানদীর মাঝি'তে পরিবর্তিত মানিককে পাওয়া গেল যিনি এবার আমাদের গ্রামে নিয়ে যাবেন,' দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর রূপ আঁকবেন এবং নতুন সমাজ পত্তনের স্বপ্ন সার্থক করার কথা বলবেন।

একথা স্বীকৃত, 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে মানিক সর্বপ্রথম বাংলা দেশের নদী-সমুদ্রের সমন্বয় এঁকে তার প্রেক্ষাপটে পূর্ব সীমান্ত বাংলার মানুষ ও তার মনকে স্বভাব-সৌন্দর্যে রূপায়িত করলেন। জীবনে যারা বাঁচার জন্যে তীব্র পাঞ্জা কষে মৃত্যুর সঙ্গে তারা প্রতিদানে দু-মুঠো অন্নও পায় না, পরণবাস যাদের ছিন্ন, ঘরে যাদের আলো জ্বলে না, মাছ ধরা জীবিকা হলেও যাদের ভাগ্যে জোটে না একমুঠো ভাত, যারা অন্ত্যেবাসী— সেই সব মানুষ মানিকের উপন্যাসে মিছিল করে এলো। এ দেরই তিনি খুঁজছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ মানিকের উপন্যাস যদি পড়তেন তাহলে নিশ্চয়ই 'ঐক্যতান' কবিতায় তার ইঙ্গিত থাকত। কেননা পদ্মানদীর মাঝির স্থান বর্ণনা, চরিত্র বর্ণনা এবং জীবন সংগ্রামের মধ্যে গণসাহিত্যিক মানিকের পদসঞ্চার শুরু হয়ে গিয়েছিল। তিনি সাহিত্যকে নিয়ে 'সৌখীন মজদুরি' যে করেননি সে কথা নিজে জোরালো কণ্ঠে উল্লেখ করেছেন। কি গ্রাম, কি সহর, কি মফঃস্বল সহর সব স্তরের জীবনযাত্রার ছবি তাঁর কলমে সত্য, জীবন্ত। 'পদ্মানদীর মাঝি' তার সূচনা কর্ম।

ও পাড়ার প্রাঙ্গণ : 'পূর্বদিকে গ্রামের বাহিরে জেলে পাড়া। চারদিকে ফাঁকা জায়গার অন্ত নাই। কিন্তু জেলেপাড়ার বাড়িগুলো গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। প্রথমে দেখিলে মনে হয় এ বুঝি তাদের অনাবশ্যক সংকীর্ণতা, উন্মুক্ত উদার পৃথিবীতে দরিদ্র মানুষগুলি নিজেদের প্রবঞ্চনা করিতেছে। তারপর ভাবিয়া দেখিলে ব্যাপারটা বুঝিতে পারা যায়। স্থানের অভাব এ জগতে নাই। তবু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই এদের ওইটুকুই। সবটুকু সমতল ভূমিতে ভূস্বামীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া আছে, তাহাকে ঠেলিয়া জেলেপাড়ার পরিসর বাড়িতে পায় না। একটি কুঁড়ের আনাচে কানাচে তাহারই নির্ধারিত কম খাজনার জমিটুকুতে আরেকটি কুঁড়ে উঠিতে পায়। ...ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।'

এই অবজ্ঞাত মানুষদের জন্য এক নতুন উপনিবেশ পত্তন করতে চায় এক রহস্যময় মানুষ হোসেন মিঞা। এই চরিত্রটি বাংলা সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী— সে সম্মোহন বিদ্যা জানে নাকি? নয়ত তার আকর্ষণে রাসু স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যাকে নিয়ে ময়নাদ্বীপে গিয়ে সর্বস্ব হারিয়ে যখন একা ফিরে এলো

তখন জেলেপাড়ার ময়নাদ্বী দুঃখে নির্বাক হল বটে কিন্তু তাদের দিন দিন আয়ুহীন হওয়ার চেয়ে ময়নাদ্বীপে যাওয়াকে তারা এর পরও শ্রেয় মনে করে মনে করে কুবেরও। সে হোসেনের সংস্পর্শে এসে গোপীর রুগ্নতা, মাথার অসুস্থতা অনেকটা ভুলেছে, সে তার ঘুম ভাঙানিয়া হোসেনের মুখে গান বাঁধতে শুনেছে—

আঁধার রাইতে আশমান জমিন ফারাক কইয়া থোও
বোনধু কত ঘুমাইবা।
বাঁয়ে বিবি ডাইনে পোলা অকাল ফসল রোও
মিয়া কত ঘুমাইবা।……
নিদ ভাঙ্গে না, দিল জাগে না, বিবির বুকের শির,
পাড়ি দিবার সময় গেল, মাঝি তবু থির—
মাঝি কত ঘুমাইবা।

হোসেন মিঞা সামন্ততন্ত্রের কিংবা উপনিবেশবাদের প্রতিভূ এমন কথা বলা যাবে না—তাই মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী মানিক বিবর্তনহীন সংগ্রামহীন জীবন ছেড়ে কুবের ময়নাদ্বীপ যাক্ এই চেয়েছেন। সে অবশ্য একা নয়—'স্ত্রী-পুত্রের জন্য ভাবনা নাই কুবেরের, হোসেন রহিল। পরে গোপী আর বঙ্কুর সঙ্গে ওদের সকলকে হোসেন ময়নাদ্বীপে পৌঁছাইয়া দিবে। কেন, কাঁদে কেন কুবের? ময়নাদ্বীপ তো নিজের চোখে সে দেখিয়া আসিয়াছে, সেখানে গিয়া বাস করিতে হইবে বলিয়া কান্নার কি আছে?' আর সঙ্গে ত' রইলই তার কামনা-বাসনার তৃপ্তিদায়িকা কপিলা।

বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম কল্লোল-মুখী রোমান্টিক জীবনচিত্রের পরিবর্তে সংগ্রামী জীবনের বাস্তব চিত্র পাওয়া গেল। তাঁর পরবর্তী অনেকগুলি উপন্যাসে দেশবিভাগ জনিত ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের যে কঠোর শ্রমে বস্তি পত্তনের উৎসাহ দেখি তার পূর্বসূচনা 'পদ্মানদীর মাঝি'তে ময়নাদ্বীপ পত্তনের মধ্যে আছে।

মানিক শেষ জীবনে তাঁর পরিচিত দারিদ্র্য লাঞ্ছিত জীবনকে এমন নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন যা বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে অভূতপূর্ব ছিল। এই কালে লেখক পুরোপুরি শ্রেণী সচেতন তাই শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত সমাজ ও চরিত্র থেকে তাঁর সমাজ ও চরিত্র আলাদা হতে বাধ্য। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন—"সাহিত্যে বাস্তবতা আসে না কেন, সাধারণ মানুষ ঠাঁই পায় না

কেন? মানুষ হয় ভালো, নয় মন্দ হয়, ভালো মন্দ মেশানো হয় না কেন? শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলিও হৃদয় সর্বস্ব কেন, হৃদয়াবেগ কেন সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে—মধ্যবিত্তের হৃদয়?" এ সব ত্রুটি শরৎচন্দ্রকে ভেবেই। মানিকের পরপর প্রতিবিম্ব, দর্পণ, স্বাধীনতার স্বাদ, জীয়ন্ত, পেশা উপন্যাসে সেই বাস্তবতা, সাধারণ মানুষ, তার চরিত্রের ভালো-মন্দ মিশ্রিত আচরণ, হৃদয়াবেগ-অতিরিক্ত নরনারীকে পাওয়া গেল। যে সব মধ্যবিত্ত চরিত্র এলো তারাও শ্রেণী সচেতন, কর্মী, জীবন-সংগ্রামী। বিভ্রান্তি যেমন তাদের আছে তেমনি উত্তরণও আছে।

যেমন ধরা যাক দুই খণ্ডে বিধৃত 'সোনার চেয়ে দামী' উপন্যাস। লেখকের ২১ সংখ্যক উপন্যাস 'সোনার চেয়ে দামী'র প্রথম খণ্ড (বেকার) বার হয় ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে। সরল ভঙ্গিতে জটিল জীবন যুদ্ধের কাহিনী পরিবেশিত। মাসখানেক ধরে শূন্য গলা সাধনার। কেননা ছেঁড়া হার বাক্সে—ওদিকে রাখাল অনেকদিন বেকার। ঐ হার নিয়ে ললিতা, শোভার মা, বেলা কারুরই কৌতুহলের শেষ নেই।• কিন্তু রাখালের বেকারত্ব ত' স্বেচ্ছাকৃত নয়; অকারণে ছাঁটাই। কাজের চেষ্টায় নিত্য ঘুরে ফেরে—তিনটে টিউশনী আপাততঃ বাঁচিয়ে রাখে। রাত করে বাড়ী ফেরে। সাধনা ছেলেকে দুধ খাওয়ায়—'বড় হয়েছে, দস্যুর মত আধ-শুকনো মাই টানে ছেলেটা, বহুক্ষণ মাই দুটি তার টনটনিয়ে থাকে। পোয়াটাক গরুর দুধ না বাড়া‥ আর চলে না।'……ভোলার মার প্রত্যয়, কর্মশক্তি দেখে সে অবাক হলেও জোর পায় না। এই সময় ঔপন্যাসিক রাখালের দিদি অনিমার বড় মেয়ের বি ের নিমন্ত্রণ পৌঁছে দেন। দুটি হারের একটি রাখাল বিক্রী করেছিল। 'কিন্তু আজ পর্যন্ত সাধনা সেজন্য কখনো আপসোস করেনি।' কিন্তু আজ সে অধৈর্য। প্রাণহীন উদাসীনতায় রাখাল-সাধনা তাই পাশাপাশি শুয়ে থাকে।

মানিকের রসবোধ কত সূক্ষ্ম তার প্রমাণ উপন্যাসে বহুক্ষেত্রে পাই। টিউশনীতে যায় রাখাল। 'ভক্তিভাজন শূন্যকর্মা মানুষ বলেই বাড়ির লোকের সাধারণ চা-খাবারের ভাগ রাখালকে দেওয়া হয় না। বিশু খাবার খায়, একবাটি দুধ খায়, রাখাল জানলা দিয়ে খানিক তফাতে ফাঁকা মাটির মধ্যে ছেলেবেলায় ঘরের মত ছোট ছোট কুঁড়ে দিয়ে গড়া উদ্বাস্তদের কলোনিটার দিকে চেয়ে থাকে। ভোলার মা ওই কলোনি থেকে ডিম

বেচতে বেরোয় চারদিকের পাড়ায়।'....... এই বিশুর মা-র পাঁচ ছেলে-মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও 'দেহটি যেন সযত্নে কুঁদে গড়া।' আর রাখাল 'সাধনাকে পেট ভরে খেতে না পেয়ে চোখের সামনে রোগা হয়ে যেতে দেখে।'......

সাধনার কি ব্যথা কম? বাসন্তী আসে ভাঙা হারটি কিনতে। আর আশা আসে ধার দেওয়া আধ কাপ চিনি ফেরৎ নিতে। বাসন্তী এসে বলে—'মেয়েছেলে দশবছরে পেকে ঝানু হবে, পনের বছরে রসাবে। বুড়োমি, পাকামি সব তলিয়ে থাকবে রসে। নইলে কি ব্যাটাছেলের সঙ্গে পারা যায়?' ভোলার মা-র প্রথম বয়সের ভালবাসার কথাও সে শোনে। কিন্তু নিজের বুকে জোর পায় না তেমন।

অথচ রাখাল ভেবেছিল এই দুর্দিন সে পার হবেই, তার পাশে দাঁড়াবে সাধনা। কিন্তু আশাহত রাখাল পথে ঘোরে, চায়ের দোকানে শুয়ে পড়ে—'ঘণ্টা খানেকের মধ্যে তার সামনে পথ দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন তিনটে মিছিল পার হয়ে যায়। তিনটিই চলছে একদিকে। মেয়েপুরুষ ছেলেমেয়ের দুটি মিছিল, একটি মজুরের। 'উদ্বাস্তুদের মিছিল, ছাত্রছাত্রীর মিছিল, ধর্মঘটী মজুরের মিছিল। হাতে হাতে প্ল্যাকার্ডে লেখা দাবীগুলি উঁচু করে তুলে ধরে একসঙ্গে মুখে দাবী ঘোষণা করতে করতে চলেছে মিছিলগুলি।'

এই দৃশ্যগুলি প্রতিক্রিয়াহীন দৃষ্টিতে দেখতে থাকে রাখাল। তার মনে বহির্জগতের ঘটনার ছাপ যে পড়ে না তা নয়। ছাত্রী প্রভাকে পড়াবার সময় তার মন প্রশ্নের ঝড় তোলে, সে ভাবে—'দুর্মূল্য খোলা বাজার আর চোরা-বাজার শুধু তার বাবার মত বারো শ' টাকা আয়ের মানুষকে কেন, আয় যাদের আরও অনেক বেশী, তাদেরও জোর আঘাত করেছে—মাঝারী ব্যবসায়ীরা পর্যন্ত আজ বেসামাল হবার উপক্রম। ধনিক শাসনের অবসান শুধু গরীবের নয়, এদেরও স্বার্থ।'

সে কেবলই ভাবে, কিন্তু সাধনা তার চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে যায়। ভোলাদের বাড়ী দেখে সাধনা—'সমান দূরে দূরে সাজিয়ে বসানো ছাঁচে ঢালা ছোট ছোট ঘর, টুকরো টুকরো বাগান, সরু সরু পথ—চারদিক পরিষ্কার ঝকঝকে। ঠিক যেন ছবির মত। ঘর হারানো মানুষগুলি সব গড়েছে নিজের হাতে।' সে আরও দেখে দুর্গার হাতে দুগাছা করে নকল সোনার চুড়ি, কানে নকল সোনার দুল। মাত্র পঁচিশ টাকাতেই তার বিয়ের সব ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। এই জীবন যাত্রা সাধনার সব অবসন্ন অনুভূতিকে

নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিল। এখন থেকেই রাখালের সঙ্গে তার দূরত্ব বাড়তে থাকে। বিশুর মা-র গয়না চুরি করে রাখাল অর্থবান হল, সঞ্জীবের কাছ থেকে নানা বুদ্ধিও পেল। কিন্তু স্ত্রীর মন সে পেল না। সে নতুন হার আনে রেবার বিয়েতে যাবার জন্যে কিন্তু সাধনা যে বিয়েতে যাবে সেটা রেবার নয়, ভোলার বোনের।

এখানেই মানিক 'সোনার চেয়ে দামী'-র ১ম খণ্ড শেষ করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডের 'লেখকের কথা' অংশে তিনি জানিয়েছেন—'পরিকল্পনা ছিল প্রথম খণ্ডের মত তৃতীয় খণ্ডে সোনার চেয়ে দামী কিছুটার দাম কষব। দ্বিতীয় খণ্ড লিখবার সময় দেখলাম তৃতীয় খণ্ডকে পৃথক করা যাবে না। প্রথম খণ্ডের চেয়ে তাই দ্বিতীয় খণ্ড অনেক বড় হয়ে গেল। বিজ্ঞাপিত ডাকনাম 'মালিক' হয়ে গেল 'আপোষ'।

বেকার রাখাল এখন মালিক। দু হাজার টাকা তার আয়। সে নিজেকে বোঝায় যে দশজনের বিচারে চোর হলেও নিজের হিসেবে সে চোর নয়। যে চেয়ে চিন্তে ঋণ পায় না তার চুরি ছাড়া উপায় কী? তা ছাড়া সাধনা অতটা ভেঙে না পড়লে হয়ত সে একাজ করত না। অথচ আশ্চর্য, এখন স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখলেও সাধনার কোন প্রতিক্রিয়াই নেই। বেশী দুধ, বেশী মাছ কিছুতেই তার মন টানে না—'একটু আনমনা উদাসীন ভাব সাধনার। বছর খানেক দুঃখের আগুনে পুড়তে পুড়তে তার যে প্রাণশক্তি, ছোট সংসারটি নিয়ে মেতে থা[কা]র যে আবেগ উদ্দীপনা বজায় ছিল, একটু সচ্ছলতা ফিরে আসতেই যেন তা শেষ হয়ে গিয়েছে। তার আনন্দ ছিল যেমন উচ্ছল, রাগ অভিমানও ছিল তেমনি প্রচণ্ড।' সেই সাধনা পাল্টেছে—আবেগহীন; কলোনীতে ঘুরেই আজ তার আনন্দ। বীরেন দত্তের স্ত্রী প্রতিভা, মল্লিক বাড়ির মেয়ে শোভা, শকুন্তলা, লতিকা, অমিয়া, নীরেন দত্তের শিক্ষিতা স্ত্রী বিভাবতী, সুধীর মুখার্জীর ছেলের লাজুক বৌ অঞ্জলি, সেনদের নতুন রাঁধুনি, বিনয় সেনের বৌ সুহাসিনী, ছুঁচিবাইগ্রস্ত ঘোষাল গিন্নী, পরেশের গর্ভবতী বৌ অমলা—এদের কথাই রাখালকে বলে সাধনা। কিন্তু রাখাল থাকে অপরাধের জগতে। সাধনা তার কথা বুঝবে না।—এই সূত্রে লেখক একটি অন্তর্দ্বন্দ্বময় মুহূর্ত রচনা করেছেন। সে রাতে রাখাল ভাবছিল—'চুরি সে করেছে একা।……চোরেরও বৌ থাকে, স্বামীকে চোর হিসেবেই নেয় সে। সাধনা চোরের বৌ হিসাবে তাকে চোর বলে নেবে

না; দশজনের একজন হয়ে তাকে চোর ভাববে।' আর তখনই শিথিল হয়ে যায় রাখালের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। সেটা বুঝতে পেরে বিষণ্ণ হয়ে যায় সাধনা, রাখালের বুক থেকে মুক্তি নিয়ে সে দূরে বসে—'এই ভাবনার মানেই সে জানতে চেয়েছিল রাখালের কাছে, যে ভাবনা আদরের আলিঙ্গনকেও এভাবে শিথিল করে দিতে পারে, আজ পর্যন্ত কখনো যা ঘটেনি।'

লেখক রাখাল আর সাধনার দুটি ভিন্ন পথের জীবনচর্যা নিখুঁতভাবে এঁকেছেন।' রাজীবের সঙ্গে বিড়ির পাতা সুখার কারবার করে রাখাল, সকালে বিকেলে টিউশানী করে, ব্যবসা বাড়ায়, ব্যাঙ্কে টাকা জমায়। নির্মলার প্রসঙ্গে সে অবশ্য ভাবে—'মধ্যযুগের জীবনধারার জের টেনে চলেছে মানুষ আজকের দিনেও। এত যে উলোট পালোট হয়ে গেল জগতে, এক রাষ্ট্রে জমিদারী ফেলে আরেক রাষ্ট্রে পালিয়ে এল সতীশ, তবু সে রয়ে গেল জমিদার। সেই সে কবে চাষীর মাটিতে কামড় দিয়েছেন জমিদার প্রলয় ঘটে গেলেও সে কামড় যেন আলগা হবার নয়।' অবশ্য এই চিন্তাতেই শেষ। 'এর বেশী রাখাল কিছু করতে চায় না।

অন্যদিকে সাধনা কলোনীতে ঘোরে, সে জানে—'এই জমি থেকে ছোট কলোনীটা উৎখাত করার অপচেষ্টা চলছে।' প্রতিরোধ করার জন্য উদ্বাস্তু সমিতি গড়েছে। এসব কথা বাসন্তী ভাবে না দেখে সে অবাক হয়। আর ঝি বকুলের পড়ে গিয়ে গর্ভপাত ঘটায় সে নিজেই কাজ করে নেয়। তারই ক্রমাগত উৎসাহে আত্মমুখী বাসন্তীও মাঝে মাঝে পাড়ায় বেরোয় সাধনার সঙ্গে। আশা সমস্যায় পড়লে সাধনা ভরসা দেয়, রাখাল নতুন ফুল আনায় বলে—'এসব ঝোঁক আমার কেটে গেছে।' আশার সঙ্গে বৃদ্ধের বিয়ের ব্যবস্থা চললে সাধনা ভাবে—'কি আকাশ পাতাল সৃষ্টি হয়ে গেছে মধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ মেয়েদের মধ্যেও। সুমিতাদের মত মেয়েরা আন্দোলন করে, সংগঠন গড়ে, সভায় বক্তৃতা দেয়—ঘরের কোণে নিরীহ গোবেচারী শোভারা মুখ বুজে উদয়াস্ত খেটে খায়, বিনাপ্রতিবাদে নিঃশব্দে মেনে নেয় ভাগ্যে যেমন জোটে তেমন ঘর আর বর।'

প্রভাতকে কেন্দ্র করে সাধনা আর রাখালের মধ্যে যে প্রচণ্ড বিরোধ হয়েছে তাতে সাধনার উপস্থিত বুদ্ধিই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। প্রভাতের কলোনীর জমিতে কারখানা বসাবার ইচ্ছা, শ্রমিকদের বসবাসের জন্য ব্যারাক তৈরীর পরিকল্পনা যে ভুয়া তা সাধনা বুঝতে পেরেছিল। প্রায়

অভিমানে রাখাল মদ পর্যন্ত খায়, সাধনাকে যুক্তি দেয়, মদ খেলে রাতে সাধনাকে ভুলে ঘুমানো যায়। সে ঠিক করে এবার তারা ভিন্ন থাকবে— 'দুটি বন্ধু কিছুদিন একসাথে বাস করেছে, যথাসময়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে দূরে চলে যাবে। প্রত্যাশা নেই, রোমাঞ্চ নেই, উন্মাদনা নেই, ভাবের আকাশের ঝড় থেমে গেছে।' অবশ্য প্রভাতের বজ্জাতি ধরা পড়ে যেতে রাখালেরও রাগ দূর হয়। আসলে সে চায় সাধনার নৈকট্য। সাধনাও বিষয়টি সহজ করে নেয় উপন্যাসের শেষে বলে, 'খোকাকে বাসন্তীর কাছে রেখে এসেছি। কথা আমাদের সারা জীবনে ফুরাবে না, পা চালিয়ে এগিয়ে চলো।'

'সোনার চেয়ে দামী' উপন্যাসের সঙ্গে মানিকের 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসের কোথাও মেলে না। আসলে 'পদ্মানদীর মাঝি'তে যে বৃত্ত রচনার সূচনা তার রেখা পূর্ণতা পেল 'সোনার চেয়ে দামী'তে।

'সোনার চেয়ে দামী'র ঠিক আগের দুটি উপন্যাস 'বোমা' ও 'স্বাধীনতার স্বাদ'।

'বোমা' উপন্যাসের নায়ক কেদার এই উপলব্ধিতে পৌঁছেছিল যে গরীব মানুষরা সেই টোটকা পদ্ধতি, ঝাড়-ফুঁক, মাদুলি কবচেই আবদ্ধ কেননা খ্যাতনামা ডাক্তাররা অমানবিক, দরিদ্র রোগীরা অনাহারেই সেখানে থাকে সেখানে ওষুধ কিনবে কিসের সাহায্য? তার ওপর ওষুধেও ভেজাল। তাহলেও কেদার ডাক্তার পেছিয়ে যায়নি; দরিদ্র মানুষদের জন্য সে তার সংগ্রামের প্রতিশ্রুতি জানিয়েছে গীতাকে—'বড় ডাক্তার হব আমি যত বড় হতে পারি। জগতে যেখানে যত জ্ঞান আছে কুড়িয়ে আনব। শুধু বিলেত নয়, আমি সোভিয়েট যাব, চীনে যাব।... যাতে করতে চাইলে সত্যি কিছু করার সাধ্য হয়।' বলা বাহুল্য দুটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনকল্যাণমুখী স্বাস্থ্য পরিকল্পনা কেদারকে অনুপ্রাণিত করে এবং তার সেই বোধকে লেখক এই দেশের মানুষদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চান।

স্বাধীনতা যেমন আমাদের বেদনাহত মানুষদের রোগহীন জীবনের বার্তা এনে দিতে পারেনি তেমনি স্বাধীনতা আমাদের জীবন থেকে দাঙ্গার অবসান ঘটাতে পারেনি। দাঙ্গার মধ্য দিয়ে যে স্বাধীনতা এসেছে তার সম্পর্কে 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাসে লেখক বলেছেন—'উপরতলার একদল

লোক দেশ শাসনের নামে এক ধরনের কিছুটা ক্ষমতা পাবার লোভে দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে ভেজাল স্বাধীনতা কিনছেন।' দাঙ্গার থেকে মুক্তির অভিপ্রায়ে হোসেন মিঞা যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, গোকুল-নাজিম প্রমুখরা সেই প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই ওপর থেকে চাপানো দাঙ্গাকে প্রতিরোধ করতে পারে কেবল মজুররা, কেননা—'মজুর শ্রেণী সবচেয়ে বেশী দাঙ্গাবিরোধী।' মার্কসবাদী লেখক নিজে দেশবিভাগ জনিত দাঙ্গা, বেকারী ইত্যাদির বিরুদ্ধে যে সংগ্রামে ব্যবহারিক জীবনে অংশ নিয়েছিলেন তারই পরিচয় পেশা, স্বাধীনতার স্বাদ, সোনার চেয়ে দামী প্রভৃতি উপন্যাসে আছে।

অতঃপর 'পাশাপাশি' উপন্যাসে লেখক টুইশানি, কালোবাজারি, পুঁজিবাদ ইত্যাদির চিত্র এঁকে লিখছেন—'দেশটা এখনও সত্যি স্বাধীন হয়নি।'

'ইতিকথার পরের কথা' উপন্যাসে লিখেছেন—'জীবনটা সার্থক করা সবচেয়ে বেশী সম্ভব হয়েছে সোভিয়েট আর চীনে।' 'আরোগ্য' উপন্যাসের কেশব অনুভব করে—'যে অনিয়মের জন্য তার রোগ, সেটা রয়েছে সংসারে। সংসারটা না পাল্টালে অনিয়মটা যাবে না। তার রোগও আরোগ্য হবে না।' 'নাগপাশ' উপন্যাসে নরেনকে জোর গলায় বলেছে—'তোমার চাকরী-বাকরী নেই বলে কোথায় আরও বেশী করে তোমায় আঁকড়ে ধরব, তোমার হয়ে সবার সাথে লড়াই করব, তার বদলে তোমায় বাতিল করে দিলাম। একেবারে উল্টো হিসাব নয়? কি বোকাই ছিলাম আমি।' আর বেকার সমস্যা প্রসঙ্গে শ্রেণী সচেতন মাধব ঐ উপন্যাসেই নরেনকে বলেছে—'যে সিষ্টেম চালু আছে তাতে এরা বাড়তি লোক, ফালতু লোক—সিষ্টেমটা না পাল্টালে একটা মোটা সংখ্যা মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা হতেই পারে না…।' এমনকি তাঁর শেষ দুটি অসমাপ্ত উপন্যাস 'মাটি ঘেঁষা মানুষ' এবং 'মাটির কাছের কিশোর কবি'-তেও শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের সুখস্বর্গ স্বাধীনতার বিষয়ে বিদ্রূপ করতে লেখক ভোলেননি।

৪

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকালীন ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্কর তাঁদের উপন্যাসের মূলে নিসর্গ প্রকৃতিকে স্থাপন করেছিলেন। অথচ আশ্চর্য মানিক নিসর্গ-বিষয়ে ততখানিই উদাসীন। অন্ততঃ এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে

শরৎচন্দ্রের কিছুটা নৈকট্য রয়েছে। তার কারণও খুব স্পষ্ট। তিনি ভদ্রসমাজের 'বিকার ও কৃত্রিমতা' থেকে দূরে সরে এসেছিলেন তাই ভদ্রজনের দৃষ্টিতে আকাশ-মাঠ-ঘাট-বনের যে সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয় তার প্রতিফলন তাঁর উপন্যাসে নেই। তেমনি নেই অবহেলিত মানুষজনের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠা প্রাকৃত জগত। এখানেই বিভ্রান্তি আসে, প্রশ্ন জাগে মনে, কেন প্রকৃতির অনাদৃত রূপের দিকেও তাঁর দৃষ্টি পড়ল না? এর উত্তর তাঁর একটি মন্তব্য থেকেই খুঁজতে হয়, যেখানে লিখছেন—'চাষী-মজুর-মাঝি-মাল্লা-হাড়ি-বাগ্দীদের রুক্ষ কঠোর সংস্কারাচ্ছন্ন বিচিত্র জীবন কেন অবহেলিত হয়ে থাকে' তাই খুঁজে ফেরা তাঁর লেখক মনের লক্ষ্য, যে নিসর্গ পরিবেশে তারা বাসা বাঁধে তার বর্ণরঙীন চিত্র আঁকা নয়। অবশ্যই বস্তুবাদী লেখকের সেটিই প্রথম উদ্দেশ্য হওয়া চাই। আর তাই মানিক বাংলা উপন্যাসে প্রথম প্রকৃতি-উদাসীন গণ-ঔপন্যাসিক। তিনি অবশ্যই নাথানিয়েল হথর্ন, টমাস হার্ডি, সমারসেট মম বা আর্নেস্ট হেমিংওয়ের মত প্রকৃতিমুখী নন, যেমন নন টলস্টয়, গোর্কি, শেকভ বা শলোখভ।

মানিক আমাদের জানিয়েছেন (দ্রঃ 'লেখকের কথা') তিনি শৈশব থেকে সারা বাংলার গ্রামে শহরে ঘুরেছেন। কিন্তু প্রকৃতিকে মাটির থেকে, মানুষের সমস্যা ও সংগ্রাম থেকে আলাদা করে কখনও ভাবতে পারেননি। তাই তিনি বর্ষা-হেমন্ত-বসন্তের বৈচিত্র্য অনুধ্যানে নিরত হননি, কোন সমুদ্রের উদ্দামতা, নদীর মৃদুমন্দ বহতার পরিচয়ও মিলবে না তাঁর লেখায়, নর-নারীর জীবনবৃত্তে হয়ত চাঁদ ওঠে, তারা ফোটে, হাওয়ায় নানা বদল ঘটে, বৃষ্টি পড়ে কিন্তু তাতে সেই নর-নারী উন্মন হয় না, উন্মাদ ত' হয়ই না। আসলে তাঁর চরিত্রসমূহ তাঁরই মত নিসর্গ-উদাসীন। সমাজ অন্বিষ্ট লেখকদের এমনই সচেতনভাবে নিছক সৌন্দর্যসৃষ্টি থেকে আত্মসংযমের কৌশল জানতে হয়। মার্কসবাদী না হয়েও টলস্টয় সেই সংযম দেখিয়েছিলেন আর মানিক ত' শিক্ষায় ও আচরণে সম্পূর্ণ মার্কসবাদীই। তাঁর 'দিবারাত্রির কাব্য'-তে ফেনউচ্ছ্বসিত সমুদ্র, জ্যোৎস্না-বিধৌত পূর্ণিমার রাত একবারই এসেছিল—কিন্তু পরবর্তী মানিক-উপন্যাস সে পথ সম্পূর্ণ বর্জন করায় তাঁর জীবন-দর্শন সম্পর্কে ঐ উপন্যাসখানি আলোচনায় আসে না।

এর চমৎকার উদাহরণ নদী-আশ্রয়ী মানিকের দুটি উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি' এবং 'মাঝির ছেলে'। দুটি উপন্যাসের রচনাকালের ব্যবধান প্রায়

দু'দশক। কিন্তু বাংলাদেশের সবচেয়ে রহস্যজনক উন্মত্ত নদীর, তার তীরবর্তী গ্রামের ছবি উপন্যাসদুটিতে আছে। উপন্যাসে বর্ষার চিত্র আছে, গভীর রাত্রির বর্ণনা আছে, পায়ে চলা পথ, প্রচণ্ড ঝড়ের বর্ণনা আছে। কিন্তু সর্বত্রই চরিত্রকে আশ্রয় করে প্রকৃতির চলাফেরা।

'পদ্মানদীর মাঝি'তে সর্বত্রই প্রকৃতি এসেছে চরিত্রের বর্ণনা বা তার সমস্যা—অথবা তার লড়াইয়ের প্রয়োজনে।

দৃষ্টান্ত : ক. 'দিন কাটিয়া যায়। জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রে সময় পাক খায়, পদ্মার ভাঙন ধরা তীরে মাটি ধ্বসিতে থাকে। পদ্মার বুকে জল ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠে চর, অর্ধশতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়। জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনদিন বন্ধ হয় না......ওদিকে প্রকৃতির কালবৈশাখী তাহাদের ধ্বংস করিতে চায়, বর্ষার জল ঘরে ঢোকে, শীতের আঘাত ঘাড়ে গিয়ে বাজে কনকন।'

খ. 'তবু নদী ছাড়া সবই বাহুল্য। আকাশের রঙীন মেঘ ও ভাসমান পাখী, ভাঙন ধরা তীরে শুভ্র কাশ ও শ্যামল তরু, নদীর বুকে জীবনের সঞ্চালন, এসব কিছুই যদি না থাকে, শুধু এই বিশাল একাভিমুখী জল-স্রোতকে পদ্মার মাঝি ভালবাসিবে চিরজীবন। মানসী প্রিয়ার যৌবন চলিয়া যায়, পদ্মা ত' চিরযৌবনা।'

'সোনার চেয়ে দামী'তে দেখি—

'জ্যোৎস্না ছড়িয়ে গেছে চারদিকে। রুটির থালা সাজিয়ে আনতে রান্নাঘরে যেতে উঠোনটুকুতে যে জ্যোৎস্না পড়েছে সেদিকে তাকাতেও ইচ্ছে হয় না, চোখ উঠে যায় জ্যোৎস্নার আলোকিত ঐ আকাশে। সাধনাও ভাবে যে একি আশ্চর্য ব্যাপার? অন্ধকার রাত্রির সঙ্গে জ্যোৎস্নাভরা রাত্রির তফাৎ ত' এই যে পৃথিবীর মাঠ বাড়ি ঘাট পুকুর গাছপালা অমাবস্যার অন্ধকারে ঢাকা থাকে আর পূর্ণিমায় চাঁদের আলো মাখা রূপ নিয়ে ধরা দেয় চোখে—চোখ কেন পৃথিবীকে বাতিল করে আকাশে জ্যোৎস্নালোকের শোভা দেখে মুগ্ধ হয়?'

'ছন্দপতন' উপন্যাস—

'আকাশে প্রায় আস্ত একটা চাঁদ। ভাঙা ভাঙা মেঘভরা আকাশ আর ইট কংক্রীট খোলার ঘর ভরা শহর জুড়ে নয়ন মন ভুলানো অপরূপ শোভা

সৃষ্টি করেছে, আবার রাস্তার ঐ কুকুরগুলির উপরেও অকাতরে জ্যোৎস্না ঢেলে যাচ্ছে।'

'ইতিকথার পরের কথা' :

'আজকাল ভোরবেলা চারদিকে ঘন কুয়াশায় ঢেকে যায়। অল্প দূরেও নজর চলে না। কুয়াশায় রাত্রি শেষ হয়, আবার হিম হিম কুয়াশার যেন আভাস মেলে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে। কুয়াশা কাটতে বেলা হবে, তখন দেখা যাবে ক্ষেত ঢেকে গেছে আগামী ফসলের বাড়ন্ত সবুজ চারায়। ছড়ানো বীজ থেকে এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে জন্মেছিল শিশু, গোছায় গোছায় সাজিয়ে রোপণ করেছে চাষী। সারা দিন কাঁচা সবুজ শীষগুলি বাতাসে দোলে। নবাগত উত্তুরে বাতাস এখনো খেয়ালী, চপল। থেকে থেকে হঠাৎ থেমে যায়, বায়ু বয় পুব থেকে, তাও আবার হঠাৎ দিক পরিবর্তন করে বইতে শুরু করে দখিনা হয়ে। ধানের শীষ এখনো দানা বাঁধেনি, টিপলে এখনো গাঢ় আঠার মত দুধ বেরোয়, মার স্তনের দুধের চেয়ে বুঝি মিষ্টি। চাষীরা যা বলে যে তা হবে না কেন, মানুষ-মায়ের বুকে দুধ তো আসে মাটি-মায়ের দানা-বাঁধা এই দুধ খেয়েই।'

'মাঝির ছেলে' :

'নদীকে নাগা ভালোবাসে, নদীর তীরে জন্ম নিয়ে নদীর বুকে এতোদিন কাটিয়েও নদীর বৈচিত্র্য তার কাছে এতোটুকু একঘেয়ে হয়ে ওঠেনি।'

এ ভাবেই প্রকৃতিকে অন্য.কারও যেমন মানিক করেননি তেমনি প্রকৃতিকে নিয়ে উচ্ছ্বসিতও হননি। এর আর একটা কারণ তাঁর উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রগুলি মুখ্যত জীবন সমস্যায় অতিষ্ট, জীবন-সংগ্রামে কঠোর-প্রত্যয়ী। 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র শশী গ্রামীণ আবহাওয়ার কৃত্রিমতায় ক্লান্ত, —'তালবনে শশী কখনো যায় না। মাটির টিলাটির উপর উঠিয়া সূর্যাস্ত দেখিবার শখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না।' 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বইয়ে ধনী বীরেশ্বরের বাড়ীর সামনের বাগান সম্পর্কে লেখকেরযথার্থ বিদ্রূপ—'বাড়িগুলি যেমনই হোক, বাগানগুলি যেন বেঁটে বেঁটে উদ্ভিদের সাজানো গোছানো দোকান। অল্প একটু জায়গায় যতগুলি সম্ভব অরণ্যানীর প্রতিনিধিকে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে। দেখিয়া হয়ত কারও চোখ জুড়ায়। জগতে অন্ধ যত আছে, চোখ থাকিতে অন্ধের সংখ্যা তো তার চেয়ে কম নয়।'

আমাদের ধারণা মানিক যে কেবল প্রকৃতি-উদাসীন তাই নয়, তিনি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের নিখুঁত শিল্পীও। তিনি জানতেন নগর জীবনে নিসর্গ-প্রকৃতির কোন শোভা প্রকাশ পায় না, তার রূপবিলাস গ্রামে। কিন্তু গ্রামের অবহেলিত, লাঞ্ছিত মানুষরা সেই শোভা কতটুকু দেখে? সেই প্রকৃতির অন্তরে তাদের কত ঘর ভাঙে, কত বাড়ী ঘর ভেসে যায়, কত শবদেহের মিছিল? বস্তুতান্ত্রিক লেখক তাই 'প্রতিবিম্ব'র বেকার পার্টি কর্মী তারক, 'চিন্তামণি' উপন্যাসের রোগ-শোক-জর্জর রঘু, হরমণি, 'আদায়ের ইতিহাসে'র অস্থিরমতি ও বিকারগ্রস্ত চরিত্রের পরিবেশের প্রভাবে পরিবর্তন, 'সোনার চেয়ে দামী'র নায়িকা সংগঠক সাধনা, 'সার্বজনীন' উপন্যাসের ছিন্নমূল উদ্বাস্তুরা, 'পাশাপাশি'র সংসার-সংগ্রামী সুনীল, 'ইতিকথার পরের কথা'র কর্মোদ্যোগী নায়ক শুভ, 'আরোগ্য'র ড্রাইভার নায়ক কেশব, সহুরে মেয়ে ললনা এবং গ্রাম্য বিধবা মায়ার দ্বিমুখী আকর্ষণে ক্ষতবিক্ষত, 'হলুদ নদী সবুজ বন' উপন্যাসে নদী ও অরণ্য-সঙ্কুল পরিবেশে সংগ্রামী চেতনা নিয়ে ঈশ্বরের প্রতিরোধী ভূমিকা, 'মাশুল' উপন্যাসে মমতা এবং বাণীর ঐকান্তিকতা—ইত্যাদি সব চরিত্র এবং তাদের আচরণগুলিকে অধিকতর আন্তরিকতায় চিত্রিত করতে গিয়ে সঠিকভাবেই নিসর্গের প্রচলিত বর্ণনা থেকে দূরে সরে ছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতি-বিমুখ ঔপন্যাসিক এ অপবাদ কখনই সত্য নয়, যদিও প্রকৃতিকে প্রধান করে উপন্যাসে রোমান্টিকতার প্রশ্রয় দানের ইচ্ছা তাঁর মত গণ-লেখকের মানসিকতায় আসতে পারেনি।

৫

মানিকের উপন্যাস-আঙ্গিকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষনীয় বিষয় কোনটি? এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁর রচনার অনুরাগী পাঠকরা অতি দ্রুত তাঁর ভাষার কথাই বলবেন। অবশ্য বুর্জোয়া লেখকরা ঘটনা বিন্যাসে এবং চরিত্রের বৈশিষ্টা প্রকাশে যেভাবে ভাষার মারপ্যাঁচ সৃষ্টিতে সময় এবং শক্তি ব্যয় করেন প্রগতিশীল লেখকরা তেমনটি করেন না। তাঁর লেখায় তাই কাফকার মত চেতনাপ্রবাহ গদ্যের উপস্থিতি নেই। অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীতে কল্লোল যুগের লেখকদের অনুবাদমুখী ভাবাদর্শ, বিভূতিভূষণের কাব্যিক ভাবাদর্শ এবং রবীন্দ্রনাথ ও তারাশঙ্করের মননপ্রধান ও ধ্রুপদী গদ্যের আদর্শকে সন্তর্পণে কাটিয়ে উঠে মানিক তাঁর উপন্যাসের রূঢ় বাস্তব বিষয়—

বস্তুর মত রূঢ় বাস্তব ভাষার উপস্থাপনা ঘটিয়েছেন। যেখানে যেমন চরিত্রের দেখা পাই সেখানে তেমনই ভাষা। ঘটনা যে-পরিবেশে ঘটছে ভাষাও সেই পরিবেশানুগ। এক্ষেত্রে তিনি সাধু এবং চলিত দুই ভাষাকেই আশ্রয় করেছেন।

মানিক সাধু গদ্যের প্রচলিত আবেগ জাগানো রীতি পরিত্যাগ করেছেন, এটি লক্ষণীয়। বঙ্কিম থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত গদ্যকাররা ঐ ধরনের গদ্যের মধ্যে যে সব শব্দ ব্যবহার করতেন সেগুলি খুব কমই সমকালীন, বরং সেক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী অনুষঙ্গ (association) জড়িত রয়েছে। কিন্তু মানিকের সাধু গদ্য সহজ, স্বচ্ছন্দ এবং অনুচ্ছেদ থেকে অনুচ্ছেদে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়। উপন্যাসের কোন কোন জায়গায়, বিশেষতঃ রচনার মাধ্যম যেখানে সাধুভাষা, সেখানে আবেগধর্মী গদ্য এসেই যায় এবং মানিকেও তা এসেছে—

'এমনি চাঁদনি রাতে আপনার সঙ্গে কোথাও চলে যেতে সাধ হয় ছোটবাবু।'

'গভীর দুঃখের সঙ্গে শশীর মনে হয়, একথা কুসুমের বানানো। মতিকে পাছে সে আবার নিজে বিবাহ করিয়া কুমুদের হাত হইতে বাঁচাইতে চায়, তাই কুসুম এই মন রাখা কথা বলিয়াছে। বলুক। সে ত' কুমুদ নয়, তার জীবনে সবই অভিনয়। তবু চাঁদের আলোয় চারিদিক আজ কেমন স্বপ্ন দেখিতেছে ত্যাখো। এ যেন বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না কুসুমের কুটিলতার বিষে এমনি সময়ে এত কষ্ট পাওয়া তাহার ভাগ্যে ছিল। কিন্তু কেন সে দাঁড়াইয়া আছে, কেন সে চলিয়া যাইতে পারে না? কে জানে, জীবনের বিতৃষ্ণা ও আত্মগ্লানি ভরা মুহূর্তগুলির আকর্ষণ তাঁর কাছেই এত তীব্র? কুমুদ হয়ত ছুটিয়া পালাইত, বলিয়া যাইত তুমি গোল্লায় যাও কুসুম। অথবা হয়ত নিজের আনন্দ দিয়া, এই জ্যোৎস্নার কবিতাটুকু ছাঁকিয়া লইয়া এমনি স্থূল মুহূর্তগুলিকে অপূর্ব করিয়া তুলিত? কুসুম নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু!'

'শরীর! শরীর!'

'তোমার মন নাই কুসুম?' (পুতুলনাচের ইতিকথা)

উদ্ধৃত অংশটিতে আবেগ স্থায়ী হয়ে রয়েছে শশীর মনের গহন কোণে। আবেগ যে কতখানি বন্ধকরুণ হতে পারে তার পরিচয় এখানে আছে।

ধ্রুপদী গদ্য হলেও তৎসম শব্দের ঘটা নেই। 'বিতৃষ্ণা', 'আত্মগ্লানি,' 'স্থূল' ইত্যাদি শব্দের সাহায্যে শশীর বুদ্ধি-সংযম প্রবৃত্তির দিকটি এবং কুসুমের বেপরোয়া প্রবৃত্তির দিকটি ফুটে উঠেছে। এক্ষেত্রে উভয়ের সংলাপের দুটি অংশ 'আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু' (কুসুম) এবং 'তোমার মন নাই কুসুম' (শশী)—তীব্র, তীক্ষ্ণ, চরিত্রানুগ ত' বটেই। মনে রাখা দরকার এই ভাষা তাঁর সাহিত্য জীবনের সূচনা পর্বের। তারপর তিনি ভাষা সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করেছেন এবং তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মুখে যে সব উক্তি বসিয়েছেন তা থেকেই বোঝা যায় প্রোলেতারিয়েত লেখকের দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি কতদূর নিষ্ঠাবান ছিলেন। 'শুভাশুভ' উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে উপন্যাস লেখার পুরোনো নীতিকে তিনি 'পুতুলনাচের ইতিকথা' থেকেই ভাঙতে শুরু করেন। তাঁর ভাষা-প্রসঙ্গেও এ কথা মনে রাখা ভাল। কথাশিল্পী মানিক ব্যক্তিজীবনে শরৎচন্দ্রের মতই সমাজের অন্তেবাসী মানুষদের সঙ্গে মিশেছিলেন, তা ছাড়া শরৎচন্দ্রের চেয়ে বিভিন্ন আন্দোলনের সূত্রে শ্রমিক-কৃষক ও বস্তিবাসী নিম্নবিত্ত মানুষদের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা বেশী ছিল। শ্রমিক-কৃষক-কেরানী কোন আবেগে তাড়িত হয়ে কোন ভাষায় কথা বলে তার সন্ধান তিনি রাখতেন। অধিকাংশ বাঙালী লেখক সেই জনজীবনের শরিক না হতে পারায় তাঁদের ভাষা হয়ে ওঠে কৃত্রিম। তাঁর 'ছন্দপতন' উপন্যাসের নায়ক নবনাথ রায় কাব্যভাষার সেই রীতিটিই মেনেছে। ওই উপন্যাসে মানিকের স্পষ্ট জেহাদ—

> শব্দমদ বেচা শুঁড়িগুলো
> কাব্যলক্ষ্মীর দেহ চিরদিন কচি রেখে দিল।
> শুঁড়িগুলো সব মরে যাক্
> কাব্যলক্ষ্মীর দেহে যৌবনের জোয়ার ঘনাক।

কাব্যভাষা সম্পর্কে যিনি একথা ভাবেন তিনি উপন্যাসের ভাষা সম্পর্কে আরও সহজতা এবং স্বাভাবিকতার পক্ষপাতী। তাঁর উপন্যাসের মাঝি, মজুর, চাষী ও বস্তির নরনারী কথা বলে 'যুদ্ধের ভাষায়'—এই ভাষা বাংলা কথাসাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন। তাঁর কবি 'ভালবাসা' শব্দটির যে ব্যাখ্যা করেছে তাও বাংলা উপন্যাসে এতাবৎ অশ্রুত—'ভালবাসা স্বপ্ন, ভালবাসা রক্তমাংসের শরীর, ভালবাসা দশজনের সঙ্গে মেলানো জীবন, ভালবাসা রাগ ভয় ভক্তি

ঘৃণা হিংসা মমতা সব কিছু দিয়ে গড়া।' আসলে লেখকরা প্রায়শই গোপন করেন, আর মানিক সব কথা প্রকাশ করে দিয়েছেন। তিনি 'বাস্তব জীবনের প্রাণের ভাষা' খুঁজে খুঁজে আমাদের শুনিয়ে দিয়েছেন।

ভাষার ব্যাপারে মানিক কতখানি ভাবতেন তার প্রমাণ মেলে 'সার্বজনীন' (১৯৬২) উপন্যাসের 'লেখকের কথা' অংশে—'পদ্মানদীর মাঝিতে সকলেই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেছে। অন্য বইয়ে এ পর্যন্ত যত পূর্ববঙ্গীয় চরিত্র এনেছি সকলকেই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলিয়েছি। এই কাহিনীতে সর্বপ্রথম ওরকম চরিত্রের মুখে সাহিত্যের চলতি কথ্য ভাষা বসালাম।·········

'···বিশেষ কাহিনীতে বিশেষ প্রয়োজনে ছাড়া চরিত্রগুলিকে মোট দুটি ভাগ করে দু'রকম আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলানো উচিত নয়—বিশেষ করে চরিত্রগুলি যদি একই শ্রেণীর মানুষ হয়।' তাঁর এই রীতি যে কতখানি সার্থক ও মর্মভেদী হতে পারে তার পরিচয় উপন্যাসটির একটি অংশ থেকেই পাওয়া যায়—

> 'কয়েক মুহূর্ত ভয়ার্ত দিশেহারা মানুষের মুখভঙ্গি অপূর্ব অভিনয়ে ফুটিয়ে তুলে বিহ্বল নেশাখোরের মত উপস্থিত সকলের মুখ, নোংরা রাস্তা, সামনের বাগানবাড়ী আর আকাশের দৃশ্যমান অংশটুকুতে চোখ ঘুরিয়ে এনে নিজের পেট চাপড়ে হো হো শব্দে হেসে ওঠে।
> আছি আছি আমি আছি! রেশন নিতে এসেছিলাম আমি, ভুলেই গেছিলাম বাবা! পেটে খিদেটা ছোবল মারছে সাতাশ কোটি সাপের মত। আমিই যদি না থাকব, তবে কিসের রেশন, কিসের খিদে!'

এই ধরনের ছোটখাটো ডিটেলসের কাজে মানিক অসামান্য। তবু পাঠককে অনেককিছু অনুমান করতে সুযোগ দেন তিনি। এই অংশে শব্দ ব্যবহারে তিনি সচেতন, অথচ ক্রিয়াপদের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার করে ঘটনার গতিও দুর্বার করে রাখতে পারেন। এটা সম্ভব হয় ক্রিয়াপদগুলির বলিষ্ঠতার জন্য।

ঔপন্যাসিক মানিকের খুব কম রচনাই নাট্যায়িত হয়েছে এটা বেদনার কথা। যাঁর সাহিত্য গণমুখী তাকে কেন গণজীবনের মধ্যে নাট্যাকারে ছড়িয়ে দেওয়া যাবে না বা হবে না? বিশেষতঃ তাঁর উপন্যাসের ভাষা-

সংলাপ নাট্যকারদের অনেক পরিশ্রম কমিয়ে রেখেছে যেখানে। এমনকি সংলাপগুলি হুবহু ব্যবহার করলেই তা বেশী আকর্ষণীয় হতে পারে। তাঁর চরিত্রের সংলাপ সম্পূর্ণ চরিত্রাশ্রয়ী, বাস্তব এবং অকৃত্রিম। আগামী নাট্য-রূপকারদের কথা মনে রেখেই দু'একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি—

ক. কপিলা আসিয়া বলে, থাকবা নাকি মাঝি ?

দুইদিন থাইকা যাও ? আইছ ক্যান কও দেহি ?

সুবচনীর হাটে যামু মন কইরা বাইরইছি কপিলা। তা ভাবলাম তরে দেইখা যাই।

কপিলা মুচকি হাসিয়া বলে, সুবচনীর হাট নাকি আইজ ?

কুবের বিবর্ণ হইয়া বলে, না ?

হাটে গিয়া ঘুমাইয়া থাকগা মাঝি, কাইল হাট কইরা বাড়িতে যাইও···। (পদ্মানদীর মাঝি)

খ. (মানসী আর কবি)

: এদিকে শরীর তো গেল।

যাক্। এখন ঢিল দিতে পারব না।···কিন্তু তোমার কি হয়েছে ?

: তুমি শুকিয়ে যাচ্ছ কেন ?

: আমি ? আমিও খেই খুঁজছি।

* *

(তৃপ্তি ও কবি)

তৃপ্তি বলে, আস না যে ?

: আমার যে কিভাবে দিনরাত কাটছে—

: সে তো জানি। চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। এর কি শেষ নেই ?

: যা খুঁজছি পেলেই শেষ। কিন্তু তোমার কি হয়েছে ? চোখের কোণে কালি পড়েছে যে ?

: খুব বেশি শান্তিতে আছি কিনা, তাই। (ছন্দপতন)

গ. নবেন্দু নমিতাকে বলে—স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব থাকাই যথেষ্ট—একটা স্নেহপ্রীতির সম্পর্ক আর দু-পক্ষের ভদ্র ব্যবহার—ব্যস্ আর কি চাই ? নমিতা বলে, একঘেয়ে জোলো হয়ে যায় না সম্পর্কটা ? নবেন্দু বলে, কেন তা যাবে ? জীবনে আনন্দ আনার কত উপায় আর উপকরণ—সংস্কার ছাড়লেই হল। তবু নেহাৎ যদি একঘেয়ে হয়ে যায় জীবন,

কোন একটা লড়াইয়ে যোগ দিয়ে দরকার হলে ছ'মাস জেল খেটে শুধরে নেওয়া যায়।

—ও বাবা—জেল খেটে!

জেল খাটা আসল কথা নয়—আসল হল দশজনের জন্য লড়াই-এ ঝাঁপিয়ে পড়া। কত অন্যায়ের বিরুদ্ধে, কত উচিত দাবীর জন্য কত লড়াই চলছে,—একবার যোগ দিয়ে মজে গেলে মানুষ নিজেই ভুলে যায়। বিশ্ব সংসার ভুলে যায়। (মাশুল)

আধুনিক বাঙালী নাট্যকাররা যেমন মানিকের উপন্যাস সম্পর্কে উদাসীন তেমনি অত্যাধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকরাও বড়জোর বুদ্ধদেব বসুর রচনাদি পর্যন্ত পৌঁছুতে চান, মানিকের রচনা নৈব নৈব চ। অথচ কথাসাহিত্যের ভাষার মানকে কতখানি উঁচু এবং সহজবোধ্য করা যায় সে সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ভাবনার বিশদ পরিচয় ত' পাওয়াই গেল। এই সূত্রে তাঁর অজস্র উক্ত বাক্য বা বাক্যাংশ প্রায় প্রবাদের পর্যায়ে পৌঁছেচে এ কথা মনে রাখা দরকার। প্রবাদ হল সমাজ জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অবিকৃত অভিব্যক্তি এবং তার ব্যবহারে লেখকের বস্তুমুখীন চিন্তার প্রকাশ ঘটে। এ ধরনের বেশ কিছু উক্তি উদ্ধার করা যায় যে গুলি আগামীদিনে লোকজীবনে প্রবাদে পর্যবসিত হবে এবং লোকসাহিত্যের ও ভাষাতত্ত্বের গবেষণার বিষয় হবে।

(সার্বজনীন)

থার্ড ক্লাসের মানুষ এ ধরনের স্বার্থপরতা জানে না।

* *

মনকে চাওয়াতে হয়। মনের ওপর জোর খাটাতে হয়।

* *

দেশের লোকের ভাত নেই, কাপড় নেই, অনাচার অত্যাচারের সীমা নেই—এ অবস্থায় পূজোর আনন্দে মাতা উচিত নয়।

* *

হ্যাঁ, শক্ত তেজী মায়া। এক রকম মায়া আছে না, ভীরু তুলতুলে মায়া, কেঁদে ককিয়ে দরদ দেখানো? এসব মানুষের ও জিনিস মোটে পছন্দ নয়।

* *

[সোনার চেয়ে দামী (বেকার)]

কাঁদলে দুঃখের চাপ কমে যায়।

* *

পেটভরা অন্ন আর বুকভরা জ্বালা কি মানুষকে বোবা করে দেয়?

* *

পুরুষের বিরুদ্ধে মেয়েদের কোন লড়াই নেই। সব লড়াই অবস্থা আর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। কোন দেশে যদি একজন বেকার হয়ে থাকে, সে দেশে, একটি মেয়ের সাধ্য নেই স্বাধীন হয়।

* *

যতক্ষণ না নতুন পথ সুনিশ্চিত হয়ে যায়, সোজা চলার পথ সে খুঁজে পায় না। মধ্যবিত্তের বিপ্লব তাই আসে অতি বিপ্লব আর প্রতিবিপ্লব মারফতে, যতক্ষণ না প্রকৃত বিপ্লব রূপ নেয়।

* *

স্বামী দেনা করে তাকে আরামে রেখেছে জানলে কোন স্ত্রী খুশী হয়?

* *

[সোনার চেয়ে দামী (আপোষ)]

সোনার রঙেই সবচেয়ে রঙীন হয় জীবন।

* *

ফাঁক পেলেই সোনা বিবেকে চেপে বসে।

* *

সুখের আবার আসল নকল আছে নাকি? সুখ হল সুখ, অসুখ হল অসুখ।

* *

বিজ্ঞাপনে বেঠিক কথা লিখতে হয়। ওটাই হল বিজ্ঞাপনের আর্ট।

* *

[ছন্দপতন]

নিজেকে ফাঁকি দেওয়ার চেয়ে বোকামি জগতে কি আছে।

* *

সমাজ পচে গিয়ে থাকলে আমরা বেঁচে আছি কি করে? মানুষ কি তা হলে বাঁচে?

* *

ভাত কাপড়ের কবিতা লিখে কি কবি পপুলার হয়। ভাত কাপড় যারা চায় তাদের প্রাণের কবিতা লিখতে হয়।

* *

ভালবাসাটাই এমন জিনিস যে একপেশে হতে পারে না। হয় দুজনে ভালবাসবে—নয় ভালবাসাটাই হবে না।

এমন অসংখ্য মূল্যবান প্রবাদকল্প উক্তি মানিক-উপন্যাসে ছড়িয়ে রয়েছে সেগুলির উপর ভিত্তি করে একটি গবেষণা নিবন্ধ পর্যন্ত রচিত হতে পারে।

৬

১৯:৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে হিন্দী সাহিত্যের 'কলম কা সিপাহী' প্রেমচন্দের মৃত্যু ঘটে। শোষণ, পীড়ন, দুঃখ, দারিদ্র্য থেকে মুক্ত যে নতুন সমাজের স্বপ্ন প্রেমচন্দ দেখতেন তাঁর মৃত্যুর বছর থেকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই স্বপ্নকে সত্য করবার জন্যই গণ-উপন্যাস রচনা শুরু করেন। প্রেমচন্দের 'গোদান' উপন্যাসেরই হোরি, গোবর, ধনিয়া, ঝুনিয়া, মেহতা, মালতী প্রভৃতিরা মানিকের নানা উপন্যাসের চরিত্রের পূর্বচ্ছায়া।

জীবন দর্শনের ক্ষেত্রে মানিকের সমকালীন অন্য এক লেখক, জার্মানীর ফ্যাসি বিরোধী আন্দোলক বিশ্বখ্যাত নাট্যকার বারটোল্ট ব্রেখটের সঙ্গে মানিকের আশ্চর্য মিল। গণ-শিল্পীদের ডাক দিয়ে ব্রেখট বলেছেন—'Fight through writings! Show that you are fighting. Vigorous realism, realism is on your side, be on the side of reality. Let life speak.' মানিক কেবল লেখার মধ্য দিয়েই সংগ্রাম করেননি, তাঁকে আমরা দেখছি মাঠে-ঘাটে-কলে-কারখানায় সংগ্রামে রত। তাঁর উপন্যাস তাই সত্যে ভরা, জীবন্ত চিত্র। 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বলা হয়েছিল—"মানুষের প্রতি যে গভীর মমত্ববোধ ও গভীরতর দায়িত্ববোধ হইতে নিঃস্ব মেহনতী মানুষের জীবনযাত্রাকে তিনি নির্মম বাস্তবতায় চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন, ভাবালুতাকে স্তব্ধ এবং আবেগকে সংযত করিয়া যুক্তি, বুদ্ধি ও বিশ্লেষণীমেধার সাহায্যে গলিত পুঁজিবাদী সমাজের স্বরূপটি উদ্ঘাটিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা অন্তত আমাদের সাহিত্যিক সমাজে মেলে না।... জীবনের শেষ দিকে ব্যাপক গণবিক্ষোভ ও কৃষক বিদ্রোহের মধ্যে তাঁহার লেখনী এক আশ্চর্য দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। বিপ্লবী জীবন ও বিপ্লবী ঘটনাকে রসোত্তীর্ণতার শিখরে তুলিয়া তিনি বাংলার প্রগতি সাহিত্যকে নতুন পথের নির্দেশ দিয়াছিলেন।" এই সম্পাদকীয় রচনার পর দুটি যুগ পার হতে চলল। এখন পর্যন্ত কোন গণ-ঔপন্যাসিকের পক্ষেই মানিকের প্রতিভাকে স্পর্শ করা সম্ভব হয়নি সে কথা সহজেই বলা যায়।

পুতুলনাচের ইতিকথা

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী

আধুনিকতার নানা স্বরূপ-লক্ষণ 'পুতুলনাচের ইতিকথা'-র (১৯৩৬) আগেই একালের বাংলা উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ করেছে—রবীন্দ্রনাথ থেকে 'অন্তঃশীলা'র (১৯৩৫) স্রষ্টা ধূর্জটিপ্রসাদ পর্যন্ত বিভিন্ন লেখকের রচনায় তার সাক্ষ্য মিলবে। বাংলা উপন্যাসে আধুনিক জটিল জীবন জিজ্ঞাসার সেই বহমান ধারায় 'পুতুলনাচের ইতিকথা' এক গূঢ় তরঙ্গবেগ সঞ্চার করেছে। আর জীবনের সেই গভীর স্বরূপ সন্ধানের অনন্যতায় উপন্যাসটি, এক অর্থে, মহৎ উপন্যাসের দুর্লভ মহিমাকেও যেন স্পর্শ করেছে। বস্তুত তিরিশের দশকের এই উপন্যাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বের আধুনিকতার প্রত্যাশিত মৌললক্ষণগুলি নিহিত থাকলেও পাঠকমনে এর সংবেদন কিন্তু গভীরতর এক বোধের দিকে। শেষ পর্যন্ত আধুনিকতা-অনাধুনিকতার সীমিত লক্ষণ পার হয়ে জীবনের গভীরতর উপলব্ধির আভাস এনে দেয় উপন্যাসটি। আপন অস্তিত্বকে ঘিরে ব্যক্তির যে যন্ত্রণা ও সংকট, জীবনের সঙ্গে মৃত্যুকে মিলিয়ে সত্তার যে অনিঃশেষ জিজ্ঞাসা—আধুনিক ব্যক্তি মানুষের চেতনার দর্পণে জীবনরহস্যের সেই চিরায়ত অনুভবগুলি এক অভিনব শিল্পরূপ পেয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে। উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে ব্যক্তিসত্তার এক অপরূপ 'ওডিসি'—জটিল অথচ গভীর চেতনালোকের আলোছায়ায় ব্যক্তি মানুষের পথ চলার এক আশ্চর্য 'ইতিকথা'।

'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় আধুনিক জটিল জীবনবোধের যে প্রতিফলন ঘটেছে, বলাবাহুল্য তার অনেকটাই উপন্যাসের নায়ক শশীচরিত্রের দর্পণে। এদিক থেকে চতুরঙ্গের নায়ক শচীশ বা অন্তঃশীলার খগেনবাবুর সঙ্গে শশীর একটা ভাবসাদৃশ্য হয়তো অনুভব করা চলে। জীবনের তাৎপর্য সম্পর্কে গূঢ় জিজ্ঞাসা এদের সকলের চেতনাকেই তীব্রভাবে বিক্ষুব্ধ আলোড়িত করেছিল, এদের গোটা জীবনটাকেই বিদ্ধ করেছিল এক কঠিন যন্ত্রণায়। কিন্তু তবু 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র নায়কের মুখে রবীন্দ্রনাথ ধূর্জটিপ্রসাদের নায়কের

ঔজ্জল্য দেখতে পাইনি। শশী শচীশের মতো বুদ্ধি উজ্জল অগ্নিশিখা নয়, কিংবা অন্তঃশীলার নায়কের মতো প্রখর মননজীবীও নয়। ওদের 'অসামান্যতা' তার নেই। কিন্তু তবু বাংলা উপন্যাসে আধুনিক জীবন-ভাবনা বিন্যাসের দিক থেকে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র নায়ক এক অনন্য চরিত্র সন্দেহ নেই। আবার অন্যদিকে একথাও সত্য যে একালের উপন্যাসে, বিশেষত মানিকের অনেক রচনাতেই শ্রমজীবী মানুষের কিংবা অবহেলিত বৃহৎ জনগোষ্ঠীর যে অর্থনৈতিক সংকট ও সংগ্রামের ছবি মেলে কিংবা যে অবচেতন আশ্রিত যৌন সমস্যার মুখ্য ভূমিকা থাকে, অর্থাৎ যাদের আমরা সাহিত্যে আধুনিকতার অন্যতম মৌল লক্ষণ বলে জানি, 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসে সেইসব লক্ষণ আদৌ তেমনভাবে পাইনি। কিন্তু তবু হয়তো নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতার যথার্থ স্বরূপ লক্ষণের দিক থেকে এই গ্রন্থ এক তাৎপর্যপূর্ণ স্মরণীয় সৃষ্টি। গ্রন্থটিতে আধুনিকতার সেই স্বরূপলক্ষণের অনেকটাই ফুটে উঠেছে মানিকের বৈজ্ঞানিক চেতনাসম্ভব মর্মভেদী বাস্তবদৃষ্টির মাধ্যমে।

বুদ্ধদেব বসু কথিত এই 'belated Kallolean'-এর জীবনদৃষ্টি কেবল যে কল্লোলের কালের উচ্ছ্বাস ফেনিলতাকে অতিক্রম করেছিল তাই নয়, বিজ্ঞানের এই একনিষ্ঠ ছাত্রের দৃষ্টি লাভ করেছিল এক সংযত বুদ্ধিদীপ্ত নির্মোহ বিশ্লেষণী শক্তি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এই নির্মোহ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ঔপন্যাসিকেরই অপরিহার্য দৃষ্টি, যা জীবনের বাস্তবতা উন্মোচনে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

'পুতুলনাচের ইতিকথা'র পূর্ববর্তী দুটি উপন্যাসে—'জননী' ও 'দিবা-রাত্রির কাব্যে' দেখতে পাই লেখকের এই নির্মোহ দৃষ্টির প্রতিফলন। প্রথমটিতে জননী-হৃদয় নিয়ে আদর্শবাদের উচ্ছ্বসিত অতিরেকের বদলে মাতৃ সত্তার গূঢ় আশা-স্বপ্ন আনন্দ-যন্ত্রণার ছবিটি নির্লিপ্ত বাস্তবতায় ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। 'দিবারাত্রির কাব্যে'ও নরনারীর সম্পর্ককে আবেগের কুয়াশায় অতিরিক্ত রঙীন না করে লেখক নির্মোহ পর্যবেক্ষণী দৃষ্টিতে এর অন্তর্গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়াসী হয়েছেন। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় লেখকের এই বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টি অধিকতর বাস্তব উপকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবার ফলে আরও দৃঢ় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এখানে নায়ক নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র—চিকিৎসক। বিজ্ঞান শিক্ষা তাকে দিয়েছে যুক্তিবাদী মন, প্রচলিত সংস্কার-বিশ্বাসকে পদে

পদে যাচাই করে নেবার উপযুক্ত মনন। আর সেই সঙ্গে তিরিশের দশকের এই নায়কের ব্যক্তিত্বে মিশেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়। বলা বাহুল্য, এই দ্বিধা-সংশয়ও যুক্তিবাদী তথা অন্তর্মুখী মনেরই প্রকাশ। সব মিলিয়ে পুতুলনাচের ইতিকথায় শশী আত্মপ্রকাশ করেছে একালের মনন ও চিন্তা-চেতনায় বিক্ষুব্ধ এক যন্ত্রণাবিদ্ধ অন্তর্মুখী নায়ক চরিত্র রূপে।

এই অন্তর্মুখী নায়ককে কেন্দ্র করে যে-উপন্যাসের অবয়ব গড়ে উঠেছে, স্বভাবতই সেখানে স্থূল ঘটনার—হেনরী জেমসের ভাষায় 'mere seated mass of information'-এর ভূমিকা মুখ্য নয়, নায়কের মনে সেইসব ঘটনার সূক্ষ্ম জটিল প্রতিক্রিয়াই মুখ্য। লেখকের চোখে ঘটনা অপ্রধান ত' বটেই, এমন কি উপন্যাসটিতে একটানা একটি অখণ্ড আদি-মধ্য-অন্ত্য যুক্ত কাহিনীও গড়ে উঠতে পারেনি। প্রসঙ্গত বলে নিতে পারি যে, এই উপন্যাসের কাহিনী-বিবৃতির ভঙ্গি আসলে 'ইতিকথা'র ভঙ্গি, কোন নাট্যরস-পুষ্ট সংবৃত্ত প্লট-রচনার রীতি নয়। এখানে যেন এক বহতা জীবনের গল্প বলা হচ্ছে, যে-জীবনের স্রোত আপাত-বিচ্ছিন্ন অনেক ছোট ছোট ঢেউয়ের সমষ্টি, শুধু দু' একটি উত্তাল তরঙ্গের সংঘাতে বিক্ষুব্ধ নয় কেবল। যাক্ যা বলছিলাম। বস্তুত কয়েকটি খণ্ড-'এপিসোড' সৃষ্টি করেছেন লেখক, আর নায়কের মনে সেইসব ঘটনা যে-ভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়েছে ('এইসব খণ্ড খণ্ড ছবি দেখা আর এইসব ঘটনার বিচার'—পরিচ্ছেদ : ১২) তা'-ই সমগ্র উপন্যাসে এক ধরনের বন্ধনহীন গ্রন্থি রচনা করেছে। লেখক এ ধরনের উক্তি নানা অনুষঙ্গেই করেছেন—'শশী ভাবে, ভাবিয়া অবাক হয়'—প্রকৃতপক্ষে ঘটনার প্রকাশ্য পথ দিয়ে নয়, ভাবনার অন্তর্গূঢ় পথ বেয়েই শশী জীবনের অসীম বিস্ময়-ভরা রহস্যময় স্বরূপের জগতে পৌঁছনোর প্রয়াস পায়।

উপন্যাসে ছড়ানো-ছিটানো নানা বিচ্ছিন্ন ঘটনা যে-জীবনের এক গভীর অর্থবহ তাৎপর্যের ইঙ্গিত দিয়েছে, আগেই বলেছি, তার মূলে আছে শশীর মনে তার ভাবনা বাহিত প্রতিক্রিয়া। আর এই কারণেই উপন্যাসটিতে মুখ্যত শশীর দৃষ্টিকোণই ব্যবহৃত হয়েছে (মতি-কুমুদের উপাখ্যানে অবশ্য এর ব্যতিক্রম চোখে পড়ে)। উপন্যাসের সব ঘটনা যদিও সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থাৎ প্রথম পুরুষের জবানীতে বলা, তবু আসলে লেখক তাঁর সর্বজ্ঞতাকে সীমিত করে নায়কের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকেই বেশীর ভাগ ঘটনা ও চরিত্রকে দেখাতে চেয়েছেন। আর তাই এইসব ঘটনা ও চরিত্রকে

পরপর-বিচ্ছিন্ন মনে হলেও আসলে তা নয়। এদের মধ্যে এক গূঢ় ঐক্য বর্তমান। কারণ এই সব কিছু শশীর দৃষ্টিবিন্দুতে প্রতিফলিত হওয়ার অর্থ তার চেতনায় এদের গভীর প্রতিক্রিয়া এবং তজ্জনিত অনুভব-উপলব্ধি সঞ্চারিত হয়ে-যাওয়া—যা পরিণামে নায়কের সমগ্র জীবন দৃষ্টিকেই প্রভাবিত করে। তাই বলতে পারি আমরা, পাঠকরা, উপন্যাসটিতে যে-জগতের মধ্যে প্রবেশ করি, বিচরণ করি, সেটি এক অর্থে শশীরই জগৎ—তার জীবনের ঘটনা ও মনের ভাবনা তথা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আনন্দ-বেদনা দিয়ে গড়া জগৎ। 'শশীর জগৎ' বলছি বটে, কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে প্রবেশ করলে দেখি যে, সেই জগতের উপর শশীর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এই জগতের অন্তর্নিহিত অর্থহীন অসঙ্গতিকে মাঝে মাঝে সে বদলাতে ইচ্ছা করে, কিন্তু শেষে সে বোঝে সবই নিষ্ফল চেষ্টা। তাই চলতে চলতে সে শুধু দেখে—। তার দৃষ্টি অনেকটাই নিরুচ্ছ্বাস নির্মোহ দর্শকের (উপন্যাসের নিরুচ্ছ্বাস, অনুত্তেজিত, বর্ণাতিরেক-বর্জিত ভাষাভঙ্গিতে এই দৃষ্টিরই প্রতিফলন।) আর সেই দৃষ্টির আলোয় সে খুঁজে বেড়ায় জীবনের নিহিত নিগূঢ় তাৎপর্য।

শশীর দৃষ্টির দর্পণে যে-জীবনের রহস্য-তাৎপর্য প্রতিফলিত হয়েছে সেই জীবনকে সে দেখেছে নিজের পরিবারে, দেখেছে পরিবারের বাইরে পথে ঘাটে, প্রতিবেশীদের সংসারে—তাদের ব্যাধিতে মৃত্যুতে, আত্মবঞ্চনায়, স্বভাবের বিকারে, অস্ফুট অথচ উদ্দাম প্রণয়-বাসনায়। বলা বাহুল্য, এই জীবন-পরিবেশ গ্রাম্য, এর সব নরনারীই গ্রামীণ—'গাওদিয়ার গেঁয়ো' মানুষ, শশী-ও গ্রামের মানুষ। 'এখানে জন্ম শশীর, এইখানে সে বড় হইয়াছে। এই গ্রামের সঙ্গে জড়ানো তার জীবন।' (পরিচ্ছেদ : ১৩) কিন্তু সে শহরে উচ্চশিক্ষা পেয়েছে, পরিশীলিত মন ও নাগরিক সুলভ যুক্তিবাদী বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে জীবন ও জগতকে সে দেখতে শিখেছে। জীবন যে সহজ ঋজুরেখায় চলে না, তার গতি যে তির্যক রহস্য-জটিল পথে, বিশ শতকের তিরিশের দশকের এই শহর-প্রত্যাগত যুবক তা বোঝে, বিশ্বাস করে। সেই জীবনের প্রতি তার আকর্ষণও প্রবল। আর তাই উপন্যাসের প্রথম দিকে দেখি, গ্রামীণ জীবন সম্পর্কে তার প্রচণ্ড অনীহা—এর বৈচিত্র্যহীন স্তিমিত বদ্ধরূপের প্রতি একান্ত বিতৃষ্ণা। 'গ্রাম্যজীবনে…শশীর বিতৃষ্ণা আসিয়াছে।' আর সে জন্যেই সে গ্রাম ত্যাগ করে শহরে চলে যেতে চেয়েছে বারবার, শহরের বিশাল 'নূতন জগতে নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ' করতে চেয়েছে।

কিন্তু ক্রমশ গ্রামীণ জীবনের এক নূতন মাত্রা তার চোখে উন্মোচিত হয়েছে—সেটি এর জটিলতা ও গভীরতার দিক। শশী অনুভব করেছে, 'গ্রামে জীবন কম গভীর নয়, কম জটিল নয়। একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে গ্রামে ডাক্তারি শুরু করিয়া ক্রমে ক্রমে এ জীবন শশীর যে ভাল লাগিতেছে, ইহাই *তাহার প্রথম ও প্রধান কারণ' (পরিচ্ছেদ-৫)।* এই জটিল-গভীর জীবনের নিহিত গাঢ় রহস্য রূপের দ্বারা শশী আক্রান্ত হয়েছে ধীরে ধীরে। নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে।

প্রসঙ্গত একটা কথা। শহর ও গ্রামের জীবন সম্পর্কে শশীর মনে এই সামঞ্জস্যবোধের অভাব—দুয়েরই প্রতি তার ভিন্ন ধরনের আকর্ষণ এবং সে কারণে এই দুই আকর্ষণের মধ্যে কঠিন সমন্বয়-প্রয়াসের দিকটি লেখক হয়তো আরও বাস্তবধর্মী ডিটেলসে্র বিন্যাসে উপন্যাসে পরিস্ফুট করে তুলতে পারতেন। কিন্তু 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র স্রষ্টার যথার্থ অন্বিষ্ট তা' নয়। এই উপন্যাসে এ ধরনের 'বাস্তব' সমস্যার রূপায়ণ তাঁর কাম্য নয়—। 'দিবারাত্রির কাব্যে'র অব্যবহিত পরবর্তী এই উপন্যাসে সংকেতধর্মী রূপক-প্রবণতা তেমন পরিস্ফুট না হলেও, এটুকু বলা চলে যে, গাওদিয়া গ্রামের সর্বাঙ্গীণ রূপটিকে তেমন প্রখর বাস্তবতাতেও উজ্জ্বল করে তুলতে চাননি লেখক।

একথা ঠিক যে, গ্রামের সাধারণ মানুষ নিয়ে উপন্যাস রচনার প্রথম পরীক্ষা করেছেন লেখক 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় উপন্যাস ধৃত প্রায় সব চরিত্রই গ্রাম্য—স্পষ্টতই শহরের মার্জিত কেতাদুরস্ত মানুষ নয়। কিন্তু তবু মানতেই হয় যে, এ উপন্যাসে বর্ণিত গাওদিয়া গ্রাম বাংলাদেশের অতি-পরিচিত কোন গ্রামের সজীব ছবি খুব স্পষ্টভাবে পাঠকমনে জাগিয়ে তোলে না। গাওদিয়া গ্রামের প্রেক্ষাপট, গ্রামের নরনারী, তাদের জীবন নিহিত সমস্যা, নায়ক শশীর মনে জগৎ ও জীবনের নানা জিজ্ঞাসা—সবই যেন এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের অনতিস্বচ্ছ আবরণে প্রচ্ছন্ন—প্রাত্যহিক গ্রাম্য জীবনের নিতান্ত পরিচিত আলোয় অতিস্পষ্ট নয়।

শশীর মনে জীবনের এই রহস্য রূপের ধারণা এসেছে বিভিন্ন ব্যক্তির জীবন ও চরিত্র-সংক্রান্ত বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। বস্তুত সমগ্র উপন্যাসটি নায়কের ওইসব অভিজ্ঞতার এক সমবায়ী রূপ। উপন্যাসটি 'ইতিকথা' হলেও এর কোন নির্দিষ্ট অ্যারিষ্টটেলীয় পর্ব নেই। আগেই বলেছি, উপন্যাসটি কোন অখণ্ড কাহিনীতে গ্রন্থিবদ্ধ নয়। এর সব ঘটনাই

যেন শশীর চলমান জীবনের ইতস্ততঃ অভিজ্ঞতার প্রবাহ, যা তার চেতনার গভীরে বিচিত্র আলোছায়ার রহস্যরূপ রচনা করে চলেছে।

শশীর মনে জীবন সংক্রান্ত রহস্যবোধের প্রথম সূচনা উপন্যাসের একেবারে গোড়াতেই, একটি অপঘাত মৃত্যুকে আশ্রয় করে—নির্জন পরিবেশে নিঃসঙ্গ হারু ঘোষের বজ্রাঘাতে মৃত্যু—। 'খালের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া হারু ঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল। আকাশের দেবতা সেইখানে তাহার দিকে চাহিয়া কটাক্ষ করিলেন।' গ্রামীণ পটভূমিতে লেখা আবহমান বাংলা উপন্যাসের আরম্ভ-অংশের যে-পরিচিত-বাস্তবতায় আমরা সাধারণত অভ্যস্ত, তার প্রেক্ষিতে আলোচ্য উপন্যাসের সূচনা নিঃসন্দেহে অভিনব, হয়তো কিছুটা অপ্রত্যাশিতও। বর্ণনারীতিতে লেখকের নির্মোহ বাস্তব-বাদী ভঙ্গি সত্ত্বেও, 'আকাশের দেবতা'র অলক্ষ্য হাতে মানুষের অসহায় নিরুপায় মৃত্যুর ছবি পাঠক চিত্তে এক গূঢ় জীবন-রহস্যের আভাস আনে। গাওদিয়া গ্রামের 'ইতিকথা' নিশ্চয় নিছক মৃত্যুর কাহিনী নয়, সে কাহিনী জীবনেরও—জীবনের প্রতি পিপাসা ও মমতার রসে তা' উদ্বেল। কিন্তু এমন এক ইতিকথা-র গোড়াতেই এক অসহায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঠকের আকস্মিক মুখোমুখি দেখা। এই নিরুপায় মৃত্যুর ম্লান বিষণ্ণ পথ দিয়েই পাঠককে গাওদিয়ার জীবনের মধ্যে প্রবেশ করতে হয়।

নায়ক শশী পাঠকের সেই মৃত্যু অভিজ্ঞতার সঙ্গী। সে-ই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে গ্রামের দিকে। বস্তুত হারু ঘোষের মৃত্যুর পরিবেশে শশীর 'আবির্ভাব' বিশেষ অর্থবহ। শশী নায়ক বলেই যে এই আবির্ভাব অর্থবহ তা' নয়, এর মুখ্য কারণ শশী চিকিৎসক। মৃত্যুর নিষ্ঠুর গ্রাস থেকে জীবনকে ছিনিয়ে আনাই তার কাজ। কিন্তু এখানে দেখি এক বিপরীত ও মর্মান্তিক ছবি—চিকিৎসক শশী মৃতদেহ নিয়ে গ্রামে প্রবেশ করছে। উপন্যাসে শশীর প্রথম প্রবেশ এই রূপেই। এই শববাহক দলের সঙ্গী রূপে। বলা বাহুল্য, প্রথম দেখা বলেই নায়কের এই রূপ পাঠক চিত্তকে বিশেষভাবে অধিকার করে—অভিভূত করে।

উপন্যাসের আরম্ভে মৃত্যুর রহস্য-তোরণ দিয়ে নায়কের সঙ্গে পাঠক যে গ্রাম জীবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, সেই জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা নায়ক শশীর দৃষ্টির দর্পণে একে একে নানা রহস্যরূপকে উদ্ভাসিত করে তোলে। সেইসব জীবনরহস্য-চেতনার অন্যতম মুখ্য উপকরণ—মৃত্যু ও ব্যাধি।

মৃত্যুর এক রোমান্টিক সৌন্দর্য পূর্ববর্তী উপন্যাস দিবারাত্রির কাব্যের নায়ক হেরম্বের চোখে আত্মপ্রকাশ করেছিল সমুদ্র-তীরে নৃত্যপরা আনন্দের চিতায় আত্মবিসর্জনের দৃশ্যে। কিন্তু 'পুতুলনাচের ইতিকথা'-র নায়ক চিকিৎসক বলেই তার চোখে মৃত্যু রোমান্টিক নয়। নিতান্ত নিষ্ঠুর বাস্তব। কিন্তু আবার রহস্যময়ও। বিজ্ঞান মনস্ক লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন 'ল্যাবরেটরিতে এক্সপেরিমেণ্ট' করতেন তখন 'নতুন এক রহস্যময় জগতের হাজার সঙ্কেত মনের মধ্যে ঝিকমিকিয়ে' (গল্প লেখার গল্প—লেখকের কথা) যেত। তাঁর সৃষ্ট নায়ক শশীও তার বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা-বিদ্যা প্রয়োগের জগতে প্রবেশ করে অনুভব করে মৃত্যুর রহস্য রূপকে। সেই সঙ্গে মানুষের চূড়ান্ত অসহায়তা, তার সমস্ত কর্ম প্রয়াসের চরম নিষ্ফলতা ও নিরর্থকতাকে। বাসুদেব বাঁড়ুজ্জের বালক-পুত্র, বৃদ্ধ যাদব পণ্ডিত ও তাঁর সহধর্মিণী এবং যামিনী কবিরাজের স্ত্রী সেনদিদির মৃত্যু—সবই একাধারে জীবনের অন্তহীন রহস্য এবং মানুষের ব্যর্থতাবোধের নিরুপায় যন্ত্রণাকে প্রকাশ করে।

বজ্রাহত হারু ঘোষকে বাঁচানোর কোন সুযোগই চিকিৎসক শশী পায়নি, কিন্তু বাসুদেব-পুত্র ও সেনদিদিকে মৃত্যুর লুব্ধ ব্যগ্র গ্রাস থেকে বাঁচানোর জন্য যথাসাধ্য সংগ্রাম করেছে সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা পদ্ধতি সবই নিরর্থক হয়েছে। তাদের সে বাঁচাতে পারেনি। সেনদিদি সম্পর্কে 'শশীও ভাবিতে পারে নাই, এ যাত্রা সে রক্ষা পাইবে না। ডাক্তার মানুষ সে, সে-ও যেন ভালো করিয়া বুঝিতে পারিল না……। শশী জানে এরকম হয়, মানুষের দেহের মধ্যে আজও এমন কিছু ঘটিয়া চলে এ যুগের ধন্বন্তরির-ও যা থাকে জ্ঞান বুদ্ধির অগোচর।' [পরিচ্ছেদ : ১৩]

জীবন মৃত্যুর এই গূঢ় জটিল রহস্য প্রশ্নের সঙ্গে অনিবার্য রূপে জড়িত হয়ে যায় মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার অর্থশূন্য পরিণাম। শশীর সব চিকিৎসা বিদ্যাকে ব্যর্থ প্রমাণ করে বাসুদেব-পুত্র ও সেনদিদির মৃত্যু হয়। এর আগে অবশ্য সেনদিদিকে সে একবার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছিল। কিন্তু সেবারে সেই ভয়ংকর বসন্ত রোগের হাত থেকে সেনদিদি বাঁচলো বটে—কিন্তু অমন রূপবতী নারীর একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেল—তার দেহের সবটুকু রূপ-লাবণ্য ঝরে গিয়ে তাকে পরিণত করল এক কুৎসিত নারীতে। ব্যাধির সঙ্গে প্রাণপণ সংগ্রামে এ-ও শশীর এক ধরনের পরাজয় বৈকি। তার শক্তির এই অসহায় সীমাবদ্ধতা শশীর মনে তথা পাঠক চিত্তে মানব ভাগ্যের নিরর্থকতারই অস্পষ্ট ইঙ্গিত জানায়।

চিকিৎসক শশীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ফলে আরেকটি মৃত্যু-কাহিনীও নূতন এক মাত্রা ও তাৎপর্য পেয়েছে—যাদব পণ্ডিত ও তার সহধর্মিণীর মৃত্যু। বস্তুত এটি সাধারণ মৃত্যু নয়—গাওদিয়া গ্রামের প্রতিটি মানুষ জেনেছে এটি 'সিদ্ধপুরুষ' পণ্ডিত মশায়ের 'ইচ্ছামৃত্যু'। কিন্তু শশী চিকিৎসক বলেই নিশ্চিতরূপে বুঝতে পেরেছে, এটি যাদব পণ্ডিতের কোন অলৌকিক 'লীলা' নয়, এর নেপথ্যে আছে এক করুণ আত্মবঞ্চনা—জীবন পিপাসু (সাপের ভয়ে যিনি রাত্রে 'লাঠি ঠুকিয়া পথ চলেন'।) এক প্রবীণ দম্পতির পিঞ্জরাবদ্ধ প্রাণীর মতো নিরুপায় আত্মহত্যা! উপন্যাসে একমাত্র শশীই এই নেপথ্য-রহস্যের সন্ধান পেয়েছে। চিকিৎসকের এক বিশেষ সীমিত দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হবার ফলেই শশী নিশ্চিতরূপে জেনেছে 'আপিমের ক্রিয়ায় যাদবের চামড়া ঢাকিয়া চটচটে ঘাম। বিন্দুর মতো ছোট হইয়া আসা চোখের তারকা আর মুখে ফেনা উঠিবার কথা' (পরিচ্ছেদ ৮), জেনেছে সেই বিষক্রিয়ায় 'সিদ্ধ-পুরুষ' যাদব ও তাঁর সহধর্মিণীর অসহায় আত্মহননের কথা।

চিকিৎসক বলেই শশীর দৃষ্টিতে যেমন ইচ্ছা মৃত্যুর অন্তরালবর্তী সত্য সহজেই উন্মোচিত হয়েছে। তেমনি আবার এই মর্মান্তিক ঘটনায় তার স্বীয় ভূমিকার অসহায়তা ও অর্থহীনতাও তার নিজের কাছে বড়ো নির্মমভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শেষ মুহূর্ত অবধি মুমূর্ষু মানুষকে বাঁচিয়ে তোলার সংগ্রামী ভূমিকা তার—কারণ সে চিকিৎসক। কিন্তু লেখক নিপুণ কৌশলে এমন এক 'সিচুয়েশন' রচনা করেছেন, যেখানে সব জেনে শুনেও, 'ব্যাধির' পূর্ণ পরিচয় পেয়েও চিকিৎসক শশীর ভূমিকা কেবল নিষ্প্রিয় নিরুপায় দর্শকের।—

'শশী আগাগোড়া দুজনকে লক্ষ্য করিয়াছিল।······যাদবের মুখ ঢাকিয়া গিয়াছিল চটচটে ঘাম আর কালিমায়, চোখের তারা দুটি সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছিল। তিন চার হাজার ব্যগ্র উত্তেজিত লোকের মধ্যে ডাক্তার শুধু শশী একা, সে শিহরিয়া উঠিয়াছিল।' (পরিচ্ছেদ ৮) কিন্তু এর বেশী সক্রিয় ভূমিকা নেবার কোন পথ সে খুঁজে পায়নি। তাই তার দৃষ্টির সামনেই দুটি প্রাণের শিখা ধীরে ধীরে নিভে গেছে। আর সেই সঙ্গে শশীর তথা পাঠকের মনে প্রতিকূল নিষ্ঠুর এই জাগতিক পরিবেশে মানুষের কর্মপ্রয়াসের অর্থহীনতার চেতনা অন্তত পরোক্ষভাবেও আরেকবার ভেসে উঠেছে।

কিন্তু সেই সঙ্গে শশীর অন্তর্লোকে মানব মনের তথা জীবনের রহস্যময়তার

দিকটিও বিশেষ এক মাত্রা নিয়ে জেগে উঠেছে। জীবন-মৃত্যুর সন্ধি মুহূর্তে দাঁড়িয়ে-থাকা সেই বৃদ্ধ মানুষটি, যাঁর কাছে 'অপূর্ব ও লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছিল মরণ' (পরিচ্ছেদ : ৯) তাঁর মনের নাগাল পায়নি শশী। বস্তুত *'ইচ্ছামৃত্যু' নামক মহিমময় শব্দটির আত্মবঞ্চনার আড়ালে যাঁকে আত্মহত্যা* করতে হয় অনন্যোপায় হ'য়ে—সেই 'মানুষটার চরিত্রের কত আশ্চর্য দিক' (পরিচ্ছেদ : ৯) তাঁর অন্তর্লোকের গূঢ় রহস্য শশী ও সেই সঙ্গে পাঠকের জিজ্ঞাসু মনে দুরূহতম প্রশ্ন জাগিয়ে রাখে—যার আর উত্তর মেলে না।

মৃত্যুকে আশ্রয় করে এক অতল রহস্য-চেতনা যেমন শশীকে অভিভূত করেছে, তেমনি জীবিত নরনারীর দৈবসত্তা ও অন্তর্লোকের দুর্মোচ্য জটিলতাও তাকে জীবন-সম্পর্কিত গভীর রহস্য-জিজ্ঞাসায় উন্মুখ করে তুলেছে। এমনি এক জটিল মনোরহস্যের ছবি উন্মোচিত হয়েছে শশীর বোন বিন্দুর কাহিনীতে। বিন্দুর স্বামী নন্দলাল বিন্দুকে স্ত্রীর মর্যাদা দেয়নি, তাকে মত্তপ গণিকারূপে, প্রমোদের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেছে। এই অস্বাভাবিক জীবন-যাত্রা বিন্দুর চরিত্রে এনে দিল এক ভয়াবহ বিকৃতি। এই বিকৃতি এমনি যে, শান্ত সুস্থ পারিবারিক জীবন তার কাছে নিতান্ত স্বাদহীন এক বিবর্ণ বস্তু।

এইসব ঘটনার মধ্যে বিন্দুর মনোলোকের যে রহস্যের আভাস ফুটেছে, তা শশী উন্মোচন করতে পারেনি। যে-বিন্দু তার স্বামীর কাছ থেকে পেয়েছে শুধু নিদারুণ অসম্মান আর লাঞ্ছনা—আর সেই বিকৃত ঘৃণ্য সুরাসক্তি, সেই বিন্দু তার মদের তৃষ্ণা মেটাবার জন্য শশীর আলমারি থেকে চুরি করে মদের বোতল। পরে শশী যখন ঘটনাটি জানল, তখন কিন্তু আরেক রহস্যবোধে তার মন আচ্ছন্ন হল, 'সে (শশী) ভাবিতেছিল, তার আলমারিতে বোতলের পাশে লেবেল-আঁটা বিষের শিশি ছিল, বিন্দু কেন সেদিন বিষ খাইল না?'—জীবন যার চরম ব্যর্থতা আর বঞ্চনায়-ভরা, তার-ও সত্তায় নিহিত দুর্মর জীবনতৃষ্ণার এই অপ্রত্যাশিত উপলব্ধি শশীর ও সেই সঙ্গে পাঠকের চিত্তকে স্তম্ভিত করে।

বিন্দুর অনুষঙ্গে মনে আসে মতির কথা। গ্রাম-ছেড়ে-শহরে-আসা এই দুটি মেয়ের মধ্যে দু' একটি দিক থেকে হয়তো মিল আছে, কিন্তু তফাৎটাই বেশী চোখে পড়ে যেন। অন্তত শশীর চোখে পড়েছিল। সেকথা পরে

বলছি। তার আগে মতি-কুমুদের প্রসঙ্গে কিছু বলা যেতে পারে। বস্তুত মতি-কুমুদের গল্পই উপন্যাসের একমাত্র আখ্যান, যা মুখ্যত শশীর দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত নয়—। আর সেই অর্থে অর্থাৎ নায়কের অভিজ্ঞতায় বহির্ভূত বলে এটিকে উপন্যাসের মূল ভূখণ্ডেরও বহির্ভূত বলা চলে—এটিকে নিছক একটি গৌণ উপাখ্যান বলেও গণ্য করা যায়। শুধু তাই নয়, মতি-কুমুদের কাহিনীর শেষে আছে যে, গৃহবিমুখ যাযাবর স্বামীর সঙ্গে মতি এলোমেলো পথের জীবনকে বরণ করে নিল। লেখক মন্তব্য করেছেন, 'হয়তো একদিন ওদের প্রেম নীড়ের আশ্রয় খুঁজিবে, হয়তো একদিন ওদের শিশুর প্রয়োজনে নীড় না বাঁধিয়া ওদের চলিবে না।······আর সেকথা কিছুই বলা যায় না। পুতুলনাচের ইতিকথায় সে কাহিনী প্রক্ষিপ্ত' (পরিচ্ছেদ : ১১)।

এখন প্রশ্ন, মতি-কুমুদের যে সম্ভাব্য কাহিনী লেখক অকথিত রেখেছেন, তা নিশ্চয় এই 'ইতিকথা'য় প্রক্ষিপ্ত, কিন্তু তাদের যে-সুদীর্ঘ-আখ্যান এই গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে, তা কি যথার্থই প্রাসঙ্গিক বা অপরিহার্য ?

একথা ঠিকই যে, কেন্দ্রীয় চরিত্রের দৃষ্টিকোণ যেখানে সারা উপন্যাস জুড়ে ব্যবহৃত,—তার অভিজ্ঞতা, জীবন-ভাবনা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও বিচিত্র অনুভবের ঢেউয়ে ঢেউয়ে যেখানে মুখ্যত পাঠক চিত্ত আন্দোলিত, সেখানে মতির মতো একটি নগণ্য অপরিণতবুদ্ধি মেয়ের দৃষ্টিকোণ প্রয়োগের প্রাসঙ্গিকতা কতখানি ? আর এই প্রশ্নের জবাবে একটিমাত্র কথাই বিশেষভাবে মনে আসে। তা হল উপন্যাসটির সামগ্রিক আবেদন।

আমাদের আলোচনার ঠিক এই পর্যায়ে অবশ্য উপন্যাসটির সামগ্রিক আবেদন নিয়ে কোন সিদ্ধান্ত করা চলে না, তবু বলতে পারি যে, উপন্যাসটির আবেদন যেখানে সামগ্রিক সেখানে কিন্তু কোন বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা জীবনের উপলব্ধি লেখকের অভিষ্ট নয়। উদ্দেশ্য হল, ছোট-বড় সব কাহিনী, সব অভিজ্ঞতা, সকল দৃষ্টিকোণের সমবায়ে জীবনের এক সামগ্রিক রূপের অন্বেষণ। মতি-কুমুদের এই 'এপিসোড' লেখকের সেই অন্বেষণের দিক থেকে নিঃসংশয়ে তাৎপর্যপূর্ণ।

'এপিসোড'টি লেখকের জীবন দৃষ্টির বৃত্তকে পূর্ণতা দিয়েছে। শশীর দৃষ্টিকোণে বিধৃত মৃত্যু ও বিকৃতিকে আশ্রয় করে যেসব নেতিবাচক অভিজ্ঞতার কথা এতক্ষণ বলেছি (এ ছাড়াও আছে কুমুদের কাহিনী—সে

কথা যথাস্থানে বলা হবে।), তাদের সমান্তরাল একমাত্র অস্তিবাচক আখ্যান হিসাবে লেখক উপস্থাপিত করেছেন এই মতি-কুমুদের গল্পকে, যাদের দাম্পত্য জীবনের কোন বৈষয়িক ভিত্তিভূমি নেই, কোন নিশ্চিত আর্থিক সংগতি নেই, কোন নির্দিষ্ট 'নীড়' নেই—ওদের জীবন ভবঘুরে, বাউণ্ডুলে, 'বোহেমীয়'। কিন্তু ওদের এতসব শূন্যতা পূর্ণতা পেয়েছে একটিমাত্র প্রগাঢ় অনুভবের অলৌকিক স্পর্শে—তার নাম প্রেম। পরস্পরের প্রতি দুজনের এই অকুণ্ঠ নিঃসংশয় প্রেম ওদের যাযাবর জীবনের মধ্যেও এক আশ্চর্য 'বন্ধনহীন গ্রন্থি' রচনা করে, যার অচ্ছেদ্যতা সকল সংশয়ের উর্ধ্বে। বস্তুত শিশিদম্পতি জয়া-বনবিহারীর প্রেমহীন অসুখী দাম্পত্য সম্পর্কের বিপ্রতীপতায় লেখক এদের সম্পর্ককে আরও সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। তাছাড়া, এই আখ্যানের শেষদিকে শশী যখন এদের দেখা পেয়েছে, তখন সে-ও মতি-কুমুদের ছন্নছাড়া জীবনে প্রেমের অমেয় ঐশ্বর্য দেখে স্তম্ভিত হয়েছে। আর সেই মুহূর্তে তার মনে হয়েছিল বিন্দুর কথা: 'বিন্দুরও পরিবর্তন হইয়াছিল, এও পরিবর্তন'—[পরিচ্ছেদ : ১১]। গ্রাম থেকে শহরে-আসা দুটি নরনারীর—প্রেম-বঞ্চিতা বিন্দুরও প্রেমিকা মতির জীবন পরিণামের তুলনা করে শশীর সঙ্গে সঙ্গে পাঠকেরও বিস্ময়-বিহ্বলতার অন্ত থাকে না। কেবল মতির সঙ্গে বিন্দুর নয়, প্রসঙ্গত এই গৌণ আখ্যানের নায়ক কুমুদের সঙ্গে শশীর তুলনাও সহজেই মনে আসে যেন।

শশীর একদা-অন্তরঙ্গ সুহৃৎ কুমুদ কিন্তু শশীর সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবের মানুষ। বস্তুত এই দুই বন্ধু চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক সমকালীন মধ্যবিত্ত যুব চেতনার দুটি প্রধান রূপ প্রকাশ করেছেন। একটি দুরন্ত বলিষ্ঠ বোহেমীয় প্রকৃতি, কুমুদ যার প্রতিমূর্তি—লেখকের ভাষায়, 'খেয়ালী উচ্ছৃঙ্খল যাযাবর কুমুদ······সে ভাবে না, কাঁদে না, দুঃখ দুর্দশাকে গ্রাহ্য করে না' [পরিচ্ছেদ : ১২]। এ ধরনের চরিত্রের পূর্বাভাষ পেয়েছি পূর্বতন কল্লোলপন্থী কোন কোন লেখকের রচনায়। অবশ্য অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে' বা প্রবোধ-কুমারের 'যাযাবর'-এর নায়কের তুলনায় কুমুদের ছবি অনেক সহজ ঋজু ও বর্ণবাহুল্য বর্জিত। পূর্বসূরীদের তুলনায় কুমুদের স্রষ্টা অনেক বেশি বাস্তব-নিষ্ঠ, নিরুচ্ছ্বাস।

শশী-চরিত্রে সমকালীন যুবমানসের আরেক্ দিক্। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের দ্বন্দ্ব-সংশয়ে দ্বিধান্বিত যন্ত্রণাবিদ্ধ এক অসুখী আত্মজিজ্ঞাসু সত্তা এই

শশী। আপন অন্তর্মুখী জীবনের চারপাশে তার উর্ননাভের মতো অজস্র ভাবনা ও অনুভূতির দুশ্ছেদ্য জাল, যা শশীকে দুরন্ত বলিষ্ঠ খেয়ালী যাযাবর হতে পদে পদে বাধা দেয়, যা তাকে শেষ পর্যন্ত গ্রামীণ জীবনের শিকড়ের সঙ্গে চূড়ান্তভাবে জড়িয়ে ফেলে, দূরের আকাশের দিকে ডানা মেলতে চেয়েও সে পারে না।

শশীর মনের এই আধুনিক-যুগসম্ভব দ্বিধা-দীর্ণ রূপ বিশেষভাবে ফুটেছে দুটি ব্যক্তির সংস্পর্শে—এদের সঙ্গে তার পারস্পরিক ব্যক্তিগত গূঢ় সম্পর্কের মাধ্যমে। বস্তুত এদের দুজনের সঙ্গেই শশীর যে বাইরের সম্বন্ধ, তার আড়ালে যে প্রচ্ছন্ন অনতিব্যক্ত সম্পর্ক, তার মধ্য দিয়েই ব্যঞ্জিত হয়েছে মানবিক সম্পর্কের একান্ত জটিল রহস্যময় রূপ।

এই দুই ব্যক্তির একজন শশীর পিতা, অন্যজন কুসুম। বলতে পারি উপন্যাসে এদের দুজনের ভূমিকাগত সার্থকতা এদের নিজেদের আত্মপ্রকাশের রূপায়ণে ততখানি নয়, যতটা এদের প্রতি শশীর মনোভাবের মধ্য দিয়ে শশীর নিজেকে খোঁজার, নিজেকে বোঝার প্রচেষ্টায়।

উপন্যাসে শশীর সঙ্গে তার পিতা গোপালের সম্পর্ক প্রায় আগাগোড়াই বিরোধ-সংঘাতের। একথা সত্য যে, এই বিরোধের মূলে আছে কিছুটা age ও youth এর চিরায়ত দ্বন্দ্ব কিংবা বিষয়াসক্ত লোভী গ্রাম্য মহাজন পিতার সঙ্গে আধুনিক প্রগতিশীল জীবন ভাবনার-অনুসারী পুত্রের মনের গরমিল, কিংবা বলতে পারি, পিতার জীবন দৃষ্টির বিরুদ্ধে পুরোপুরি রুখে দাঁড়াতে না পারার জন্য একধরনের দ্বিধা ও যন্ত্রণামিশ্রিত বিক্ষোভ। বিন্দুকে জোর করে নন্দলালের আশ্রয় থেকে গাওদিয়ায় নিয়ে-আসা ও তার পরবর্তী ঘটনা কিংবা যাদবের উইল-করা সম্পত্তি নিয়ে পিতাপুত্রের মতভেদ ও মনোমালিন্য এর নিদর্শন। কিন্তু এর চেয়েও গূঢ়তর এক সংকটময় দ্বন্দ্ব-জটিল সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল শশী ও তার পিতার মধ্যে। সেই জটিল সম্পর্কের মূলে আছে দুর্বলচরিত্র গোপালের নীতিভ্রষ্টতার নিগূঢ় প্রশ্ন—যামিনী কবিরাজের স্ত্রী সেনদিদির প্রতি গোপালের গোপন লুব্ধতা, সেই বিধবা রূপহীনা সেনদিদির অবৈধ সন্তানের জনক হওয়া, সন্তান প্রসবকালে মুমূর্ষু সেনদিদিকে বাঁচানোর জন্য গভীর রাত্রে শশীর কাছে গোপালের অস্বাভাবিক ব্যাকুলতা-প্রকাশ এবং সেনদিদির মাতৃহীন পুত্রকে লালনের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেওয়া—পিতার নৈতিক সত্তার ক্রমিক অবক্ষয়ের পরিচয়বাহী

এইসব বিভিন্ন ঘটনা পুত্র শশীর মনে প্রচণ্ড মর্মদাহী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। পিতার যৌন চেতনায় এই গোপন বিকৃতিকে শশী কিছুতেই সহজ মনে স্বীকার করতে পারে না। তার গূঢ় সত্তা প্রতিবাদের প্রবল ইচ্ছায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে—চিকিৎসক হওয়া সত্ত্বেও গভীর রাত্রে আসন্নপ্রসবা সেনদিদিকে বাঁচাতে যাওয়ার প্রবল অনাগ্রহ প্রকাশে সেই প্রতিবাদের ইচ্ছাই নিশ্চিত-ভাবে ব্যক্ত হয়। কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত যে শশীকে ওই রাত্রে সেনদিদির বাড়ী যেতে হয়, এর কারণ কেবল চিকিৎসকের দায়িত্ব বোধই নয়, এর প্রধান কারণ দ্বিধা—পিতা সম্পর্কে হৃদয়বান্ মমতাসম্পন্ন পুত্রের মনের প্রবল দ্বিধা ও দুর্বলতা। অন্যদিকে, শশী আবার এও বোঝে, তার প্রতি গোপালের অপরিমেয় স্নেহ-দুর্বলতা আছে বলেই, গোপালের মনে অপরাধবোধের সীমা নেই—পুত্রের প্রতি 'উন্মাদ বাৎসল্যে'র জন্যই পিতার মনে 'পাপ' চেতনা সারাক্ষণ ধিকধিক জ্বলে। নচেৎ গোপালের মতো ধনী সমাজপতি স্থানীয় শক্তিমান্ মানুষের পক্ষে এ ধরনের 'পাপ' কর্ম আদৌ কোন সমস্যাই নয়। আর এই 'পাপ'চেতনায় আক্রান্ত গোপাল যখন শশীর মনের জগৎ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তখন নিরুপায় হয়ে তাকে সঞ্চিত বিপুল অর্থ সম্পদের আকর্ষণ চিরদিনের জন্য ত্যাগ করে অকস্মাৎ চলে যেতে হল দূরদেশে—কেবল বিচ্ছিন্নতাকামী প্রিয় সন্তানকে তার গৃহজীবনের স্থায়ী উত্তরাধিকার দিয়ে যাবার জন্যই। পিতা-পুত্রের এই প্রচ্ছন্ন-জটিল সম্পর্ক ও উপন্যাসের শেষে সেই সম্পর্কের অপ্রত্যাশিত পরিণতি,—দুই-ই জীবনের গূঢ় রহস্যময়তার ইঙ্গিত করে।

শশীর দ্বিধান্বিত সত্তার জটিলতম রহস্যরূপ উন্মোচিত হয়েছে কুসুমের সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। লেখক কুসুমকে তার বাস্তব প্রতিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করেননি ঠিকই—সে তার ঈর্ষা কলহ-পরায়ণতা মুখরাস্বভাব সবকিছু নিয়েই গ্রাম্য মেয়ের প্রত্যক্ষ সজীবতায় ফুটে উঠেছে—তবু বলা বাহুল্য শশীর, সেই সঙ্গে পাঠকের মনেও, কুসুম অতিরিক্ত এক মাত্রা যোজনা করেছে। শশীর দৃষ্টিকোণ যেখানে নেই, সেখানে [দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের গোড়ায়] কুসুমের ছবি নিতান্তই সাধারণ মোটা তুলিতে আঁকা—সেখানে সে গ্রাম বাংলার পরিচিত চাষীঘরের বউ। কিন্তু শশীর চোখে, তার দৃষ্টি-কোণের বিশেষ ভঙ্গিমায় কুসুম একেবারে আলাদা সত্তা। এই সুন্দরী যুবতী পরস্ত্রী এক রোমান্টিক রহস্যময়তার আলোছায়া ছড়িয়ে রেখেছে নায়ক শশীর মনের আকাশে।

শশী-কুসুমের সম্বন্ধ অবৈধ প্রণয়-সম্পর্ক সন্দেহ নেই, তাই একে ঘিরে স্বভাবতই কিছু গোপনতার স্বাদ-সৌরভ সঞ্চারিত হয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, এই নিয়ে তেমন কোন সামাজিক শাসন বা দুর্নাম এমন কি কানাকানির কথা শোনা যায় না গাওদিয়া গ্রামে। আসলে শশী-কুসুমের যে আকর্ষণ, তার সবটুকুই তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবটাই ঘটেছে তাদের দুজনের মনের নিভৃতে, বাইরের সমাজে নয়। 'পুতুলনাচের ইতিকথা' পল্লী-পরিবেশের গল্প বটে, কিন্তু কখনই পল্লী-'সমাজে'র নয়। আর তাই এই গল্পে অবৈধ প্রণয়ের যা কিছু তাৎপর্য, তা বাইরের সমাজ আশ্রিত নয়—তা একান্তভাবে দুজনের। বিশেষভাবে, শশীর নিগূঢ় চেতনার সঙ্গেই তা অচ্ছেদ্য সূত্রে জড়িত।

বস্তুত উপন্যাসে কুসুমের দিক্ থেকে প্রণয়-ব্যাকুলতার যে-তীব্রতা ব্যক্ত বা আভাসিত হয়েছে, শশীর দিক্ থেকে আদৌ তেমন হয়নি। সে তার শিক্ষা-সংস্কৃতি, সামাজিক মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের অনিবার্য দূরত্ব নিয়ে কখনোই কুসুমের পরোক্ষ প্রণয়-নিবেদনে সাড়া দেয়নি, আপন হৃদয়ের নিভৃত জগতে কোনদিন আহ্বান করেনি, কেবল 'মৃদু স্নেহসিঞ্চিত অবজ্ঞায় সাত বছর (তার) পাগলামিকে সে প্রশ্রয়' দিয়েছিল মাত্র। অথচ সত্তার গভীরে কুসুমের প্রতি তার যে এক ধরনের দুর্মর আসক্তি ছিল, ছিল আকণ্ঠ পিপাসা —সে বিষয়ে শশী আদৌ অসচেতন নয়। শহরে যাওয়ার জন্য তার মনে যে সুতীব্র আগ্রহ, তা যে দীর্ঘদিনের মধ্যেও বাস্তব রূপ নিতে পারেনি, সে কেবল কুসুমের প্রতি এক ধরনের অনতিস্ফুট অথচ দুর্নিবার আকর্ষণের জন্যই। শশী স্পষ্টতই অনুভব করেছে যে তার 'এই গ্রাম ছাড়িয়া কোথাও যাইবার শক্তি নাই। নিঃসন্দেহে এজন্য দায়ী কুসুম। শশীর কল্পনার উৎস সে যেন চিরতরে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে' [পরিচ্ছেদ : ৬]। কুসুমকে ঘিরে শশীর মনে আসক্তির যে গূঢ় স্রোত, তাতে দেহ চেতনার ঢেউ জাগলেও, কুসুমের 'মনে'র অতল রহস্যই শশীকে বেশি আকর্ষণ করে—'শরীর! শরীর! তোমার মন নাই কুসুম?' শরীর ও মন, যৌনচেতনা ও রোম্যান্টিক অনুভব, 'অবৈধ' বাসনা ও বিবেকবোধ—নানা বিরুদ্ধ স্রোতের ঘূর্ণাবর্তে শশীর দ্বিধান্বিত মন উপন্যাসের জগতে দিশেহারা হয়ে ঘুরেছে।

দ্বিধা-সংকোচ কুসুমের মনেও ছিল। সেও জানতো এই আসক্তি অবৈধ, পরকীয়া। মনের এই আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিপরীত প্রবণতার মধ্যে

সুষ্ঠু সামঞ্জস্য আনতে পারেনি বলেই কুসুমের কথায় আচরণে আগাগোড়া ফুটে উঠেছে যে এলোমেলো খামখেয়াল ও পাগলামির ভাব. তা শশীর চোখ এড়ায়নি : 'কত বছর আজ সে কুসুমের পাগলামি দেখিতেছে।' তাই কুসুম শশীর চোখে কখনো 'সরলা বালিকা'—'মতির চেয়েও সরল, মতির চেয়েও নির্বোধ', আবার কখনো রহস্যময়ী, পরিণতবুদ্ধি, কখনো ঈর্ষার গূঢ় জ্বালায় তিক্ত, কখনো বা 'কুটিলা কৌশলী' নারী—যে 'নিখুঁত কৌশলে মতির বিবাহ সম্বন্ধে (শশীর) মনের মোড় ঘুরাইয়া' দেয়। কিন্তু বিচিত্র-রূপিণী নারীর এই সামঞ্জস্যহীন খাপছাড়া প্রকৃতির নেপথ্য উৎস মূলে আছে শশীর জন্য উদ্দাম দুর্দম প্রেম—'উন্মাদ ভালোবাসা'। দেহ পিপাসার উজ্জ্বল শিখায় এই প্রেম খরদীপ্তিতে জ্বলে উঠেছে, যার রহস্যের তল পায় না কুসুম নিজেও : 'আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু?'

কিন্তু এমন যে 'উন্মাদ ভালোবাসা' কুসুমের, তাও একদিন নির্জীব স্তিমিত হয়ে এল শশীর কাছ থেকে প্রত্যাশিত সাড়া না পেয়ে। শবরীর প্রতীক্ষা অন্তহীন হতে পারে, কিন্তু কুসুম শবরী নয়। সে-ত' অনন্তকাল পথ চেয়ে থাকতে পারে না। তাই একদিন গাওদিয়ার জীবনকে চিরকালের জন্য পিছনে ফেলে পিতৃগৃহের দিকে যাত্রা করল। শশীর সেই-মুহূর্তের ব্যাকুল আহ্বানের উত্তরে সে বলেছিল :

'লাল টকটকে করে তাতানো লোহা ফেলে রাখলে তাও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, যায় না?……কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে' (পরিচ্ছেদ : ১৩)। এর আগে ও পরে চিকিৎসক শশী যে সব মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে, সে সব তার সত্তাকে বিষণ্ণ ও জিজ্ঞাসু করেছে, কিন্তু বিচূর্ণ করেনি। কুসুমের এই আত্মিক মৃত্যু কিন্তু শশীর অন্তর্জীবনকে একেবারে বিপর্যস্ত করে দিল যেন—'এত বড় বড় কল্পনা শশীর, এত বিরাট ও ব্যাপক সব মনোবাসনা, একদিনে সব যেন পৃথক অনাবশ্যক হইয়া গেল'। বেঁচে থেকেও একটি ব্যক্তিসত্তার আত্মিক মৃত্যুর এই অসহায় করুণ রূপ জীবনের গূঢ় রহস্য চেতনায় আক্রান্ত করে শশীর মনকে—সেই সঙ্গে সমগ্র পাঠক চিত্তকেও।

উপন্যাসের মধ্যে এইভাবেই বারে বারে চিকিৎসক শশী, গোপালের পুত্র শশী, বিন্দুর অগ্রজ শশী, কুসুমের প্রেমাস্পদ শশী—নায়ক শশীর এমনি নানাসত্তার

দৃষ্টির দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়েছে জীবনের জটিল-গভীর রহস্য-রূপ। আর এই রহস্য উপলব্ধির দীর্ঘপথ-পরিক্রমার মধ্য দিয়েই নায়কের জীবন-ভাবনা ক্রমেই পরিণতি লাভ করেছে।

কিন্তু এ তো গেল একদিকের কথা। অন্যদিকে, সারা জীবনে শশীর অর্জিত বিচিত্র অভিজ্ঞতার জট তার মনে আরেক ধরনের চেতনার গ্রন্থিলতা এনে দিয়েছে। সেই চেতনা নেতিবাচক। যাদব পণ্ডিত ও সেনদিদিকে বাঁচাতে না-পারা, বিন্দুর জীবন-পরিণাম, পিতা গোপালের সঙ্গে একধরনের নেতিবাচক সম্পর্ক, গ্রাম ছেড়ে শহরে যেতে না পারার এবং সর্বোপরি কুসুমের অপ্রত্যাশিত চলে যাওয়া—এই ধরনের ছোট বড় অনেক প্রত্যাশা প্রচেষ্টার পরিণামী ব্যর্থতা নিষ্ফলতা শশীর জীবন-ভাবনাকে এলোমেলো করে দিয়েছে। সব কিছুই যেন পরিণামে অর্থহীন, বিশৃঙ্খল, খাপছাড়া। তাই বাইরে থেকে তাকে যতই কৃতী আত্মপ্রতিষ্ঠ মনে হ'ক না, সত্তার গভীরে সে অনিকেত, বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ। অস্তিত্বের এক নিদারুণ সংকট তথা নিরর্থকতার চেতনায় তার সত্তার বিমূঢ়তা মর্মান্তিক। জীবনের এক আত্যন্তিক ব্যর্থতার মুহূর্তে বিষণ্ণ শশীর উপলব্ধি : 'যে বিষয়ে সে দায়িত্ব গ্রহণ করে তাই ভেস্তাইয়া যায়। একটা অদৃশ্য শক্তি যেন অহরহ তার বিরুদ্ধে কাজ করিতেছে' (পরিচ্ছেদ : ৭)।

এই 'অদৃশ্য দুর্বার শক্তির' স্বরূপ সম্পর্কে লেখক কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত দেননি, তবে এটা ঠিক যে, এই রহস্যময় শক্তিই 'পুতুলনাচের দক্ষ কারিগর' পুতুলের অনুষঙ্গ উপন্যাসের নানা পর্যায়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দেখা দিয়েছে। বস্তুত সমগ্র উপন্যাসটির যদি কোন 'কেন্দ্রীয় চিত্রকল্প' থাকে তবে তা এই পুতুলের—পুতুল নাচের। এই চিত্রকল্পের পৌনঃপুনিক উপস্থাপনার মুখ্য অভিপ্রায় বলাবাহুল্য প্রায় বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমবায়ে-গড়া এই উপন্যাসের মূল ভাব-সূত্রটির ইঙ্গিত করা।

উপন্যাসের আরম্ভে গ্রামে প্রবেশ করার মুখে বকুলগাছের নীচে শশীর চোখে পড়ে একটি পুতুল। এছাড়া, শশীর ছোট বোন সিন্ধুর পুতুলখেলার প্রসঙ্গ কাহিনীর মধ্যে একাধিকবার এসেছে। সিন্ধুর পুতুল খেলা শশী 'অস্বাভাবিক মনোযোগের সঙ্গে' লক্ষ্য করে। শশী যখন বোনকে জিজ্ঞাসা করে বড় হয়ে সে কী করবে, তার জবাবে সিন্ধু বলে 'পুতুল খেলব'; এবং 'এই একটিমাত্র জবাবে ক্ষণেকের জন্য শশীর মন যেন একেবারে হালকা হইয়া

'খাব।' -এর অব্যবহিত আগেই কিন্তু শশীর মন ব্যক্তিগত জীবনের কয়েকটি কঠিন সমস্যায় ভারাক্রান্ত ছিল। পরমুহূর্তে সবকিছুকেই তার মনে হয় বুঝি পুতুল খেলার মতোই পরিণামহীন লঘু ও নিরর্থক।

শুধু সিন্ধুর 'পুতুল নিয়ে' খেলার ব্যঞ্জনা নয়, নিজেরাই যে নাচের পুতুলের মতোই অসহায় নিরুপায় আচরণ করি—জীবনের এই রূপকধর্মী ব্যঞ্জনাও শশীর অনুভবে ক্রমে স্পষ্ট হয়েছে। কুসুমের বাবা অনন্তের বিষণ্ণ উক্তিতে তার পরিস্ফুট প্রকাশ: 'সংসারে মানুষ চায় এক, হয় আর, চিরকাল এমনি দেখে আসছি ডাক্তারবাবু। পুতুল বই তো নই আমরা, একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন' (পরিচ্ছেদ: ১২)।

শশীর নিজের প্রতীতি—'একটা অদৃশ্য দুর্বার শক্তি যেন অহরহ তার বিরুদ্ধে কাজ করিতেছে' এবং অনন্তের উক্তি—'সংসারে মানুষ চায় এক, হয় আর'—এই দুটি গূঢ় অর্থবহ মন্তব্য বোধহয় ঠিক সাধারণ অদৃষ্টবাদের ইঙ্গিত করে না। 'পুতুলনাচের' এই 'ইতিকথা'র মূল কাহিনী ধারায় (মতি-কুমুদের আখ্যান ব্যতীত) সুখের ছবি, আনন্দের আখ্যান বস্তুত একেবারেই নেই। সব ছবিই যেন ব্যর্থতা নিষ্ফলতা হতাশার রঙে রাঙানো। সংসারে অদৃষ্টের লীলায় দুঃখের পাশাপাশি সুখের আনন্দের ঢেউও উচ্ছল হয়ে ওঠে। এই উপন্যাসে কিন্তু সবই তার বিপরীতধর্মী। সবই যেন অস্তিত্বের বিপন্নতার, তার নিষ্ফলতার ছবি। এ আখ্যান যেন প্রতিকূল বিশ্বে যে-ব্যক্তিমানুষ অনিকেত 'আউটসাইডার', তার সমস্ত উদ্যম-উদ্যোগের নিরর্থকতার করুণ এক লীলারূপ—স্বাধীন-সঞ্চরণ-ক্ষমতা-বর্জিত, জাগতিক ক্রিয়াকাণ্ডের উপর নিয়ন্ত্রণশক্তিহীন পুতুলদের 'নাচের' এক নির্মম পালাকাহিনী।

কুসুমের গাওদিয়া ছেড়ে চলে যাওয়া ও সেনদিদির মৃত্যুর পর ব্যর্থতা বোধ ও বিষণ্ণতার ভারে 'নিস্তেজ' শশী মনে মনে সংকল্প করেছে: 'এবার কিছু করিতে হইবে তাহাকে, আর চুপ করিয়া থাকা নয়। আর গরমিল চলিবে না'। কিন্তু আধুনিক ব্যক্তিমানুষ তার বুদ্ধি মনন দিয়ে নিজের সীমাবদ্ধতার স্বরূপ অনেকটাই হয়তো বোঝে, বোঝে তার 'পুতুল'সত্তাকে, তাকে সে অতিক্রম করতে চায় আপন সক্রিয় কর্মোদ্যোগের দ্বারা—কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেরই মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়, নিজেরই আত্মখণ্ডিত সত্তা সেই প্রয়াসকে নিষ্ফলতার দিকে ঠেলে দেয়। অন্তত শশীর মতো আধুনিককালের

এক প্রবল দ্বিধান্বিত আত্মখণ্ডিত ব্যক্তিসত্তার জীবন পরিণামের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে।

একালের জীবন-ভাবনার এইসব নানা প্রবণতা 'পুতুলনাচের ইতিকথা'-কে আধুনিক উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত করে তুলেছে নিশ্চয়, কিন্তু সেইসঙ্গে বর্তমান প্রবন্ধের সূচনায় উল্লিখিত মন্তব্যটিও মনে রাখতে হবে যে, উপন্যাসটি তার পরিণামী সংবেদনে আধুনিক অনাধুনিকের সীমা অতিক্রম করে চিরায়ত জীবনবোধের দিকে ইঙ্গিত করেছে। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র লেখক হিসাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যথার্থ মহিমা ফুটেছে একাধারে আধুনিক যুগ ভাবনাধর্মী অস্তিত্বের নিরর্থকতা তথা ব্যক্তিমানুষের বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতার চেতনা এবং জীবন-মৃত্যু-লীলার অন্তহীন রূপের সুগভীর রহস্য-উপলব্ধি—এই দুয়ের সমন্বয়ী সৃষ্টি কল্পনার মধ্যে। আর এখানেই এই শিল্পসৃষ্টির আবেদনের চিরন্তনতা।

উপন্যাসের অন্তত একটি স্থলে এই দুয়ের সমন্বিত রূপের এক আশ্চর্য মিলিত প্রকাশ চোখে পড়ে। সেখানে একই সঙ্গে নগণ্যতা ও নিঃসঙ্গতা এবং অলৌকিক সৌন্দর্য ও বিস্ময়বোধ নায়ক শশীর চিত্তদর্পণে মুহূর্তের জন্য প্রতিফলিত হয়ে তাকে স্তম্ভিত করেছে। শশীর এই অসামান্য অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদের একেবারে শেষে। সূর্যাস্ত দেখার লোভে একদিন শশী হারুঘোষের বাড়ির অদূরে তালবনের ধারে মাটির টিলায় উঠেছিল—'কিন্তু সূর্য ডুবিবার আগে শশী ভীত হইয়া পড়িল।...শশীর সর্বাঙ্গ শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, কয়েক মিনিটের ভবিষ্যৎও তাহার আর অবশিষ্ট নাই, সে এমনি অসহায়, এমনি ভঙ্গুর। পৃথিবীর বহু উর্ধ্বে, স্তরে স্তরে সাজানো ভয়ের তলে প্রোথিত পৃথিবীর বহু উর্ধ্বে, একটা জঙ্গলাকীর্ণ মাটির টিলার নীচে শশী হারাইয়া গিয়াছে। সামনে রূপ-ধরা অনন্ত। সীমাহীন ধারণাতীত কী যে তাহার চারিদিকে ঘনীভূত হইয়া সীমাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে শশী জানে না।'

শশীর এই অনন্য অভিজ্ঞতার সামগ্রিক আবেদনে বৃহৎ এক 'ল্যাণ্ডস্কেপে'র প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির 'অসহায়তা'-'ভঙ্গুরতা'-বোধের সঙ্গে epiphany-ধরনের অলৌকিক এক রহস্যচেতনার অপরূপ সমন্বয় যেন ব্যঞ্জিত হয়েছে।

উপন্যাসের একেবারে শেষে দেখি—জীবনের অভিজ্ঞতা ও বোধের দ্বারা পরিণত অথচ বিষণ্ণ শশী অনুভব করে দৈহিক ও আত্মিক মৃত্যুর স্মৃতি ও

চেতনা দিয়ে ঘেরা জীবনের মর্মস্পর্শী রূপ। পথ চলতে তার চোখে পড়ে, খালের ধারে সেই বজ্রাহত বটগাছ, বিন্দুর ভঙ্গুর জীবনের মতো নন্দলালের ভগ্নপ্রায় পাট-জমা-করা শূন্য চালা, যাদব পণ্ডিতের জীর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ গৃহ, কুসুমের শূন্য বাড়ী আর তার ওপাশে তার 'মৃত' প্রেমের স্মৃতিবহ পরিত্যক্ত তালবন। আর এইসব কিছুই যেন শশীর মনে বয়ে আনে অস্তিত্বের চূড়ান্ত নিষ্ফলতা ও শূন্যতার সংকেত।

কিন্তু উপন্যাসের সবশেষের যে আবেদন, তা ঠিক এই সুরে নয়, মৃত্যুর এই গতিহীন অলৌকিক স্তব্ধতায় নয়। পক্ষান্তরে, শশীর মনে সেখানে জেগে উঠেছে অন্য এক চেতনা—অন্য এক অন্বেষণ। সেই অন্বেষণ মানুষের জন্য : 'শশীর চোখ খুঁজিয়া বেড়ায় মানুষ। যারা আছে তাদের, আর যারা ছিল'। 'শশীর অন্বিষ্ট 'মানুষ' কোন অনন্যসাধারণ ব্যক্তি বা জনসমষ্টি নয়। শশীর অভিজ্ঞতায় আবহমান এক প্রবাহরূপে ধরা দিয়েছে এই মানুষ, যে-মানুষের ধারা সময়ের স্রোতের সঙ্গে চলমান, যা অনিঃশেষ, যার সংবেদন অন্তহীন 'ইতিকথা'-র মতোই চিরায়ত।

বস্তুত 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র শেষে মানুষ সম্পর্কে উপন্যাসের নায়কের এই আগ্রহ ও আস্থার সুরই পুষ্ট প্রসারিত ও প্রবাহিত হয়ে মিশে গেছে লেখকের উত্তরকালের উপন্যাসের ঐকান্তিক মানব প্রত্যয়ের বৃহত্তর সমুদ্র-চেতনায়।

পদ্মানদীর মাঝি

অরুণ বসু

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছুকাল আগে, ১৯৩৬-এ, সর্বভারতীয় বামপন্থী মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী কবিসাহিত্যিকরা প্রগতি লেখক সঙ্ঘ গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৩৮ সালে তার কলকাতা অধিবেশনে সর্বভারতীয় লেখকদের সঙ্গে বাঙালি লেখকরাও মোটামুটি যুক্ত হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথও একটি ভাষণ পাঠিয়েছিলেন। ১৯৪২ সালে এরই বঙ্গীয় শাখা-রূপে জন্ম নিল ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ। কিন্তু তখনো পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬)-র লেখক মানিক তার সঙ্গে যুক্ত হননি। আনুষ্ঠানিকভাবে তখনো তিনি কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী হননি, যদিও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন এক শ্রেণী চেতনা ও সমাজ বাস্তবতার জেদী মনোভাব তাঁর কলমে ফুটে উঠছিল। বিজ্ঞানের ছাত্র. ফ্রয়েডের ছাত্র মনোবিকলনের রূপচিত্রায়ণে উৎসাহী ইত্যাদি পরিচয়ে মানিকের প্রথম দিকের উপন্যাসকে চিহ্নিত করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু মানিক তাঁর সাহিত্য-জীবনের সূচনা সম্পর্কে নিজেই স্বীকারোক্তি করেছেন—

"সচেতনভাবে বস্তুবাদের আদর্শ গ্রহণ করে সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাহিত্য করিনি বটে—কিন্তু ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সাহিত্যে আমাকে বাস্তবকে অবলম্বন করতে বাধ্য কবেছিল..."[১]

'ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ' এই মনোধর্মেই বাঙলা উপন্যাসে মানিকের আবির্ভাব এবং নতুন এক বাস্তবের নির্ণায়ক। ১৯০৮ সালে তাঁর জন্ম আর পদ্মানদীর মাঝি রচনাকালে তাঁর বয়স তখন মাত্র ছাব্বিশ-সাতাশ পেরিয়েছে। এরই মধ্যে জননী, দিবারাত্রির কাব্য, পুতুলনাচের ইতিকথা এই তিনটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে গেছে তাঁর। অতসীমামী লেখার কাহিনী তো লিজেন্‌ডে পরিণত। এই বয়সে ওই দৃষ্টি পেলেন কোথায় তিনি ভাবতে বিস্ময় লাগে। কল্লোলের তেজী লেখকরা তখন প্রখর প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছেন, শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তাও প্রায় অবিশ্বাস্য। রবীন্দ্রনাথ জীবিত, আর নতুন কালের নতুন মানসিকতার অনুকূল পাঠকশ্রেণীও তৈরি হয়ে

উঠছে। এরই মধ্যে মানিক তথাকথিত আধুনিক প্রগতিশীল বাস্তববাদী সাহিত্যিকদের মুখোশ—বাস্তব ভাবালুতার চেহারাটা ধরে ফেলেছেন, নতুন এক বস্তুচৈতন্য তুলে ধরার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, আশৈশব-সঞ্চিত জীবন অভিজ্ঞতাগুলোকে শ্রেণীবদ্ধ করার চেষ্টা করছেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় প্রদত্ত তথ্যাদি থেকে জানতে পারি, সেটেলমেণ্ট বিভাগের কর্মী পিতার সঙ্গে কৈশোরে পদ্মাতীরে জীবন কাটাতে হয়েছিল তাঁর, টাঙাইল-কুমিল্লা-নোয়াখালি-ঢাকা-বরিশালের জেলে-মাঝিদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে নিশ্চয় কিছু সজাগ কৌতূহল ছিল তাঁর, সাহিত্য-রচনার পরিকল্পনা তখন থেকেই তাঁর ছিল, উপকরণ সংগ্রহ করে চলেছিলেন অপরিণত বয়সেই।[২] তাঁদের মুখের ভাষাও আয়ত্ত করেছিলেন তিনি যথাসম্ভব, শব্দে বাগ্‌ধারায়[৩], দরকার মতো জেনে নিয়েছিলেন, কারণ ভাবালুতা বর্জিত বাস্তবতার জন্ম দিতে ভাষারও একটা বড় প্রয়োজন আছে।

২

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব সংগ্রাম ও প্রতিষ্ঠার স্তরপরম্পরা বুঝে নেওয়ার জন্য তাঁর প্রায় সমসাময়িক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা প্রথমেই সেরে নেওয়া যেতে পারে। এই তিন কথাশিল্পীর অধিষ্ঠান প্রায় কাছাকাছি সময়ে, এঁদের ঔপন্যাসিক পটভূমির মধ্যেও দুস্তর দূরত্ব ছিল না, একই পাঠকগোষ্ঠির অভিনন্দনে এঁরা সম্বর্ধিত হয়েছিলেন।[৪] বিভূতিভূষণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস পথের পাঁচালি ও অপরাজিত ১৯২৯-৩১ সালে প্রকাশিত হয়ে গেছে, তারাশঙ্করের রাইকমল জলসা ঘর রসকলি বেদেনী ধাত্রীদেবতা কালিন্দী অর্থাৎ তাঁর ঔপন্যাসিক জীবনের জয়স্তম্ভগুলি ১৯৩৫ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যেই প্রকাশিত। মানিক তাঁর অতসীমামী গল্প ছাড়া জননী, দিবা-রাত্রির কাব্য, পুতুলনাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি, শহরতলী, প্রাগৈতিহাসিক, মিহি ও মোটাকাহিনী, সরীসৃপ নিয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন ১৯৪০-এর মধ্যেই। তিনজনেই মাটির কাছাকাছি জীবনকে তাঁদের অভিজ্ঞতার ফলকে তুলে ধরেছিলেন। তবু তারাশংকরের অভিজ্ঞতার মাটি রুক্ষতায় গৈরিক। বিভূতিভূষণের মাটি স্নেহ কোমলতায় হরিৎশ্যামল আর মানিকের মাটি ছিল জটিল সংগ্রামে কালো। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী বাঙলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসই এদের গল্প উপন্যাসের

প্রেক্ষাপট। তৎকালীন স্বাধীনতা আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদী শোষণপেষণ, গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ, গ্রামীণ অর্থনীতির বিপর্যয়, মূল্যবোধজনিত সংঘাত, সনাতন নীতিবোধের অবনয়ন, পারিবারিক আদর্শের ভাঙন—এ সবই তিন লেখককে অল্পবিস্তর স্পর্শ করে গেছে। বিভূতিভূষণ এঁদের মধ্যে ছিলেন সবচেয়ে অপাপবিদ্ধ লেখক, সবচেয়ে সচল, সমাজচেতনায় সবচেয়ে দীন, সর্বাধিক অকৌশলী। ইতিহাসের অমোঘ অধ্যায়ে বসে থেকেও তার দ্রুত স্পন্দিত বক্ষোধ্বনি কান পেতে শোনেননি তিনি। মহাযুদ্ধের করাল প্রেতচ্ছায়া তাঁকে বিবর্ণ করেনি, মন্বন্তর তাঁর গ্রামের লতাগুল্মের উপর দীর্ঘশ্বাস ফেলেনি। প্রকৃতির প্রতি মুগ্ধদৃষ্টি মেলে, মানুষের ক্ষীণায়ু সত্তার প্রতি সপ্রশংস বিস্ময় নিয়েই তাঁর গল্পকার জীবন ফুরিয়ে গেছে। অনেক অঞ্চল ঘুরেছেন তিনি। কিন্তু আঞ্চলিকতা তাঁর কথাসাহিত্যে কখনই তীব্র আবেদন রাখতে পারেনি। তারাশংকরের কথাসাহিত্য বাঙলার সমাজ ইতিহাসের বিবিক্ত বিশ্লেষণ, বাঙালি জীবনের সামন্ততান্ত্রিক ও আধুনিক দুই প্রান্তেরই নিষ্ঠুর বিচার। নিম্নহিন্দু এ বর্ণহিন্দু উভয় সমাজেই তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল মর্মভেদী। আঞ্চলিক জীবনপ্রকৃতি, গোষ্ঠিকেন্দ্রিকতা, আদিম জীবনাচার, উদ্দাম প্রবৃত্তি, জীবনের অন্ধিসন্ধি দেখেছেন তিনি। সামন্ত যুগীয় সমাজের সঙ্গে ধনতান্ত্রিক সমাজের আদর্শসংঘাত, রক্ষণশীল শাস্ত্রানুগত্যের সঙ্গে যুক্তিবাদী মননের বিরোধ, প্রাচীন সংস্কার দৈব বিশ্বাস ও অন্ধ আচারপরায়ণতার সঙ্গে আধুনিক নাস্তিক্যবুদ্ধির দ্বন্দ্ব, আভিজাত্যগর্বী একক প্রভুত্বের সঙ্গে উদ্‌ভিন্ন ঐক্যবদ্ধ শ্রমশক্তির সংঘর্ষ নানাভাবে তাঁর কথাশিল্পে আত্মপ্রকাশ করেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী বাঙালি মানসিকতার মূল সন্ধানে মধ্যবিত্তের বৈপরীত্যজর্জর অন্তঃসারশূন্যতাকে নির্মমভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ক্ষয়রোগদুষ্ট মধ্যবিত্তের সংক্রামক জীবাণুগুলিকে তিনি গবেষণাগারের আতসকাঁচে পৃথক করেছেন, বৈজ্ঞানিক নৈর্ব্যক্তিকতায় তাদের ক্লিনিকাল রিপোর্ট তৈরি করেছেন। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের শ্রেণীসংঘর্ষ ও মূল্যবোধ-বিপর্যয়ের নির্দয় ইতিহাস বর্ণনা করতে তাঁর কলম কাঁপেনি। গতস্তের জন্য কোনো শোচনা, অতীতের মূল্যবোধ-হারানোর জন্য কোনো দীর্ঘশ্বাস তারাশংকরের মতো তাঁকে ব্যাকুল করেনি। বিভূতিভূষণের নির্দোষ বুভুক্ষা ও করুণ লোভের কণামাত্র তাঁর স্বভাবে ছিল না।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পদ্মানদীর মাঝিকে মানিকের উপন্যাস সাহিত্যে স্বতন্ত্র ব্যতিক্রম বলেই মনে হয়। চল্লিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হওয়া থেকে ১৯৫৬ সালের জীবনাবসান পর্যন্ত এই ধরনের নদীমাতৃক বৃত্তিজীবী গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা নিয়ে তাঁর স্মরণীয় সৃষ্টি আর নেই। এ বই নিঃসন্দেহে মানিকেরই রচনা, তবে যথার্থ প্রতিনিধিমূলক কিনা সন্দেহ জাগে। এ যেন তাঁর পরীক্ষানবিশি পর্বের সৃষ্টি, যখন নিজের শ্রেণী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক শ্রেণীর জীবনবৃত্ত অনুসন্ধিৎসাবশত অধিগত করে নিজের বিশ্বাস আদর্শ ও সাহিত্যিক মানদণ্ডে অপেক্ষাকৃত বৈজ্ঞানিক অপক্ষপাত কৌতূহলে ও সাংবাদিক সততায় যে একটি উপন্যাস লেখা যায়, এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই ধরনের 'Seafarer occupational community' নিয়ে, তাদের মুখের অধিকৃত ভাষা নিয়ে বাঙলায় এর আগে কোনো উপন্যাস লেখা হয়নি তাও সত্যি। পদ্মাতীরের জেলে মাঝিদের মাছ ধরা, তাদের জলজীবন, মাছ তোলা ও পণ্যদ্রব্যরূপে বাজারে বিক্রয় করা, তাদের নৌকো জাল, মাছ ধরার কৌশল, গ্রাম্য জীবনযাত্রা, কলহ-কলরব, জন্ম মৃত্যু বিবাহ, উৎসব-সংস্কার, তাদের age-group, এসব বিস্তারিতভাবে এ বইতে না থাকলেও মোটামুটি আছে।[৫] তারাশংকরের মতো এ উপন্যাসকে মানিক গোষ্ঠীজীবনের 'উপকথা' তো করতে চাননি। তাই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই শ্রেণীরূপের একটি ব্যক্তি-প্রতিনিধির কাহিনী হিসেবেই উপন্যাসটিকে গড়ে তুলেছেন তিনি। তার পরিবেশ বর্ণনাসূত্রেই বৃত্তির একটা মোটা পটভূমি আঁকতে হয়েছে তাঁকে যথাসম্ভব তথ্যনিষ্ঠ নিরাসক্ত নিস্পৃহ ও সাংবাদিক ভাষায়। তাদের নৌকোর গড়ন থেকে শুরু করে নৌকোর অবস্থান, জাল ফেলার পদ্ধতি, ধরা মাছের বণ্টন-বাঁটোয়ারা, শ্রান্তি বিনোদন, প্রতারণা-শোষণ ইত্যাদি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত কিন্তু খুঁটিনাটি বর্ণনা আছে। বিশেষ কাহিনী হলেও বহুস্থলেই ক্রিয়াপদ নিত্য বর্তমান। সম্ভবত পদ্মানদীর মাঝিদের জীবনযাত্রার প্রতিদিনের গতানুগতিকতা ও শোষণের সনাতন ইতিহাসের টানেই নিত্য বর্তমান ক্রিয়াপদের এত স্বভাবসিদ্ধ ব্যবহার ঘটেছে। উপন্যাসের প্রথম ভাগেই লেখক তাঁর নায়ককে দেখিয়েছেন নিশ্চেষ্ট, অসহায়, অদৃষ্টের নির্জীব ক্রীড়নক রূপে, সহকর্মীর সঙ্গে দুআনা চার আনা ভাগে মজুরি খাটাই যার জীবিকা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গল্প নায়কের বৈঠকখানায় ঢুকে সমাজজীবনের মুখের ওপর দরজা

বন্ধ করে দেয়নি। যে কেতুপুর গ্রাম এই উপন্যাসের ক্যানভাস, তার আগাগোড়া দেখাবার চেষ্টা করেছেন সতর্ক মানিক, হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামের জমিদার অনন্ত তালুকদার থেকে শুরু করে তার মুহুরি শীতল, নদী ও নদীতীরে ইলিশের মরশুম, চালানবাবুর মাছ-গোনা ও 'ছোঁ মারিয়া চালান বাবুর চাঁদা' পাঁচটি মাছ-আদায়ের দৈনন্দিন পদ্ধতি, সহকর্মীদের সহানুভূতি ও পরচর্চা, ঔদার্যও ইতরতা. সংকীর্ণ জমিতে কায়ক্লেশে গৃহনির্মাণ, রোগভোগ ও প্রকৃতির প্রতিকূলতা, পারস্পরিক স্বার্থসংকীর্ণতা ও পানাশক্তি, উৎসবে তাদের সুলভ আমোদ ও আশু সন্তোষ, বছরের অন্যান্য সময়ে তাদের জীবিকার পরিবর্তন—এ সবই উপন্যাসে আছে একেবারে তথ্যনিষ্ঠ বাস্তব বিবৃতি হিসেবে। গল্পের মধ্যেই এ সবের বিবরণ আছে, কিন্তু কাহিনীর গতি ব্যাহত না করে, যাকে আমাদের মনে যে সাংবাদিক নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গি। এসব বর্ণনায় কোথাও ভাবাবেগ নেই, কোনো প্রকার হৃদয় দুর্বলতায়, চরিত্রের প্রতি মমতায় লেখকের কণ্ঠ কেঁপে ওঠেনি। এখানে দুএকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

ক. গরিবের মধ্যে সে গরীব, ছোটলোকের মধ্যে আরও বেশী ছোটলোক। এমনভাবে তাহাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা সকলে তাই প্রথার মত, সামাজিক ও ধর্মসম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মত, অসংকোচে গ্রহণ করিয়াছে সে।[৬]

খ. জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর নিরুৎসব বিষণ্ণ। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসা কাম ও মমতায় স্বার্থসংকীর্ণতায়। আর দেশী মদে।[৭]

গ. ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।[৮]

সুবিধাবাদী লেখকেরমতো মানিক তাঁর বর্ণিতব্য সমাজের এই বিশেষত্বগুলি প্রমাণ করার জন্য কাহিনী বিস্তার করেননি, এগুলি তাঁর 'স্টেটমেণ্ট' মাত্র, তাঁর 'থিমেটিক ব্যাকগ্রাউণ্ড' সম্পর্কে যাকে বলে 'ডিস্‌প্যাশানেট এ্যাসেসমেণ্ট'। এই ধরনের ভাষায় এই জাতীয় নিষ্ঠুর নির্বিকার সত্যউদ্‌ঘাটনই তাঁর একান্ত বিশেষত্ব। তিনি যখন কুবেরের ঘরের মধ্যে হোসেনকে ঢোকান, আমাদেরও ঢুকিয়ে দেন মুহূর্তের মধ্যে। কুবেরের পাশে দাঁড়িয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই গৃহাভ্যন্তরস্থ খুঁটিনাটিগুলি দেখে নেন, এমনকি ঢেঁকির পুরনো ইতিহাসটাও

বলে নেওয়ার দরকার মনে হয় তাঁর।[৯] তিনি না বললে যেন কুবেরকেই বলতে হত সে কথাগুলো কিংবা অন্য কোনো চরিত্রকে। পীতম মাঝির সংকীর্ণ গৃহে গোয়ালঘর দিয়ে ঢোকার বর্ণনাতেও সেই একই আনুপূর্বিক তথ্যনিষ্ঠা ও নির্বিকারত্ব কিংবা কুবেরের আঁতুড় ঘরের বিবরণে। মাঝে মাঝে দুএকটি মন্তব্যে মনে করিয়া দেন এ বর্ণনা শেষ পর্যন্ত নিছক বস্তুপট নয়, এই তীক্ষ্ন দৃষ্টিভঙ্গির পিছনে রয়েছে একটি সমাজ বাস্তব মনন। যেমন কেতুপুরের মুসলমান মাঝিদের গৃহনির্মাণ পদ্ধতির বিবরণে—

"এরা এবং জেলেপাড়ার অ-মুসলমান অধিবাসীরা সদ্ভাবেই দিন কাটায়। ধর্ম যতই পৃথক্ হোক, দিনযাপনের মধ্যে তাহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই। সকলেই তাহারা সমভাবে ধর্মের চেয়ে এক বড় অধর্ম পালন করে— দারিদ্র্য। বিবাদ যদি কখনও বাধে, সে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিবাদ, মিটিয়াও যায় অল্পেই।"[১০]

এই অসাধারণ উপলব্ধির ভাষা থেকেই বুঝতে পারি, মানিক যে বয়সে যে অপরিণত অভিজ্ঞতায় বা অপরিশীলিত আদর্শেই পদ্মানদীর মাঝি লিখুন না কেন, এক মহৎ সাহিত্যিক সম্ভাবনা জন্ম নিচ্ছিল তাঁর মনে। বুঝতে পারি, কেন তিনি বলেছেন, "জীবনকে আমি যে ভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি।" বুঝতে পারি, উত্তরকালের সাম্যবাদী বিশ্বাসে দীক্ষিত মানিকের ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দর্শনের প্রতি আসক্তির বীজ এখানেই নিহিত।

এবার আলোচনা সংহত করে বলতে পারি, পদ্মানদীর একটি মাঝির গল্প বলতে বসেও পদ্মানদীর মাঝিদের জীবনযাত্রা, তাদের আর্থিক ও সামাজিক শ্রেণীসংগ্রাম, তাদের সাংস্কৃতিক উপসোধ, এই সমস্ত বিষয়ে লেখকের ধারণাটি ছিল স্বচ্ছ বিকারহীন ও সংস্কারমুক্ত।' সারারাত্রি ক্লান্তি ও ক্ষুধায় জাল ফেলে বিধ্বস্ত হয়ে গণেশ মাঝি যখন বলে ওঠে, 'একখান গীত দেখি কুবির', তখন সচেতন পাঠকের বুঝতে বাকি থাকে না, সংগীত কখনো কখনো শোষিত শ্রেণীর জীবন সংগ্রামের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত প্রমোদ-উপাদান নয়, তার ভূমিকা আরো গভীর, এতত্ত্ব লেখকের জানা আছে। তাই কখনো কুবেরের মুখে শুনি "আমাগোর যুগইল্যা মুখে মুখে ছড়া বাইন্ধ্যা দেয়।" হোসেন মিয়ার মতো চতুর প্রতিষ্ঠাকামী ব্যবসায়ীর মধ্যেও স্বভাব কবিত্বের এক অনুপলব্ধ সম্ভাবনা নিহিত ছিল, সুযোগ পেলে সে লোকগীতিকার

হতে পারত। তাই খঞ্জ পঙ্গু অশিক্ষিত অমার্জিত মালার রূপকথা বলার বিশেষ একটি ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই গল্পে সঞ্চারিত হয়। আমিন বাড়ির বাজারে গ্রামীণ যাত্রা শহরে সংস্কৃতির প্রভাবে উদ্ভট এক আরবানাইজড্ চেহারা নিয়ে জনরুচি তৃপ্ত করে। এমনিভাবে ছোটখাট লোক উৎসব, রথের মেলা, লোক সংস্কার, লোকবিশ্বাসের ইতস্তত বিবরণ দিয়ে মানিক পদ্মাতীরের লোকজীবনের ;একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রস্তুত করে দেন আমাদের কাছে।

৩

এই প্রসঙ্গে মানিকের ভাষারীতির কথাটাও বলে দেওয়া যেতে পারে। উপন্যাসে পাঠক-লেখকের কমিউনিকেশানের যে নিজস্ব একটি ভাষা মানিক গড়ে নিয়েছিলেন, তা তাঁর স্বভাবেরই দোসর ছিল। গোড়ার দিকে সাধু-ভাষা ও ক্রমশ চলতি ভাষা ব্যবহার করলেও তাঁর ভাষায় আগাগোড়া একটা নির্মম নিরাসক্তি ও নির্লিপ্তি আছে।[১১] বারবার বলতে ইচ্ছে করে, এ ভাষা বিজ্ঞানীর নিরাবেগ দূরত্বে চিহ্নিত, এ ভাষা চিন্তার ভাবনার ঋজুতায় অত্যন্ত কঠোর, কোনো রকম ভাবাবেগ ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দেয় না। যে ভাষায় তিনি তুচ্ছ খুঁটিনাটির বিবরণ দিয়েছেন সেই ভাষাতেই সেই তুচ্ছতার গভীরে নিহিত এক সমাজ সত্যের পোস্টমর্টেম রিপোর্টটাও অনায়াসে পেশ করেছেন। এ ভাষা তাই কখনো বিবৃতির, কখনো ভাষ্যটিপ্পনীর। সাংবাদিকের টীকা, বৈজ্ঞানিকের প্রতিবেদন, চিকিৎসকের নির্ণয়গ্রাহী মন্তব্য, একই সঙ্গে এ ভাষার সম্বল। লেখক কখনো চরিত্রের সঙ্গে মিশে গেছেন, চরিত্রের সংলাপকেই কখনো লেখকের মন্তব্যে অনূদিত করে দিয়েছেন। আবার কখনো চরিত্রের পাশে দাঁড়িয়ে চরিত্রের ভিতরটাকে এক নজরে দেখিয়ে দিয়েছেন কোনো সংকোচ-ভণিতা না করেই—নিজেই নিজের সৃষ্ট চরিত্রের অসংগতি নিয়ে বিদ্রূপ করেছেন—যেন তিনি স্রষ্টা নন, নিছক দ্রষ্টা মাত্র। কখনো কখনো এই ভাষা গল্পবিলাসী পাঠকের নির্বিঘ্ন নিশ্চিন্ততাকে তীরের মতো আঘাত করে। কেবল কাহিনীরস পিপাসা বা কৌতূহল চরিতার্থতাই যে মানিকের সাহিত্যপাঠের পুরস্কার নয় এই বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। বর্ণনার ভাষায় কী ধরনের নিরাবেগ অভিসন্ধি প্রকাশ করা যায় তার কয়েকটি উদাহরণ দেখা যেতে পারে—

ক. জোর বাতাসেও নৌকার চিরস্থায়ী গাঢ় আঁশটে গন্ধ উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে না।[১২]

খ. কলিকাতার বাতাসে পাওয়া যাইবে পদ্মার ইলিশ মাছ ভাজার গন্ধ।[১৩]

গ. জেলেপাড়ার ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসি কান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনদিন সাঙ্গ হয় না।[১৪]

ঘ. নবজাত সন্তানকে তাহারা যেমন পাশবিক তীব্রতার সঙ্গে মমতা করে, বয়স্ক সন্তানের জন্য তাহাদের তেমনি আসে অসভ্য উদাসীনতা।[১৫]

ঙ. ও তো মানুষের চোখের জল নয়, কমিবে বৈকি।[১৬]

এই শ্রেণীর মর্মভেদী মন্তব্য উপন্যাস-পাঠকের অভিজ্ঞতায় অনেক বেশি সংকলিত হতে পারে। লেখকের ভাষা কেমন করে নির্লিপ্ত থেকেও চরিত্রের ভাষা হয়ে ওঠে, সংলাপের বিকল্পরূপে দেখা দেয়, তার দৃষ্টান্ত দেখা যাক।

ক. কুবের ঝিমাইতে ঝিমাইতে নিদ্রাকাতর চোখে স্ত্রীর দিকে তাকায়। হ, ছেলে কোলে রোগা বৌটিকে তাহার রাজরাণীর মতো দেখাইতেছে বটে। কে জানে রাজরাণী দেখিতে কেমন? ছেলেটাও যেন ফরসাই হইয়াছে মনে হয়, এমনি বয়সে লখা আর চণ্ডী যেমন তামাটে লাল রঙের ছিল সে-রকম নয়।[১৭]

খ. আর হ, মালা রূপকথা বলে।[১৮]

গ. তা বৈকি! কলঙ্ক কিনিবার সাধ যে কপিলার ষোল আনা দেখা যায়? কুবের গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে।[১৯]

"কে জানে কী আছে কপিলার মনে"—রহস্যময়ী কপিলা সম্পর্কে কুবেরের মানসিক অবস্থা বোঝাতে বাক্যটি একাধিকবার লেখক ব্যবহার করেছেন। কপিলা ও কুবেরের লীলাঘন অথচ মূঢ় অজ্ঞের জৈবিক সম্পর্কের বিবরণে লেখক সর্বদা মৌখিক সংলাপ প্রয়োগ করেননি, প্রয়োজনে নিজের ভাষায় অনুবাদ করে দিয়েছেন। কখনো হোসেনের চরিত্র কুবের বা অন্যান্য গ্রাম্য মাঝিদের অস্পষ্ট ধারণার উপাদান দিয়েই লেখক তৈরি করে নিয়েছেন। কুবেরের নিষ্ক্রিয় চরিত্রের বর্ণনায় লেখক একস্থানে এমন একটি নিরাসক্ত উপমা ব্যবহার করেছেন যা আমাদের রীতিমত নাড়া দিয়ে যায়।

"যে দিন [কুবের বাড়িতে] থাকে, সেদিন বড়লোকের বাড়ির পোষা

কুকুরের মত উদাস চোখে এসব যে চাহিয়া দেখে, স্নেহমমতার এইসব খাপছাড়া কাণ্ডকারখানা। দেখিতে দেখিতে সে হাই তোলে, বড়লোকের পোষা কুকুরের মতই চাটাইয়ে একটা গড়ান দিয়া উঠিয়া বসে, মুখখানা করিয়া রাখে গম্ভীর।"[২০]

মালার মাতৃস্নেহ জেলেপাড়ার নারীদের তুলনায় যে স্বতন্ত্র সে কথা বোঝাবার জন্য জেলেপাড়ার পুরুষ, ও বিশেষত নারীদের, নির্বিকার জৈবিক জীবনযাত্রাও অনুরূপ হৃদয়াবেগবর্জিত ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে, "ছেলে মরিয়া গেলেও শোক তাহারা করে না, শুধু সুর করিয়া মড়াকান্না কাঁদে।[২১] এত নির্মম নির্লিপ্ততা বাঙলা উপন্যাসে এর আগে তো নয়ই, পরেও চোখে পড়ে কিনা সন্দেহ। কেতুপুরে আশ্বিনের প্রলয়ংকর ঝড়ের পর বিধ্বস্ত গ্রাম ও হতভাগ্য গ্রামবাসীদের বিবরণ দিয়ে লেখক বিধাতার মতো হৃদয়হীন বাক্য ব্যবহার করেছেন। পথের পাঁচালীর পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে অনুরূপ একটি আশ্বিন-দুর্যোগপ্রমত্ত ঝড়বৃষ্টি ও ভয়াবহ রাত্রির বর্ণনা আছে, পাঠকের মনে পড়তে পারে। ঐ দুর্যোগের অব্যবহিত পরেই দুর্গার মৃত্যু ঘটল জরবিকারে, সে মৃত্যু ঐ দুর্যোগেরই ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়ে গেল পরোক্ষে। তারপর লেখকের এই ভাষা সামান্য উদ্ধার করছি—

আকাশের নীল আস্তরণ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে অনন্তের হাতছানি আসে—পৃথিবীর বুক থেকে ছেলেমেয়েরা চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া গিয়া অনন্ত নীলিমার মধ্যে ডুবিয়া নিজেদের হারাইয়া ফেলে—পরিচিত ও গতানুগতিক পথের বহু দূরপারে কোন পথহীন পথে—দুর্গার অশান্ত চঞ্চল প্রাণের বেলায় জীবনের সেই সর্বাপেক্ষা বড় অজানার ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছে।[২২]

পদ্মানদীর মাঝির পঞ্চম পরিচ্ছেদে তেমনি এক ঝড় দুর্যোগের মর্মান্তিক সংবাদ আছে, কিন্তু ঝড়ের বর্ণনা কয়েকটি তথ্যগুমোট বাক্যে থমথম করছে আর ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ কয়েকটি জার্নালিষ্টিক বিবরণে সংক্ষিপ্ত। ভাষায় ভাবাবেগ নেই কোথাও, নেই মমতার হাহাকার, কারুণ্য, স্বরভঙ্গ, অথচ নিষ্ঠুরতাই যেন মনে হয় এর চরিত্রে—

প্রকাণ্ড একটা সিঁদুরে আমের গাছ গোড়াসুদ্ধ উপড়াইয়া যে ঘরে আমিনুদ্দির বৌ আর ছেলেমেয়ে তিনটি ছিল সেই ঘরখানাকে মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছে। আমিনুদ্দির বৌ থেতলাইয়া মরিয়াছিল সঙ্গে সঙ্গে,

সকালে টানিয়া বাহির করার সময় ছেলেটার প্রাণ ছিল, ঘণ্টাখানেক পরে সেও শেষ হইয়া গিয়াছে।[২৩]

উপন্যাসে ক্ষুধার ভূমিকাটি বড় তীব্র উগ্র সচকিত। সে ক্ষুধা প্রধানত উদরের, অংশত জৈবিকও। উপন্যাসের সূচনাতেই লেখক বলে দিয়েছেন, জেলেপাড়ায় 'ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনদিন সাঙ্গ হয় না'। ঐ একই উপলক্ষে পুনর্বার বলেছেন, 'জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ সংকীর্ণতায়।' উপন্যাসে ক্ষুধার চিত্রগুলি তাই লেখকের নিষ্ঠুর ভাষায় অনাবৃত নগ্নতায় আমাদের শোভন রুচিবোধকে পীড়িত করে। কুবের তার উচ্ছিষ্ট কিছু শুকনো চিঁড়ে উলঙ্গ শীর্ণ দুই শিশুপুত্রকে দেওয়ার পর লেখকের নগ্ন সন্ধিৎসু চোখেই ধরা পড়ে—"পিতৃদত্ত প্রসাদের ভাগ-বাঁটোয়ারা লইয়া ঘরের কোণে দুজনের একটা ছোটখাট কলহ বাধিয়া গেল"।[২৪] আঁতুড়ঘর থেকে অনেক রাত্রে মালা বলে, 'আমারে দুগা মুড়ি-চিড়া দিবা গো?...... ভাতে টান পড়ল, পেট ভইরা খাই নাই। অখন খিদায় পেট জ্বলে।"[২৫] কুবেরের শ্রান্ত দেহে ক্ষুধাহর ভাতের অভিযানের ভাষা—"ভাত নামিলে ইলিশ মাছ ভাজা আর লঙ্কারক্তিম তরকারি দিয়া ফেন সমেত তপ্ত অন্নে কুবের মুহূর্তের মধ্যে পেট ভরাইয়া ফেলিল।"[২৬] রথের মেলার বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য স্মরণ করে এই বিষয়ের আলোচনা শেষ করা যেতে পারে—"একটি কাঁঠাল, দুটি আনারস, আধসের বাতাসা—এই দরিদ্রের উপনিবেশেও যে দরিদ্রতম পরিবার শুধু নুন আর অদৃষ্টকে ফাঁকি দিয়া-ধরা পুঁটির তেলে ভাজা পুঁটিমাছ দিয়া দিনের পর দিন আধপেটা ভাত খাইয়া থাকে—খুশী হইয়া উঠিতে তাহাদের অধিক প্রয়োজন কিসের?"[২৭]

৪

পদ্মানদীর মাঝি সাত পরিচ্ছেদের উপন্যাস। কিন্তু এই পরিচ্ছেদ-বিন্যাসে উপন্যাসের গঠনরীতির কোনো সুনিরূপিত আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায় না। মানিকের উপন্যাসের গঠন ঢিলেঢালা, 'প্লট-কনস্ট্রাকশান' শিথিল প্রকৃতির, নাটকীয় নয়—বিবৃতিমূলক। তাঁর উপন্যাসের প্রথম দিকে দিবারাত্রির কাব্য-জাতীয় নাম থাকলেও পরবর্তীকালের নাম পুতুলনাচের ইতিকথা, ধরাবাঁধা জীবন, শহরবাসের ইতিকথা, আদায়ের ইতিহাস, প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[২৮] ধরাবাঁধা জীবনের গতানু-

গতিকতা, ইতিকথার একঘেয়ে পুনরাবৃত্তিরই তো তিনি কাহিনীকার। তাঁর অবলম্বিত যে-জীবন সামন্ততান্ত্রিক পেষণে জড়ীভূত, মধ্যবিত্ত উৎকেন্দ্রিকতায় উদ্‌ভ্রান্ত, তাতে না আছে ছন্দ না আছে গতি। সেই জীবনের রূপায়নে মানিক কৃত্রিম শিল্পের মুখোশ আঁটেননি উপন্যাসের গায়ে। পদ্মানদীর মাঝির প্রথম পরিচ্ছেদে তিনি তাঁর উপন্যাসের একটা পটভূমি বা milieu দিয়েছেন যেখানে পাই দরিদ্র ধীবরশ্রেণীর জীবনযাপন প্রণালী, পরিবেশ, শোষণ, শ্রেণীচরিত্র, নিশ্চেষ্টতা, নিষ্ফল সংগ্রামের অসহায়তা, স্বার্থ-সংকীর্ণতার সমাজ বাস্তব বিবরণ। কুবেরের সন্তানের জন্মে এর ঘটনাগত সূচনা। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ক্যামেরা যেন আর একটু সময়ের দিকে পিছিয়ে পটটাকে আরো বড় করে দেখিয়েছে—সেখানে এসেছে লোকজীবনের কিছু পার্বণ-মেলা-উৎসব, তারপর আবার ক্যামেরায় কুবেরের পরিবারের ক্লোজ-আপ। তার পুত্রকন্যার বিবরণ। ভাঙা ঘরের চাল দিয়ে জল-পড়া, চিঁড়ে গুড় দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি, উচ্ছিষ্ট চিঁড়ের ভাগ নিয়ে উলঙ্গ পুত্রদের কলহ, ভিজে স্যাঁতসেতে বিছানায় নবজাত শিশুকে নিয়ে কুবের-স্ত্রীর আঁতুড়-শয্যার নির্মোহ টুকরো টুকরো বিবরণ। এই পরিচ্ছেদে এসেছে হোসেন, শুধু কুবের নয় সমস্ত কেতুপুর গ্রামের নতুন শ্রেণী-নিয়তি। লেখক তার রহস্যঘন জীবন, পরিবর্তিত সৌভাগ্য, ব্যক্তিত্ব ও প্রভুত্বকামিতা, দরিদ্র মাঝিদের কুক্ষিগত করার বিনয়ী চাতুর্য, পরোপকার ও স্বার্থসিদ্ধি, তার বিচিত্র ব্যবসায় ও উপনিবেশ স্থাপনের বিবরণ, প্রতিবেশী গ্রামবাসীদের নিঃশব্দ অথবা ক্ষীণ প্রতিক্রিয়ার সূত্রেই উত্থাপিত করেছেন। আর কুবেরের প্রতি হোসেনের অহেতুক করুণা প্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে পরবর্তী কাহিনীর অস্পষ্ট ইঙ্গিত গেঁথেছেন মাত্র। তৃতীয় পরিচ্ছেদ পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদেরই ক্রমানুসৃতি—ঘটনার মধ্যে কুবেরের কন্যা গোপীর বিবাহ-সম্ভাবনা নিয়ে কুবেরের পারিবারিক বাণিজ্যের একটা পরিকল্পনার আভাস এবং কুবের-মালার দাম্পত্য সম্পর্কের একটা মৃদু রেখাঙ্কণ দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদ থেকে ছাড়াছাড়াভাবে জার্নালিস্টিক ভঙ্গিতে কাহিনীর ঈষৎ জট তৈরি হয়েছে, একটা আখ্যানের অবয়ব অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। রথের মেলায় যাওয়ার জলপথে হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপ থেকে সর্বস্বান্ত রাসুর প্রত্যাবর্তন-ঘটনাকে ঘিরে গ্রামবাসীদের মধ্যে ক্ষীণ আলোড়ন, হোসেন মিয়ার ব্যক্তিত্বে তার অবসান। রাসুর নতুন করে সংসার চিন্তা ও গোপীকে বিবাহের চেষ্টা

—এই ঘটনাগুচ্ছে বন্যাকবলিত চরডাঙা থেকে মালার ভগ্নী কপিলার আগমনে কুবেরের নিস্তেজ জীবনে একটু নতুন মানস-চাঞ্চল্য ও জৈব উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে। কপিলার চলচপলতা, রহস্যময় ব্যবহার, নিঃশব্দ সেবা যত্ন ও গোপন ছলাকলা কুবেরকে যেমন অনাস্বাদিতপূর্ব সুখ মাধুর্যে রোমাঞ্চিত করেছে, তেমনি মগ্নচৈতন্যে সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার নিস্তরঙ্গ দিঘিতে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে দিয়েছে। বর্ষার মরশুমে প্রথম পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছিল। পঞ্চম পরিচ্ছেদের উপর আশ্বিনের দুর্যোগ ঝঞ্ঝা আছড়ে পড়েছে। সমস্ত গ্রামবাসীর জীবনে এসেছে প্রতিকূল প্রকৃতির বিদ্রূপ-বিড়ম্বনা, তার ফয়দা তুলেছে হোসেন। নিঃসম্বল গৃহহীন গ্রামবাসীদের গৃহনির্মাণে সাহায্য করে তাদের সে খতে বন্দী করে ফেলেছে, কুবেরকে অযাচিত সাহায্যে অভিভূত করেছে। অন্যদিকে কন্যা গোপীর পায়ে আঘাত লাগায় কুবের তাকে নিয়ে বিব্রত হয়েছে। পূজার উৎসবের মধ্যে কপিলার সঙ্গে আরো অন্তরঙ্গতা ও রহস্যরঙ্গের আস্বাদও সে পেয়েছে। ক্রমাগত রঙ্গময়ী কপিলা কুবেরকে উদ্‌ভ্রান্ত করে দিয়েছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কুবের-কপিলার সম্পর্ক গোপীর ভাঙা পায়ের চিকিৎসা ও আমিনবাড়ি হাসপাতালে যাওয়া উপলক্ষে আরো অন্তরঙ্গ উত্তেজনায় জটিল হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে রাসু ক্রমশ উপচিকীর্ষার দ্বারা গোপীর সঙ্গে বিবাহের অধিকার পাকা করার চেষ্টা করেছে। কপিলার স্বামী শ্যামাদাস হঠাৎ এসে কপিলাকে নিয়ে গেছে। সপ্তম পরিচ্ছেদ উপন্যাসে শেষ ও দীর্ঘতম অংশ। এই পরিচ্ছেদ বহু ঘটনায় নিবিড়—বিক্ষিপ্ত কাহিনীকে লেখক এই পরিচ্ছেদেই সংহত করে গুটিয়ে আনতে চেয়েছেন—সময়গত ঐক্য একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এই পরিচ্ছেদটিকে আরো দু'তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে দিলেই মনে হয় সুবিচার হত। অগ্রহায়ণ মাসে বেকার নিষ্কর্মা কুবেরকে নিজের নৌকোয় কাজ দিয়ে হোসেন কুবেরের জীবনের উপর ক্রমশ অধিকার বিস্তৃত করেছে। গোপীর খঞ্জ পায়ের উন্নতি লক্ষণ না ঘটায় রাসুর সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাবও চাপা পড়েছে, যদিও রাসুর সেই ব্যাপারে প্রচেষ্টা বন্ধ হয়নি। হোসেনের নৌকোয় প্রধান মাঝির দায়িত্ব পাওয়ার পর হোসেনের নানা ধরনের প্রকাশ্য গোপন চালানি বাণিজ্য এবং ময়নাদ্বীপের উপনিবেশ সম্পর্কে কুবেরের বহু বিচিত্র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ঘটেছে। ময়না-দ্বীপের জনবসতি ও আদিম আরণ্যক পরিবেশ কুবেরকে হতাশ করলেও

আমিনুদ্দির মতো ময়নাদ্বীপে যাত্রার ঘোরতর বিরোধী ব্যক্তিকেও হোসেন কেমন করে ময়নাদ্বীপে উপনিবিষ্ট করল, সে ঘটনা কুবেরের মধ্যে হোসেনের অপ্রতিরোধ্য প্রভাব ও দুর্জ্ঞেয় ইচ্ছাশক্তি সম্পর্কে ভীতি মিশ্রিত সম্ভ্রমবোধ জাগিয়েছে।

ইতিমধ্যে অস্ত্র চিকিৎসার ফলে গোপী অনেকখানি চলনক্ষম হওয়ায় রাসুর সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব কুবের নাকচ করে দিয়ে হোসেনের ইচ্ছায় হোসেন নির্ধারিত পাত্রের সঙ্গে তার বিবাহ দিয়েছে। আশাভঙ্গের ফলে রাসু কুবেরের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করেছে। গোপীর বিবাহের পর হঠাৎ কুবেরের অনুপস্থিতিতে তার ঘর থেকে প্রতিবেশী পীতম মাঝির চোরাই ঘটি উদ্ধার হওয়ায় কুবের ভীত হয়ে হোসেনের পরামর্শে ময়নাদ্বীপে পলায়ন করতে মনস্থ করেছে। নিয়তির মতো কপিলাও তার সঙ্গিনী হয়েছে। উপন্যাসের কাহিনী এখানেই শেষ হয়ে গেছে।

আগেই বলেছি শেষ পরিচ্ছেদেই কাহিনী জটিলতা পেয়েছে, সময়ের গ্রন্থিতে নানা টুকরো ঘটনায় নাটকীয় হয়ে উঠেছে, যদিচ নাটকীয়তা মানিকের স্বধর্ম নয়। যেন উপন্যাসের শেষাংশ দ্রুত শেষ করেছেন তিনি। হোসেনের যে জালে ধীরে ধীরে কুবের জড়িয়ে পড়ছিল, লেখকের প্রশ্রয়েই হোসেন সেই জালের দড়ি যেন তাড়াতাড়ি টেনে কুবেরকে ধৃত মাছের মতো অদৃষ্টের গলুইয়ে আছড়ে ফেলেছে। হোসেনের নানা অবৈধ বাণিজ্যে ক্রমশ কুবেরের সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়া, গোপীর বিবাহের নানা জটিলতা, কপিলার জন্য কুবেরের ক্রমবর্ধমান বুভুক্ষা গোপীর বিবাহ-উপলক্ষে কপিলার কেতুপুরে আসা, গোপীর সঙ্গে বিবাহভঙ্গের কারণে রাসুর ক্রোধ ও প্রতিহিংসা, এ সবই যেন অপ্রত্যাশিতভাবে হোসেনের স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের আনুকূল্য করেছে। হোসেন সরল নির্বোধ কুবেরের বিশ্বস্ত নিরীহতাকে তার ব্যক্তিগত স্বার্থে নিযুক্ত করেছিল—হঠাৎ সে যেন গোটা কুবেরকেই গ্রাস করার সুযোগ পেয়ে গেছে। পুতুলনাচের ইতিকথা সম্পর্কে পরিণত বয়সে মানিক লিখেছিলেন, "এ বইখানা মানুষকে যারা পুতুলের মতো নাচায় তাদের বিরুদ্ধে দরদী প্রতিবাদ। প্রচণ্ড বিক্ষোভ নয়, স্থায়ী দরদী প্রতিবাদ।" যারা পুতুলের মতো নাচায় বলতে হয়ত তিনি সামন্ততান্ত্রিক সমাজের নির্মম নাগপাশের কথাই বলেছেন—কুবেরকেও অনুরূপ পুতুলের একটি উদাহরণ বলে গ্রহণ করা যায় কিনা, এ কালের পাঠক-সমালোচক সে বিষয়ে সতর্ক হতে পারেন।

কিন্তু মানুষ যে তার বিশেষ কোনো অর্থনৈতিক-সামাজিক পরিবেশে নিয়তির নিরুপায় ক্রীড়নক, সেই নিয়তির দ্বীপেই কুবেরের যাত্রা। হোসেন মিয়াই প্রত্যক্ষ ফলভোগকারী। পদ্মানদীর মাঝি যে-আদিম উপনিবেশে ব্যক্তি স্বার্থ-পরিপোষকতার জন্য বর্বর এক আদিম-কৃষকে রূপান্তরিত হল, তারই ইঙ্গিত দিয়ে পদ্মানদীর মাঝির লেখক কাহিনীর উপসংহার ঘটিয়েছেন। তবু শেষ পর্যন্ত ঘটনার এই আকস্মিক পরিণতিতে হোসেনের আংশিক দায়হীনতা এই উপন্যাসকে কতখানি শ্রেণীগত ঐতিহাসিক রূপান্তরের কাহিনী করেছে, কতটা ব্যক্তিগত ট্রাজেডি করেছে, সে সম্পর্কে সংশয় থেকে যায়।

৫

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে সবচেয়ে জটিল রহস্যময় চরিত্র হোসেন মিয়া। হোসেন মিয়া উপন্যাসে কেতুপুর গ্রামের পদ্মানদীর মাঝিদের বিধিলিপি-রূপে দেখা দিয়েছে। 'সে যা ঘটায় তা সমস্তই স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী'—এই সূত্রের উপরই উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা। উপন্যাসের প্রথম দিকেই আমরা জানতে পারি, নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের পর হোসেন মিয়া কেতুপুরে অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন হয়ে বাস করছে। সে শৌখিন মানুষ, নিত্য নূতন উপায়ে অর্থোপার্জন করে, কিন্তু দরিদ্র মাঝিদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করে ও তাদের উপকারার্থে এগিয়ে আসে—যদিও তার গোপন উদ্দেশ্য সম্পর্কে গ্রামবাসীদের ভীতি ও সংশয় আছে। নোয়াখালির কাছে সমুদ্র মোহনায় একটি অসংস্কৃত আদিম দ্বীপ কিনে তাকে মনুষ্যবসতিপূর্ণ করাই এখন তার মুখ্য স্বপ্ন ও সাধনা। তার এই জমিদারিতে প্রজাপত্তন করবার জন্য নানাভাবে বিপন্ন মানুষকে সে প্রলুব্ধ করে। এই প্রলোভনে ভুলে জেলেপাড়ার রাসুও সপরিবারে একদা সেখানে গিয়েছিল, বেশ কিছুকাল পরে ফিরে এসেছে সর্বস্বান্ত হয়ে, স্ত্রী পুত্র হারিয়ে। রাসুর এই চরম সর্বনাশের ঘটনা গ্রাম-বাসীদের মধ্যে বিক্ষোভ ও ত্রাসই জাগায় কিন্তু হোসেন মিয়ার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ হয়ে ওঠে না। হোসেন মিয়ার কণ্ঠে সর্বদাই দরিদ্র বিপন্নের জন্য সহানুভূতি ও উপকারের আশ্বাস। বুকে হাত দিয়ে স্বভাবসিদ্ধ কণ্ঠে বলে, 'জান দিয়া তোমাগো দরদ করি।'

হোসেন মিয়া ধূর্ত ব্যবসায়ী। নানা চালানের ব্যবসায়ে তার উপার্জন এখন অবিশ্বাস্য, সেই সঙ্গে অফিসের চোরা-চালানেও সে রপ্ত। লেখক একটু একটু করে কুবেরের চোখ দিয়ে হোসেনের সমস্ত বাণিজ্যবৃত্তটাই দেখে

নিয়েছেন। শহরে গরুছাগল চালান দেওয়া তার ব্যবসার অন্যতম প্রত্যক্ষ অঙ্গ, কিন্তু ময়নাদ্বীপে মানুষ চালান দেওয়াই তার সমস্ত বাণিজ্যের পরোক্ষ লক্ষ্য। একটি দ্বীপকে জনপ্রাণীতে পূর্ণ করে তোলার প্রতিজ্ঞায় সর্বপ্রকার অসৎকর্মে তার কোনো দ্বিধাসংকোচ নেই। লোক চরিত্রে তার গভীর অভিজ্ঞতা। নিরীহ সরল কুবেরকে ধীরে ধীরে সাহায্য করে, তাকে চরম দুরবস্থা থেকে উদ্ধার করে, তাকে নিজের নৌকোয় কাজ দিয়ে, ক্রমশ দায়িত্ব দিয়ে, অধিকার ও স্বাধীনতা দিয়ে, হোসেন তাকে প্রায় অলঙ্ঘ্য ফাঁদে বন্দী করে ফেলেছে। প্রকৃতিও তার আনুকূল্য করেছে, পারিপার্শ্বিক ঘটনাও তার ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিতে সহায়তা করেছে। যে আমিনুদ্দি একদা ময়নাদ্বীপে যাওয়ার সমান বিরোধী ছিল, ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত পরিজনহারা সেই আমিনুদ্দিই শেষ পর্যন্ত তার নৌকোয় ময়নাদ্বীপে পাড়ি দিয়েছে। বিনা অপরাধে পুলিশের ভয়ে তাড়িত কুবেরকে ময়নাদ্বীপে আশ্রয় দিতে বিলম্ব করেনি হোসেন মিয়া। তাছাড়া তার অসাম্প্রদায়িক ধর্মচেতনা "মুসলমানে মসজিদ দিলি, হিঁদু দিব ঠাকুর ঘর—না মিয়া, আমার দ্বীপির মধ্যি ও কাম চলব না"[২৯], তার ঔদার্যের পরিচয় নয়, তার স্বার্থ সিদ্ধির উপায় মাত্র। এনায়েতের সঙ্গে বসিরের তরুণী বধূর নিকা দেওয়া, আমিনুদ্দির সঙ্গে নছিবনের বিবাহসংঘটন তার সেই ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনেরই অনুকূল, অর্থাৎ ময়নাদ্বীপে আরো প্রজাসৃষ্টি, আরো সন্তান উৎপাদনের দ্বারা ভবিষ্যৎ অধিবাসীদের সম্ভাব্য সংখ্যাবৃদ্ধি। কপিলার সঙ্গে অসামাজিক সম্পর্কে অন্তরঙ্গ হওয়ার যে বাসনায় কুবেরের মগ্নচৈতন্য বারবার তরঙ্গিত হয়েছে, তাও পরোক্ষে হোসেনেরই প্রভাবজাত। কুবেরের ঘরে পীতমের চোরাই ঘটি পাওয়ার পিছনে হোসেনের কোনো ষড়যন্ত্র আছে কিনা তা স্পষ্ট নয়। মনে হয় ভাগ্যবান হোসেনের অনুকূলেই গেছে ঘটনাটি। হয়ত এতে হোসেনের নিজস্ব কোনো কৃতিত্ব ছিল না।

তবু শেষ পর্যন্ত কয়েকটি প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে যায়। শেষ পর্যন্ত উপন্যাসে লেখকের বক্তব্য স্পষ্ট হয় না। ময়নাদ্বীপে হোসেন মিয়া নতুন যে উপনিবেশ গড়ে তুলতে উদ্যত, সেই কাজে কুবের মাঝি-জীবন থেকে সরে এসে জনমজুরে পরিণত হচ্ছে, এই ইঙ্গিত দিয়ে লেখক বই শেষ করেছেন। তাহলে কি জীবিকার এই পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেওয়াই মানিকের সামাজিক দায়িত্ব হয়ে দেখা দিয়েছে? শরৎচন্দ্রের গল্পে আমিনার হাত

ধরে গফুর ফুলবেড়ের চটকলে কাজ নিয়ে গিয়েছিল। তারাশংকরের উপন্যাসে বাঁশবাদি গ্রাম ভেঙে-চুরে ভূমিনির্ভর কাহাররা চন্দনপুরের কারখানায় কুলিকামিনে পরিণত হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই বাঙলার সামাজিক জীবনে ক্ষয়িষ্ণুতার এই ইতিহাস শুরু হয়েছে। মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত শ্রেণী তার পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি ত্যাগ করে ক্রমশ শ্রমজীবী শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। মানিক কি সেই বৃত্তিবদলের বিবরণ দিতে চেয়েছেন কুবেরকে অবলম্বন করে? হোসেন মিয়া একটি আদিম আরণ্যক লোকবাস-অযোগ্য ভূমিখণ্ডে প্রজাপত্তনের যে উদ্ভট সংকল্প গ্রহণ করেছে তারই চরিতার্থতার বলি হওয়াই কি কুবেরের মতো নিরীহ নিরুপায় পদ্মানদীর মাঝির নিয়তি? এ সব প্রশ্নের কোনো সদুত্তর পাই না আমরা এই উপন্যাসে। কী উদ্দেশ্যে মানিক হোসেন মিয়ার চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, তা পরিষ্কার হয় না। কেউ কেউ হোসেন মিয়ায় প্রবল পুরুষকার খুঁজে পেয়েছেন। তার কণ্ঠের লোকগীত 'বন্ধু কত ঘুমাইবা', তার উক্তি 'খুশ হলি না পারি কী', কম্পাসের কাঁটার দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে দুস্তর দিক্‌চিহ্নহীন সমুদ্র মোহানা পাড়ি দেওয়া, একাগ্রচিত্তে উপনিবেশ গড়ে তোলা—এ সবের মধ্যেই নাকি আছে তার পুরুষকার, তার নতুন সমাজ রচনায় ইঙ্গিত। সে নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণের প্রতিবাদ, সে ক্রূর প্রাকৃতিক শক্তির প্রতিস্পর্ধী। এ ব্যাখ্যা কি সংগত? অর্থাৎ মানিক এই চরিত্র সম্পর্কে যথেষ্ট পরস্পর বিরোধী ইঙ্গিত দিয়েছেন সন্দেহ নেই। হোসেন মিয়া মহৎ না ভিলেন, আমরা ধ্রুব সিদ্ধান্তে দাঁড়াতে পারি না। চরিত্রটিতে তিনি, মনে হয়, যেন মনঃস্থির করতে পারেননি। হোসেন, অতি দীন অবস্থা থেকে আস্তে আস্তে বুদ্ধিমত্তা, চাতুর্য, দূরদৃষ্টি পরিশ্রম ও বাণিজ্যিক মেধার ফলে ভাগ্য পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তাহলে কি সে মার্কেন্টাইল ক্যাপিটালের প্রতিনিধি? 'নিত্য নূতন উপায়ে সে অর্থোপার্জন করে'—এবং উপায়গুলি সর্বদা সৎ নয়, তার মধ্যে গোপনে আফিমের চোরা চালানিও আছে। অথচ সে অমায়িক, পরোপচিকীর্ষু, সহৃদয় মৃদুভাষী, সজ্জন হিতাকাঙ্ক্ষী। তার প্রতি পদ্মানদীর দরিদ্র নির্বোধ মানুষগুলির দূরত্ব ও সম্ভ্রমবোধ আছে, কৌতূহলও আছে ভয়ও আছে। জমিদার অনন্ত তালুকদারের সঙ্গে তার পার্থক্যও লেখক স্পষ্ট করে বলেছেন, যে পার্থক্য ঠিক ব্যক্তিরূপের নয়, শ্রেণীরূপের [৩০]। অথচ আগাগোড়া তাকে ব্যক্তিস্বরূপেই স্বতন্ত্র করে চিনে নিতে হয়। "যে শত্রু, যে তাহার

ক্ষতি করে, শাস্তি সে তাহাকে নির্মমভাবেই দেয়, কিন্তু তাহাকে কেহ কোনদিন রাগ করিতে দেখিয়াছে বলিয়া স্মরণ করিতে পারে না।" তার কাছে উচ্চনীচের ভেদ নেই, অথচ জেলেপাড়ার কেউই তার আন্তরিকতাকে বিশ্বাস করে না। অথচ তার বিরুদ্ধে কারো কোনো প্রকাশ্য ক্ষোভ নেই, প্রতিবাদ নেই, বিদ্রোহ নেই।" "হোসেন মিয়া হাসিমুখে একেবারে বাড়ির ভিতরে গিয়া জাঁকাইয়া বসিয়া গোপনে তাহার গভীর ও দুর্জ্ঞেয় মতলব হাসিলের আয়োজন আরম্ভ করিলেও জেলেপাড়ায় এমন কেহ নাই যে তাহাকে কিছু বলিতে পারে।"[৩১] হোসেন মিয়া তাই একটি অপ্রতিরোধনীয় শক্তি, জেলেপাড়ার একটি আমোঘ নিয়তি, ডকটর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় 'তাহাদের বিধাতা-পুরুষ'।[৩২] অথচ এই হোসেন যখন কুবেরের ঘরে বর্ষার রাত কাটায়, সকালে 'শোয়ানো আকাশের তলে দীনা পৃথিবী'কে দেখে লোকসংগীত রচনা করে, তখন তার স্বভাবের মধ্যে এমন কিছু পাই, যা পরবর্তী হোসেনের সঙ্গে মেলে না। দুই হোসেনের মধ্যে সংগতি পাওয়া যায় না।

সমস্যা ময়নাদ্বীপকে নিয়েও। মনুষ্যবাসের অযোগ্য একটি দ্বীপে জনবসতির জন্য হোসেনের দুঃসাধ্য চেষ্টা কি লেখকের কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা? হোসেন এই একটি ব্রতে তার জীবনের সমস্ত প্রয়াস নিয়োজিত করেছে, লেখক কি তা সমর্থন করেন? এই ব্যাপারে ঔপন্যাসিকের নিজস্ব অভিমত কী? হোসেনের দ্বীপ-বিষয়ক সাধ-আহ্লাদের যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন, তা এত নিরাসক্ত যে, লেখকের মনোভাব অনুমান করা যায় না। লেখকের বর্ণনার ভাষা হোসেনের মুখের তর্জমারূপে প্রকাশ পেয়েছে মাত্র—

"হোসেনের মুখে ময়নাদ্বীপের কথা কুবের কখনো শোনে নাই, আজ হোসেন বলিতে থাকে ও দ্বীপটির জন্য তার দরদ। নীলামে দ্বীপটি কিনিবার পর ওখানে জনপদ বসানোর স্বপ্ন দেখিতেছে সে, জীবনে আর তার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নাই, কামনা নাই—হাজার দেড়েক মানুষ ওখানে চলাফেরা করিতেছে, এক বিঘা জমিও দ্বীপের কোনখানে অকর্ষিত নাই, মরিবার আগে এইটুকু শুধু সে দেখিয়া যাইতে চায়। কত অর্থ ও সময় ব্যয় করিয়াছে সে দ্বীপের পিছনে। ময়নাদ্বীপের নেশা পাইয়া না বসিলে আজ তো সে বড়লোক—একসঙ্গে তাহার এতগুলি লাভবান ব্যবসা দাঁড়াইয়া

গিয়াছে যে ভাবিতে বসিলে আল্লার করুণার পরিচয়ে মাথা নত হইয়া আসে। হ, ময়নাদ্বীপ ব্যাপিয়া একদিন মানুষের জীবনের ঢেউ বহিবে বলিয়া যে কাজে হোসেন হাত দেয় সেই কাজ খোদাতালা সফল করিয়া দেন।"[৩৩]

আবার অন্যান্যদের ধারণা থেকেও দ্বীপটির ভিন্ন এক বর্ণনা সংগ্রহ করা যেতে পারে। কুবেরের মানসিকতাকে ভাষা দিয়েছেন লেখক এইভাবে—

"এই নীচু জলা ও জঙ্গলপূর্ণ মনুষ্যবাসের অযোগ্য দ্বীপ ধান ছাড়া আর কোন ফসল যে দ্বীপের লোনা মাটিতে জন্মে না, লাউ-কুমড়াগুলি ফলে কুঁকড়ানো শশার মত ছোট ছোট,—এখানে এই মুষ্টিমেয় নরনারীর বসতি স্থাপন করাও হোসেন মিয়া ছাড়া আর কারো দ্বারা সম্ভব হইত না।"[৩৪]

"ম্যালেরিয়া ও সাপের সঙ্গে লড়াই করিয়া কখনো হোসেন জয়লাভ করিতে পারে নাই, জঙ্গলের সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম চলিয়াছে; অনেক খাদ্য এখানে উৎপন্ন করা যায় না, জীবনের অনেক প্রয়োজন মিটাইতে সমুদ্রপথে পাড়ি দিতে হয় সভ্য জগতের দিকে। অবিশ্রাম খাটুনি এখানে, অসংখ্য অসুবিধা এখানে, জীবন এখানে নির্মম ও নীরব। রাসুর মত অনেকে তাই পলাইয়া গিয়াছে।"[৩৫]

"এ কি কদর্য একটা দ্বীপ হোসেন বাছিয়া লইয়াছে?"[৩৬]

"দ্বীপ দেখিয়া আমিনুদ্দি ও রসুল বড় দমিয়া গিয়াছে।"[৩৭]

"এই দ্বীপটির সৃষ্টির দিন হইতে যে বনভূমি কুমারী তার বুকের এক খাবলা মাংস যেন সকলে ছিনাইয়া লইয়াছে, চারিপাশে নিবিড় বনের মাঝখানে পরিষ্কৃত স্থানটুকু এমনি বীভৎস দেখায়।"[৩৮]

আরো মনোযোগ দিলে দেখা যাবে, হোসেন তার ময়নাদ্বীপে লোক-সংখ্যা বাড়ানোর জন্য এমন একটি ব্যবস্থা নিয়েছে যেখানে পুরুষ ও নারীর স্বাধীন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। উপন্যাসে এই অংশটি খুব সতর্ক। মানুষকে শুধু অর্থ জমি ও গৃহই নয়, নারীও দিচ্ছে—"গৃহ ও নারী, অন্ন ও বস্ত্র, ভূমি ও স্বত্ব, সবই তো পাইলে তুমি, এবার শুধু খাটিবে ও জন্ম দিবে সন্তানের, এটুকু পারিবে না?"[৩৯]

হোসেনের এই পরিকল্পনাকে কি আমরা নিষ্ঠুর না চতুর বলব? "আমিনুদ্দি অপরিশোধ্য আর্থিক ঋণেই শুধু আবদ্ধ নয়, হোসেন না দিলে এ জীবনে স্ত্রী কি আর তাহার জুটিত,—নছিবনের মত স্ত্রী?"[৪০] বৃদ্ধ

বসিরের সঙ্গে পাঁচ বছরের বিবাহিতা জীবনে যে স্ত্রী সন্তান উৎপাদন করতে পারেনি। তাকে বসিরের কাছ থেকে ছিন্ন করে এনে হোসেন শক্ত-সমর্থ জোয়ান এনায়েতকে উপহার দেবে। তারপর "শীঘ্রই সে হোসেনকে উপহার দিবে আনকোরা নতুন মানুষ—ময়নাদ্বীপের এক টুকরা ভবিষ্যৎ। তবুও আরও একটা বৌ হোক এনায়েতের, সার্থক হোক দুজনের অন্যায় অসামাজিক প্রেম, পাঁচ বছরে যে রমণী জননী হইতে পার নাই, তার কোল জুড়িয়া আসুক সন্তান, মানুষ বাড়ুক হোসেনের সাম্রাজ্যে।"[৪১]

অনুমান করা যায়, কুবেরের সঙ্গে কপিলার যে ঘনিষ্ঠ রহস্যময় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, হোসেনের পক্ষে মনোযোগ সহকারে সেটি লক্ষ্য করা সম্ভব। কপিলার জন্য কুবেরের সুপ্ত কামনা ময়নাদ্বীপের অভিজ্ঞতাই বাড়িয়ে দিয়েছে। এনায়েতের প্রতি ঈর্ষা অনুভব করেছে কুবের—

"হোসেনের কল্যাণে কদিন পরে মিলনও তাদের হইবে—প্রকাশ্য সামাজিক আইন-সংগত মিলন। কী আশ্চর্য ভাগ্য লইয়া এক-একটা লোক জন্মায় জগতে!...আধ-জাগা আধ-ঘুমানো অবস্থায় সে [কুবের] স্বপ্ন দেখিতে থাকে, রচনা করিয়া চলে আকাশকুসুম। সর্বশক্তিমান হোসেনকে সে যেন বলিয়াছে, কপিলাকে পাইলে সপরিবারে সে ময়নাদ্বীপে গিয়া বাস করিবে—গণেশকেও বলিয়া সে রাজী করিবে যাইতে। হোসেন তাহার চিরন্তন হাসি হাসিয়া যেন বলিয়াছে, তাই করুম কুবির বাই, তাই করুম—আইনা দিমু কপিলারে।"[৪২]

কুবেরের এই অর্ধজাগর মানসচিন্তাই ঘটনাচক্রে সত্য হয়ে উঠেছে এবং হোসেন মিয়া তার পূর্ণসদ্‌ব্যবহার করেছে। ইতিপূর্বেই আমরা জেনেছি, "রসুলকে জেলের দুয়ার হইতে ছিনাইয়া নিয়া আসিয়াছে হোসেন, দেশে ফিরিলে জেলেই হয়ত তাহাকে ঢুকিতে হইবে।"[৪৩] কুবেরও সেই একই ছকে প্রবেশ করল। রাসু কিংবা যেই হোক, কুবেরকে পুলিশের সন্দেহের তালিকায় যখন ফেলেছে তখন কুবেরের নিস্তার নেই। এখন পন্থা তো একটিই—"ময়নাদ্বীপি যাবা কুবির? চুরি আমি সামাল দিমু!" বিকল্প এখন জেল খাটা। কিন্তু কুবের জানে, "হোসেন মিয়া দ্বীপে আমারে নিবই কপিলা। একবার জেল খাইটা পার পামু না। ফিরা আবার জেল খাটাইব।"[৪৪]

অতএব ময়নাদ্বীপে তাকে যেতেই হবে এবং সেই অসময়ে তার একমাত্র

সঙ্গিনী যদি হয় কপিলা তাহলে আর শঙ্কা কোথায় সংকোচই বা কী—
"হ, কপিলা চলুক সঙ্গে। একা অতদূরে কুবের পাড়ি দিতে পারিবে না।"
থাকনা পড়ে পদ্ম মালা. পুত্র-সংসার ঘরবাড়ি। পদ্মানদীর মাঝি শেষ পর্যন্ত ময়নাদ্বীপের যাত্রীতে রূপান্তরিত হল।

কিন্তু এতে লেখকের কোন্ গূঢ় উদ্দেশ্য সাধিত হল, এই প্রশ্নটিই আমাদের কিছু উদ্‌ভ্রান্ত করে। আমরা বুঝে উঠতে পারি না হোসেনের এই নিষ্ঠুর হৃদয়হীন জাল বিস্তারকে কীভাবে ব্যাখ্যা করব। বরং বিশ্বাস করতে হয়, হোসেন মিয়া মানিকের অব্যবস্থিতচিত্ততা মাত্র. চরিত্রটি সম্পর্কে যথার্থই তিনি মনঃস্থির করতে পারেননি।

---

১. দ্র. দর্শনের পটভূমিকায় মানিক, রুদ্রদেব মিত্র ; 'বর্ণমালা' মানিক স্মরণ-সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৮৫। সম্পাদক শীতলচন্দ্র ঘোষ ও অরুণকুমার রায়।

২. "টাঙ্গাইলে থাকার সময় মাঝে মাঝে ও বেরিয়ে যেত মাঝিমাল্লার সাথে, চার-পাঁচদিন পরে বাড়ি ফিরত, ওদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকত, অনেকদিন সকাল থেকে ওখানেই পড়ে থাকত, তারপর একদিন লিখল পদ্মানদীর মাঝি।"

মানিকের 'সেজদা' শ্রীহিমাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে বর্ণমালা-সম্পাদক পূর্বোক্ত সংখ্যায় এই সংবাদটি মুদ্রিত করেছেন। পৃ. ১০৯, বর্ণমালা, মানিক স্মরণ-সংখ্যা।

৩. টাঙ্গাইলে ছোটবেলা কাটালেও পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায় মানিক খুব রপ্ত হতে পারেননি মনে হয়। পদ্মানদীর মাঝি-তে উপভাষা-ঘটিত কিছু অসংগতির দিকে কেউ কেউ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ ভাষাও মানিককে জেনে লিখতে হয়েছিল। পূর্ববর্ণিত মানিকের সেজদার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণে আছে, "মাঝে মাঝে দেখতাম আমার স্ত্রীর কাছে কোন কথা বাংলাদেশীয় টানে কিভাবে উচ্চারিত হয় তা জেনে নিচ্ছে—ওঁর লেখার জন্য।" পৃ. ১০৯, বর্ণমালা মানিক স্মরণ-সংখ্যা।

৪. দ্র. বর্তমান লেখকের 'নিশ্চিন্দিপুর বাশবাদি বাগদিপাড়া' নামক প্রবন্ধে বিভূতি-তারাশঙ্কর ও মানিকের তুলনামূলক আলোচনা, শারদীয় সত্যযুগ ১৩৮২।

৫. আর এম ম্যাক আইভার তাঁর 'কমিউনিটি' গ্রন্থে (লণ্ডন ১৯২৪, পৃ: ৬) বলেছেন—

A community is a focus of social life, the common living of social beings, an association is an organisation of social life, definitely established for the pursuit of one or more common interests. An association is partial, a community is integral···within a community there may exist not only numerous associations but also antagonistic associations.

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে একটি কমিউনিটির জীবনাভাস মানিক দিতে চেয়েছেন সে কথা মিথ্যা নয়। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদটি এখানে উদ্ধারযোগ্য :

"পদ্মায় ইলিশমাছ ধরার মরশুম চলিয়াছে। দিবারাত্রি কোন সময়েই মাছ ধরিবার কামাই নাই। সন্ধ্যার সময় জাহাজঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায় নদীর বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জেলে-নৌকার আলো ওগুলি।···এক সময় মাঝ রাত্রি পার হইয়া যায়।···শেষরাত্রে ভাঙা-ভাঙা-মেঘে-ঢাকা আকাশে ক্ষীণ চাঁদটি উঠে। জেলে-নৌকার আলোগুলি তখনো নেভে না। নৌকার খোল ভরিয়া জমিতে থাকে মৃত সাদা ইলিশ মাছ।"···

···"নৌকাটি বেশী বড় নয়। পিছনের দিকে সামান্য একটু ছাউনি আছে। বর্ষা-বাদলে দু-তিনজনে কোন মতে মাথা গুঁজিয়া থাকিতে পারে। বাকি সবটাই খোলা। মাঝখানে নৌকার পাটাতনে হাত দুই ফাঁক রাখা হইয়াছে। এই ফাঁক দিয়া নৌকার খোলের মধ্যে মাছ ধরিয়া জমা করা হয়। জাল ফেলিবার ব্যবস্থা পাশের দিকে। ত্রিকোণ বাঁশের ফ্রেমে বিপুল পাখার মত জালটি নৌকার পাশে লাগানো আছে। জালের শেষ সীমার বাঁশটি নৌকার পার্শ্বদেশের সঙ্গে সমান্তরাল। তার দুই প্রান্ত হইতে লম্বা দুটি বাঁশ নৌকার ধারে আসিয়া মিশিয়া পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া নৌকার ভিতরে হাতদুই আগাইয়া আসিয়াছে। জালের এ দুটি হাতল। এই হাতল ধরিয়া জাল উঠানো এবং নামানো হয়। গভীর জলে বিরাট ঠোঁটের মত দুটি বাঁশে বাঁধা

সঙ্গিনী যদি হয় কপিলা তাহলে আর শঙ্কা কোথায় সংকো[illegible]
"হ, কপিলা চলুক সঙ্গে। একা অ[illegible]
থাকনা [illegible]

[illegible] দেখোয়। কিন্তু মানিক তো অপ্রাসঙ্গিক অবান্তর বিষয়ের কণামাত্র ব্যবহার করেন না। আসলে ঐ গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের জীবনের চারদিকগুলো দেখানোই তাঁর উদ্দেশ্য। কারণ, সমুদ্রগামী জেলেদের জীবনে নৌকোর ভূমিকা কী এই নিয়ে একটি সমাজবিজ্ঞানী আলোচনায় দেখতে পাচ্ছি অনুরূপ ব্যাখ্যান—

The ship or fishing vessel does provide a rhythmic or cyclical pattern in the life of the community. Its sailings and arrivals, the pattern of work to be done, and the organisation of the crew form the basic for the social structure of the ship as community and for the social system ashore. (Seafarer & Community, ed by Peter H Fricke, Croom Heleu, London 1973. পৃ. ৩)

৬. পৃ. ৯
উপন্যাসে উদ্ধৃতিগুলি গৃহীত হয়েছে বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রকাশিত পদ্মানদীর মাঝির ত্রয়োদশ মুদ্রণ (১৩৭৫) থেকে।

৭. পৃ. ১১

৮. ঐ

৯. পৃ. ১৫

১০. পৃ. ৩৯

১১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের ভাষা তথা গদ্যরীতি নিয়ে একটি সন্ধানী বিশ্লেষণ করেছেন চিত্রা দেব তাঁর 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্যরীতি' নামক সুলিখিত প্রবন্ধে ; বর্ণমালা পূর্বোক্ত সংখ্যা দ্রষ্টব্য। তিনিই প্রথম দেখিয়েছেন, মানিকের গদ্যভাষা ভাবের ভাষা নয়, 'ভাবনার ভাষা'। নানা উদাহরণ বিশ্লেষণ করে লেখিকার সিদ্ধান্ত, 'ঝঙ্কারহীন শাব্দিকবিলাসশূন্য একটি নির্ভীক নিস্তাপ ভাষারীতি সৃষ্টি করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আবার প্রমাণ করলেন গদ্যরীতি লেখকের

[illegible] নিজস্ব ভাবনার ফসল, স্বাতন্ত্র্যের ছাপ মুদ্রিত না হলে কোন [illegible] সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না' (পৃ. ৪১, বর্ণমালা পূর্বোক্ত [illegible])।

১২. পৃ. ২

১৩. পৃ. ৭

১৪. পৃ. ১১

১৫. পৃ. ৫৫

১৬. পৃ. ৬৬

১৭. পৃ. ৫২

১৮. পৃ. ৫৬

১৯. পৃ. ৮৯

২০. পৃ. ৫৬

২১. দ্র. ১৫ নং পাদটীকা

২২. পথের পাঁচালী, মিত্র ও ঘোষ পেপার ব্যাক সংস্করণ, ৪র্থ মুদ্রণ ১৩৮৬, পৃ. ২২২

২৩. পৃ. ৭৩

২৪. পৃ. ২০

২৫. পৃ. ৪৪

২৬. পৃ. ৩৬

২৭. পৃ. ৩৪

২৮. 'কাগজ' পত্রিকার মানিক-সংখ্যায় (২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, সাল বা মাসের উল্লেখ নেই) প্রকাশিত মানিকের গ্রন্থপঞ্জী অনুযায়ী এগুলি প্রকাশের কাল—দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫), পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬), ধরাবাঁধা জীবন (১৯৪১), শহরবাসের ইতিকথা (১৯৪৬), আদায়ের ইতিহাস (১৯৪৭), প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান (১৯৫৬)।

২৯. পৃ. ১২০

৩০. মেজবাবু বা মেজকর্তা অনন্ত তালুকদার উপন্যাসে উল্লিখিত হয়েছেন কয়েকবার, তাছাড়া নেপথ্যবর্তী। এই মানুষটির চরিত্রের প্রতি ছিদ্রান্বেষী গ্রামবাসীদের লঘু সরস কটাক্ষের ইঙ্গিত আছে। কুবেরের

গৃহে তার গোপন যাতায়াত এবং 'কালো কুষ্ঠি' কুবেরের 'ধলা' পুত্র-সন্তান জন্মের রহস্য নিয়ে প্রতিবেশীদের কুৎসিত ইঙ্গিত কুবের একাধিকবার শুনেছে। এই মেজকর্তার নৌকোয় মালার আমিনবাড়ি যাওয়ার ঘটনায় কুবের নিজেও অগ্নিশর্মা হয়ে মালাকে লাঞ্ছিত করেছে। কিন্তু মেজবাবুর সঙ্গে মালার যে কোনো অশালীন সম্পর্ক নেই, সে বিষয়ে কুবেরের বিশ্বাসের অভাব ছিল না। অনন্তবাবু থাকেন প্রধানত কলকাতায়, তবে কুবেরের চিন্তার সূত্রে আমরা জানতে পারি, একদা গ্রামের উন্নয়নের আদর্শবাদী তাড়নায় তিনি গ্রামবাসীদের অন্তরঙ্গ হতে চেয়েছিলেন। "কী পাগলামি মেজবাবুর আসিয়াছিল কে জানে, জেলেপাড়ার মানুষগুলির সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়ার জন্য, সময় নাই অসময় নাই আসিয়া হাজির হইতেন, বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া দেশের নাম করিয়া কী যেন সব বলিতেন দুর্বোধ্য কথা।"

জেলেপাড়ার মাঝিদের কাছে মেজবাবু তার শ্রেণীদূরত্ব দূর করতে পারেননি, যেমন হোসেন পেরেছে। বোঝাই যায়, হোসেন চরিত্রের বিশিষ্টতা প্রমাণের জন্যই লেখক মেজবাবুর সঙ্গে তার তুলনা করেছেন। মেজকর্তা তো জমিদার ফিউডাল-তন্ত্রের প্রতিনিধি। আর হোসেন তো নয়া উপনিবেশবাদ চালু করতে চলেছে। তার শোষণের পদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক্। লেখক এই ব্যাপারে কতটা সতর্ক তার প্রমাণ তিনি নিজেই দিয়েছেন—

"মেজবাবু তো হোসেন মিয়া নন। দুর্নীতি, দারিদ্র্য, অন্তহীন সরলতার সঙ্গে নীচু স্তরের চালাকি, অবিশ্বাস ও সন্দেহের সঙ্গে একান্ত নির্ভয়, অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে ধর্মকে অনায়াসে সহিয়া চলা—এসব যাদের জীবনে একাকার হইয়া আছে, পদ্মার বুকে নৌকা ভাসাইয়া যারা ভাবুক কবি, ডাঙায় যারা গরীব ছোটলোক, মেজবাবু কেন তাদের পাত্তা পাইবেন? ওকাজ হোসেন মিয়ার মত মানুষের পক্ষে সম্ভব, মেজবাবুর চেয়ে বেশী টাকা রোজগার করিয়াও যার মাঝিত্ব খসিয়া যায় নাই।" পৃ. ৭৭, ১৩৪, ১৬৩ দ্রষ্টব্য।

৩১. পৃ. ২৫

৩২. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ৫ম সং, ১৩৭২, পৃ. ৫১৭

৩৩. পৃ. ১২০

৩৪. পৃ. ১২৫
৩৫. ঐ
৩৬. ঐ
৩৭. পৃ. ১২৬
৩৮. পৃ. ১২৭
৩৯. পৃ. ১২৬
৪০. ঐ
৪১. পৃ. ১৩০
৪২. পৃ. ১৩৬
৪৩. দ্র. ৩৭ নং পাদটীকা
৪৪. পৃ. ১৩৮

গল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত

যিনি বিশ্বাস করেন না জীবনটা আকস্মিকের মালাগাঁথা, সাহিত্যে তাঁরই প্রকাশ্যে আবির্ভাব আকস্মিক, অপরের তাড়নায়। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে মানসিকতা তাঁর রচনায় ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়েছে, সেখানে বাজি রেখে কোনো কিছু করার কালাপাহাড়ী বাহাদুরি নেই, আছে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, নিপুণ বিশ্লেষণ, বৈজ্ঞানিকের ধৈর্য স্থৈর্য ও অধ্যবসায়। মনের ল্যাবরেটরিতে চরিত্রের শেষ পর্যন্ত পরিণতি, মানসিক ক্রিয়ার চরম বিকৃতি অনুবীক্ষণে দেখে যেন তার ফলাফল লিখে রাখেন। বিজ্ঞানীর সেই নিরীক্ষালিপিই তাঁর গল্প। তাই মোহ জমানো নয়, মোহভঙ্গই তাঁর লক্ষ্য। অতসীমামী, প্রাগৈতিহাসিক থেকেই তিনি এ্যান্টিরোমান্টিক। আবহপ্রধান গল্প যেখানে লিখেছেন (যেমন হলুদ পোড়া) সেখানেও রোমান্টিক চিত্তবৃত্তি মানিকবাবুর গল্পবস্তু নয়। বিজ্ঞানীর নিরীক্ষায় অসংখ্য প্রাণীকে প্রাণ দিতে হয় সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে, অসংখ্য গল্পেও মানিকবাবু প্রবৃত্তিদাস সংস্কারদাস অর্থদাস মানুষকে এক একটি শ্বাসরুদ্ধ পরিবেশে রেখে দেখিয়েছেন—তারা কত অসহায়, মৃত্যুমুখে তারা কেমন ছটফট করে। দুর্বল স্থানে তিনি নিষ্ঠুর শিল্পী। সমাজের ক্ষতে শরৎচন্দ্রীয় স্নেহ প্রলেপ নয়, শক-থেরাপির নিরাময়পন্থাই তাঁর নীতি। বিশেষত প্রথম পর্বে।

সময় ও ভাবের দিক থেকে তাঁর গল্পগুলির তিনটি পর্ববিভাজন করা যেতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত রচনাবলী প্রথমপর্ব। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ কালোবাজারে সঙ্কটাপন্ন জীবনের ছবি, মূল্যবোধের অবলোপ দ্বিতীয় পর্বের আলোচ্য। ৪৭-এর দেশভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কালের গল্প উপন্যাস তৃতীয় পর্ব। অতসীমামী (১৯৩৫), প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭), মিহি ও মোটা কাহিনী (১৯৩৮), সরীসৃপ (১৯৩৯) প্রথমপর্বের অন্তর্গত। দ্বিতীয় পর্বে পাই বৌ (১৯৪৩), সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩), ভেজাল (১৯৪৪), হলুদপোড়া (১৯৪৫), আজ কাল পরশুর গল্প (১৯৪৬), পরিস্থিতি (১৯৪৬)। তৃতীয় পর্বে আছে খতিয়ান (১৯৪৭), মাটির মাশুল (১৯৪৮), ছোট বড়

(১৯৪৮), ছোট বকুলপুরের যাত্রী (১৯৪৯), ফেরিওয়ালা (১৯৫৩), লাজুকলতা (১৯৫৪) এবং অন্যান্য গল্প তৃতীয় পর্বের অন্তর্ভুক্ত।

বলা বাহুল্য এই স্তর বিভাগ আত্যন্তিক নয়, আলোচনার সুবিধার্থে গ্রন্থাকারে প্রকাশের কালই এখানে ধরা হয়েছে। রচনাকাল কিছু পূর্ববর্তী। দ্বিতীয় স্তরের মনোভঙ্গি, গল্পপ্রকরণ, জীবনভাষ্য তৃতীয় স্তরেও বিদ্যমান এবং প্রথম পর্বের মনোবিকলনীবৃত্তি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কখনো ত্যাগ করতে পারেননি। অবশ্য মধ্যবিত্ত জীবনের মোহ, রোমাণ্টিক ভাববিলাস, অন্তঃ-সারশূন্য ভদ্রতা, মূল্যবোধের অহমিকা সম্বন্ধে তিনি চিরকালই নিরাসক্ত। কঠোর বিদ্রূপাঘাতে বীভৎস রসের শিহরণে তিনি এর মর্মোচ্ছেদ প্রয়াসী। আবার আপাতবিচারে যে চোর সে প্রকৃত চৌর্য-অপরাধী নয়, এই বিবেচনাও প্রথম পর্বে অভিব্যক্ত। জীবনজিজ্ঞাসার বিবর্তনেই মানিকবাবু মার্কসবাদে দীক্ষা নিয়েছেন। বাইরের চাপে বা মতবাদের সুযোগ-শিকারের জন্য নয়, তাঁর শিল্পৈষণাই তাঁকে নিয়ে গেছে সমাজপঙ্কিলতার গভীরে, অবচেতনের গহনলোকে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীমোহ ছেড়ে সংগ্রামী জনগণের শিবিরে। এই বিবর্তন শিল্পীমানসেরই আত্মপ্রসারের ফল। 'ভেজাল'-এ আছে জীবনের বাঁ-দিকের নগ্ন ভয়ঙ্কর চেহারা। হয়ত ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় সঙ্কুচিত হয়ে উঠবে। কিন্তু একে অলীক, অসত্য বলারও সাহস পাই না। নির্মম, বীভৎস হলেও এ আত্মদর্শনে পাপ নেই।

কিন্তু সত্য কি শুধু অসুন্দর, মন কি শুধু অবচেতন? এই জিজ্ঞাসারই উত্তর সন্ধানে তাঁর সারস্বত সাধনায় তৃতীয় পর্বের সূচনা। প্রথমপর্বে নর-নারীর বিচিত্র জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তাঁর সকৌতুক আগ্রহে মানবপ্রীতির অপরিশুদ্ধ প্রকাশ। খণ্ডিত চেতনার আলোয় তখন মনে হয়েছে মানসিক বিকৃতিই সত্য। তাঁর প্রতিভা যে অন্তর্মুখী, তাঁর জীবনজিজ্ঞাসা যে গভীর —তার প্রমাণ তিনি সেখানেই থামেননি। জনকল্লোলের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছেন, গণজীবনের আসন্ন উৎক্রান্তির স্বপ্নে হয়েছেন আশাবাদী। নতুবা ফ্রয়েড ও মার্কস জীবনের দুই বিপরীত মেরু, এক পথ থেকে অন্যটিতে স্বাভাবিক উত্তরণের কোনো সড়ক নেই। এখানেই জগদীশ গুপ্তের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিলক্ষণতা

মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও বিচিত্র মনোলোক

"মিথ্যার শূন্যকে মনোরম করে উপভোগ করার নেশায় মরমর এই

সমাজের (মধ্যবিত্ত) কাতরানি গভীরভাবে মনকে নাড়া দিয়েছিল। ভেবে-ছিলাম, ক্ষতেভরা নিজের মুখখানাকে অতি সুন্দর মনে করার ভ্রান্তিটা যদি নিষ্ঠুরের মত মুখের সামনে আয়না ধরে ভেঙে দিতে পারি সমাজ চমকে উঠে মলমের ব্যবস্থা করবে।"

মানিকবাবুর গল্পপ্রেরণায় একটা দিশা পাওয়া গেল। এখানেই দ্বিতীয় পর্বের সূচনা। 'সমুদ্রের স্বাদ' গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৪৩, ভূমিকার রচনা-কাল ১৯৪৫। এর মধ্যে তাঁর আরো দুটি গল্পগ্রন্থ ও দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে।

'অতসীমামী', 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পগুচ্ছ বহু আলোচিত; তাই এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল। মানুষের আদিম বন্যতার বলিষ্ঠ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে শক্তিমান পর্যবেক্ষকের হাতে। মুখোশ খোলার ব্রত তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। তিনি এত সত্যব্রত যে সেই আবরণ উন্মোচনে সৃষ্টি হয়েছে কুশ্রী বীভৎস জগৎ। অতসীমামীর মৃত স্বামীর স্মৃতিপূতস্থানে বাঁশি বাজানো 'ভাবের আবেগে গলে যেতে ব্যাকুল' মধ্যবিত্ত নারীর 'নোংরা রোমান্টিকতা'। প্রাগৈতিহাসিকে পাই আদিম জৈব ক্ষুধার দুঃসহ বাস্তব চিত্র। আজ দগ্‌দগে ঘা হলেও একদিন পেহ্লাদ বাগ্দীর বাহুতেও মরদের শক্তি ছিল। লাঠি সড়কির ঘায়ে অনেক গোটা মানুষ দু-টুকরো হয়ে তারই চোখের সামনে হয়ত বার কয়েক নড়ে উঠে চিরকালের মতো শান্ত হয়ে গেছে। তাই ভিক্ষুক পেহ্লাদের রক্তও উষ্ণ হয়। জমিদারের মতো জমিদারের পাইকেরও রক্তে দোষ আছে। চাঁদনী রাতে প্রতিদ্বন্দ্বীর মাথায় আমূল বসিয়ে দিয়েছে একটা লোহার শিক। যেন আধমরা হয়ে চীৎকার করে আবার আপদ না বাড়ায়। পিঠে করে পরম যত্নে সে বয়ে নিয়ে চলল তার কাম্য দেহটাকে। যেমন মাংসাশী নিয়ে যায় পণ্য মাংস। কোনো প্রখ্যাত সমালোচকের মতে, 'প্রাগৈতিহাসিক'-এর মধ্যেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনবাদের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু বর্ণনা যতই বলিষ্ঠ আর বীভৎস রসের আশ্চর্য সৃষ্টি হোক, এখানেই মানিকবাবু জীবনের বৃত্ত রচনা করলে তাঁকে মহৎ শিল্পী বলা যায় না। এই ভ্রান্তি থেকেই পরবর্তী প্রগতিশীল লেখকদের গল্পে নিতান্ত নিম্নমুখী নক্কারধর্মিতার কিছু কিছু প্রশ্রয় আছে। তাঁদের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহ্যবাহী বলার প্রবণ-তাটিই সবচেয়ে মারাত্মক।

সরীসৃপ-গল্পমালার সবচেয়ে ক্লেদপঙ্কিল গল্প 'সরীসৃপ'। চারু ও পরী দুই বোন। 'চারুর পুরানাম, চারুদর্শনা, পরীর পুরানাম পরীরানী।' বনমালী চারুর চেয়ে দু'বছরের ছোট, আলাপ কৈশোরের। চারু তখন বিকলাঙ্গ স্বামীর স্ত্রী, জড়বুদ্ধি ভুবনের মা। বনমালী শ্বশুর রামতারণের মোসাহেবের ছেলে। ঘটনাচক্রে রামতারণের সম্পত্তি বিক্রী হল। বনমালীরই কাছে। অবশ্য বসবাসের অধিকার ছিল চারুদর্শনার। তখন 'একজন প্রৌঢ়া নারী এবং অপরজন পাটের দালাল।' নিমন্ত্রণে মধুভাষণে চারু বনমালীকে হাত করতে চায়। প্রখর বৈষয়িক বুদ্ধি এখন তারও মাথায়, পূর্বের সে সরল চারু আর নেই। তাই সে কথা প্রসঙ্গে বাড়িটা বিক্রি করে ঋণ মিটিয়ে বাকি টাকা দিয়ে দিতে বললে। ব্যবসায়ী বনমালীরও মুখ শুকোয়, সে হাতে ভাতের গ্রাস নিয়ে স্তব্ধ। কিন্তু আসল গল্প সুরু হল বিধবা পরী পুত্র সমেত যখন দিদির আশ্রয়ে এল। ওদিকে চারুর চাতুর্য আশঙ্কা করে বনমালীও তার বাড়ি ভাড়া দিয়ে মা হেমলতাকে নিয়ে উঠলেন চারুর বাড়ি। কেউ হারবে না। পূর্বে সামান্য ঈর্ষ্যা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জিগীষার মধ্যে যার প্রকাশ ছিল সীমিত, তারই নগ্ন, পিচ্ছিল সরীসৃপ-সত্তা দেখা গেল। বনমালীর পক্ষপাত, আশ্রয়, সাহায্য চাই দু'বোনের। দিদির বাড়ি হলেও পরী জানে প্রকৃত আশ্রয়দাতা কে? চারু ভুবনের ভবিষ্যতের জন্য বনমালীকে মিষ্ট কথা ও সাহচর্য দিত। কিন্তু পরী? সে বনমালীর চারিদিকে এমন মোহের বৃত্ত রচনা করল, যার পরিধির বাইরে চারুর ব্যর্থ কান্না—ভিতরে তার প্রবেশাধিকার নেই। চারুর মাতৃসত্তা, পরীর অতৃপ্ত জৈবক্ষুধা বনমালীকে সদা তুষ্ট রাখতে ব্যস্ত। জীবনসংগ্রামের রূপটিও শত কুটিলতার মধ্যে সত্য। সংক্ষেপে ক্রুর বাস্তবের এমন নিরাসক্ত ছবি বাংলা সাহিত্যে বেশি নেই।

চারু তারকেশ্বরে গিয়ে প্রতিদিন কামনা করত পরীর মৃত্যু। শেষে তারকেশ্বর সদয় হলেন। অন্য যাত্রিণী বৌয়ের কলেরার বেশে পথ পেল চারু। রোগীর ব্যবহৃত পাথর বাটি অতি যত্নে পুঁটলি বেঁধে ফিরল সে। রোগীর নয়, দেবতার প্রসাদ। তার চিন্তা, রাত্রে পরীর কলেরা হলে ভুবনের কী হবে। কিন্তু চারুই ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করল। পরীর কাছ থেকে দূরে সরে গেল বনমালী। সে যত পশু হয় অন্ধ প্রবৃত্তির তাড়নায়, বনমালী তত কঠোর নিস্পৃহ। তার ভুবনকে বোম্বেগামী ট্রেনে

বিদায় দেওয়া ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে হত্যারই নামান্তর; গল্পের কদর্যতম অংশ। 'বনমালীর একগ্রাসে পেট ভরানোর প্রবৃত্তি' এখন শান্ত। পরী বনমালীর মন বোঝেনি। তাই 'তাহার (পরী) নদীতে হাঁটু ডুবাইয়া বনমালী পার হইয়া গেল'; এখন ভুবন তার একমাত্র স্নেহপাত্র।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝেছিলেন, গল্প পড়ে পাঠকের মনে চারুর মতই বমির আবেগ প্রবল হতে পারে কিংবা মনের সরীসৃপগতি চরম মরবিডিটি এনে দেবে। তাই শেষে চমৎকার রিলিফ দিয়েছেন: "ঠিক সেই সময়ে মাথার উপর দিয়া এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেটা সুন্দরবনের উপরে পৌঁছিয়া গেল। মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় নিয়াছে।" শেষ বাক্যে পাঠকের চেতনায় অপ্রত্যাশিত ধাক্কা লাগে; তার আঘাতেই গল্পের পিচ্ছিল পরিবেশ থেকে মন মুক্তি পায়। সরীসৃপ-এ মানিকবাবুর নির্মোহ পর্যবেক্ষণভঙ্গি সুপ্রতিষ্ঠিত; নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে তিনি 'কল্লোলের কুলবর্ধন' হতে পারেন না: তবে সিঁড়ি, বিপত্নীক, শৈলজশিলা, মমতাদি, বিষাক্তপ্রেম ইত্যাদি গল্পে কল্লোলের কুলত্যাগীই বলতে হয়। প্রাগুক্ত সমালোচকের মতে, প্রাগৈতিহাসিক ও সরীসৃপ সম্পূরক, দুয়ে মিলে 'লেখকের জীবনদর্শনের পূর্ণ পরিচয় বহন করছে।' একেই বলা যায় বুদ্ধির সাবোটাজ। গোত্রান্তরিত মানিকবাবুর শিল্পীজীবন কৌশলে অস্বীকার করা হয়েছে। 'পূর্ণ পরিচয়' তখনও অপেক্ষিত। সরীসৃপ-এর 'বন্যা', 'মহাজন', 'আশ্রয়' মনোলোকের উদ্ঘাটন হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

তবে মমতাদি, মহাকালের জটার জট, বিষাক্ত প্রেম গল্প হিসেবে অপূর্ব। যে ভালবাসা সংসারের কেন্দ্রবিন্দু, মধ্যবিত্ত জীবনে তা অনেকাংশে ঠুনকো জিনিস। স্বাভাবিক দেহের ক্ষুধাতেই যেন এর নিবৃত্তি। মমতাদি নগেনের কাছে ভদ্র স্ত্রীর মর্যাদা কোনোদিন পায়নি। গালি প্রহার অনাহার তার নিত্য অভিজ্ঞতা। স্বামীসঙ্গে তার কি সুখ বোঝা দুষ্কর। চরম কটূক্তি শুনেও মমতাদি যখন শিশু সন্তানের সোহাগে আত্মমগ্ন, তখন বিস্ময় জাগে বই কি। 'নগেনকে লুব্ধ করে সে যেন কি চাইছিল।' অপমানিত কিশোর দেখে, 'মমতাদির শুভ্র শীর্ণ হাত নগেনের গলা জড়িয়ে ধরেছে।' মহাকালের জটার জট একটি অসুস্থ চরিত্রশালা। সুমিত্রা, সুচিত্রা, পঙ্কু, সতীশ, সুলতা সবাই বিকারগ্রস্ত। সুচিত্রার উন্মাদদশাও

অবদমিত ইচ্ছার প্রকাশ। যারা স্বাভাবিক তারাও সুস্থ নয়। বিষাক্ত প্রেম ঠিক মধ্যবিত্ত সমাজের কথা নয়; কিন্তু এখানেও প্রেমের প্রয়োজনাতিশায়ী মূল্য অস্বীকৃত।

টিকটিকি, বিপত্নীক, সিঁড়ি, হাত,—মনের রহস্য সন্ধানী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জটিল নিরীক্ষার ফল। টিকটিকির অতি-সাংকেতিকতা রসহানি ঘটিয়েছে। জ্যোতির্ষার্ণবের একটি গূঢ় গোপন মন আছে, কিন্তু তার স্বরূপ কি? এ বিষয়ে তিনি নীরব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই অতি সাংকেতিকতা দিবারাত্রির কাব্য, অহিংসা গ্রন্থেরও ত্রুটি। বিপত্নীক ও হাত গল্পে দুই নারীর অসহায় মৃত্যু সত্যিই আর্শিতে মধ্যবিত্তের মনোবিকার ফুটিয়েছে। বিপত্নীক-এর স্বামী জানে, তার পূর্ণ অধিকার স্ত্রী সবিতার দেহে মনে। যেন অধিকারবোধেই দাম্পত্য জীবনের ভিত্তি। প্রত্যুষে শয্যা ছেড়ে সবিতা যখন স্বামীর জন্য জলখাবারের আয়োজনে ব্যস্ত তখনও স্বামীটি শয্যার আশ্রয়ে। সন্দেহ সংশয় কেবলি তাকে উদ্বিগ্ন, উৎক্ষিপ্ত করে। উৎক্ষিপ্ত মুহূর্তে একরাত্রে পাদুকাহত হল সবিতা। এতটা ভালো নয়। তবু পোষাজীবের কাছে হার-স্বীকার চলে না। তার প্রেস্টিজ বড়। পরের দিন মিষ্টি কথায় তুষ্ট করলেই হবে।

কতটুকু গুরুজন হিসেবে স্বামীর কর্তব্য, কতখানি বেশি সোহাগ আদর হলে স্বামিত্ব-অভিমান খর্ব হয়—তা নিয়ে সুদীর্ঘ জল্পনা-কল্পনা লেখকের নিপুণ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পরিচায়ক। স্ত্রী-শাসন স্বামীর এক্তিয়ারে। এমন কিছু অনধিকার চর্চা হয়নি। ড্রেসিংটেবিল্, সুটকেশ, হারমোনিয়ম, রঙবেরঙের শাড়ি সবই তো প্রত্যক্ষত সবিতার প্রতি তার ভালবাসার প্রকাশ। জানা গেল, কড়িকাঠের হুকে দড়ি লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে সবিতা। নিজের চোখে দোদুল্যমানা সবিতাকে দেখেও আত্মধিক্কার, শোক, ভয় তাকে বিস্মিত করেনি। পরাজয়ের অপমানে সে ক্লান্ত। অনুগতা স্ত্রীর আচরণ, খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য পর্যন্ত তার নখদর্পণে। জীবনে যে ছিল নেহাত অধিকৃত, মরণে সে কেন কেড়ে নিল অধিকার। একটি রহস্য ভেদ করতে পারেনি স্বামী—কেমন করে অত উঁচুতে সে দড়ি টাঙাল। সন্দেহ সত্যি। নিশ্চয় সে বিশ্বাসঘাতিনী। বলা বাহুল্য এ নিশ্চয়তা প্রমাণসিদ্ধ নয়। স্বামিত্বের অভিমানে এর জন্ম ও বৃদ্ধি। 'ছায়া' গল্পের বিপত্নীক স্বামী স্ত্রীর ফটোর দিকে একান্ত দৃষ্টি রেখে দেখেন। নিঃসঙ্গ জীবনে পর-

লোকতত্ত্ব অনুশীলন আর স্মৃতিচারণ। মনস্তত্ত্বের মতে অবসেশন। তাই অন্ধকার রাতে দেখা যেত ফ্রেমের পরিধি থেকে মৃতা স্ত্রীর শরীরী আবির্ভাব। এমনকি সবচেয়ে প্রিয় লীলাভঙ্গিটি। 'বিপত্নীকের' তুলনায় গল্পটি ফলশ্রুতি সুকুমার হৃদয়বৃত্তির উদ্ঘাটন। কিন্তু ভাবের ফানুষ আকাশে ওড়ানো মানিকবাবুর স্বভাব নয়। এখানেই কল্লোলগোষ্ঠীর (কল্লোল-যুগ? রবীন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণ সত্ত্বেও?) লেখক-মানস, দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্যের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য। তাই রোমান্সের রস ঝি-র ছায়ায় বিলীন। দ্বিতীয় দারগ্রহেও নায়ক সুখী। ব্যঙ্গ্যার্থে গল্পটির মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধের আতিশয্যের কঠোর সমালোচনা প্রকাশ পায়।

'সিঁড়ি'র ইতি পচনশীল মধ্যবিত্তের ভুয়োনীতিজ্ঞানের প্রতীক। ভাড়ার বিনিময়ে সে বাড়িওয়ালা মানবকে দেয় সান্নিধ্য। বাপ-মা চোখ বুঁজে থাকেন। তেতলা-দোতলার অনেক ভাড়াটে ইতিকে দেখে। বহু ভাড়াটে পরিবৃত বাড়ির কে কাকে চেনে। সিঁড়ির পথে শুধু দেখা হয়। কেউ ইতিকে দেয় গালি, কেউ করে ঈর্ষ্যা। সুধার ইতি-বিদ্বেষও অবদমিত বাসনার জ্বালা। এই সিঁড়ি বেয়েই চলেছে মধ্যবিত্তের একতলা থেকে তিনতলা পর্যন্ত। আত্মবিক্রয়ের সিঁড়ি।

লেখকের একটি বর্ণনা ক্ষয়িষ্ণু সমাজের প্রতীকী উন্মোচন: "ছেলেটার পাঁচড়ার রস ভাল না লাগায় থেকে থেকে পাঁচড়া ত্যাগ করে কয়েকটা মাছি উড়ে যাচ্ছে এঁটো বাসনে, আর উচ্ছিষ্ট ভাল না লাগায় থেকে থেকে কয়েকটা মাছি এঁটো বাসন ত্যাগ করে উড়ে এসে বসছে ছেলেটার পাঁচড়ায়।" এ-হেন পরিবেশে ইতির মনোবিকার অস্বাভাবিক নয়।

গোত্রান্তর ও মনঃসন্ধি

অতন্দ্র শিল্পীমনে সমাজ পরিবর্তন প্রতিক্রিয়া জাগায়। নেতিবাচনে সমাজকে যিনি ভাঙতে চেয়েছিলেন, প্রকৃত ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে তিনি স্তব্ধ, বিস্মিত হয়েছিলেন। নীতি, ধর্ম, প্রাণ, নারীত্ব জলাঞ্জলি যায় শুধু বাঁচার তাগিদে। সর্বনাশের এ বহ্ন্যুৎসব তিনি দেখতে চাননি। বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ-এর যুদ্ধ, মন্বন্তর, কালোবাজার তাঁকে জীবনসমস্যার গভীরে নিয়ে গেল। সত্যি "দ্বিতীয় মহাসমরের পরিকীর্ণ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মন্বন্তরের মহাশ্মশানে বসে তিনি খুঁজে পেলেন সঞ্জীবনী মন্ত্র।" এই পর্বে মানিকবাবু সর্বাধিক সমাজ সচেতন, সমকালীন ছন্নছাড়া জীবনের দরদী কথাচিত্রকর। ইতঃপূর্বে যে

উদ্ভট সাংকেতিকতার মোহ তাঁকে পেয়ে বসত, এই পর্বে তার গ্রন্থি-মোচন হয়েছে (একেবারে বর্জিত হয়নি কখনো)।

'আজ কাল পরশুর গল্প', 'ভেজাল', 'সমুদ্রের স্বাদ' মানিকবাবুর মনঃসন্ধির পরিচায়ক। অনেকগুলি গল্পে পাই প্রথম পর্বের মনোবিকলনী চরিত্র চিত্রণ, ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণে অবচেতনের শিল্পরূপ; কতকগুলি গল্পে ফুটেছে জীবনসংগ্রামে ক্লিষ্ট মানুষের চেহারা, মর্যাদার মূল্য। তেমনি 'আজকাল পরশুর গল্প'-এ কালাচাঁদের বিবেক (নমুনা)। 'শৈলির ঘরে লোক আছে' শুনে কালাচাঁদের মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। দেহ-ব্যবসায়ীও বিবাহমন্ত্রের দায়িত্বটুকু ভুলতে পারেনি। মনে হল, 'মন্দোদরীকে সে বুঝি খুন করে ফেলবে।' মন্দোদরী কালাচাঁদেরই বেতনভুক, পণ্য নারীদের তত্ত্বাবধায়িকা। কিন্তু শেষপর্যন্ত একতাড়া নোটে মুখ বন্ধ। এই শেষটুকু যুদ্ধ পটভূমির দান। 'আজ কাল পরশুর গল্প'-এও সমাজপতি ঘনশ্যামের কদর্য চিত্র। যখনই নৈতিক স্খলন, তখনই মানুষের ক্ষিপ্ত চেতনা যৌন লালসায় আবিল হয়ে ওঠে। এইতো আজ কাল পরশুর সত্য। পরিস্থিতির হাতে মানুষের এই অসহায় আত্মিক মৃত্যু দেখে বিজ্ঞানীর মতো নিরাসক্ত মানিকবাবুও বোধহয় অন্তরে অন্তরে শিউরে উঠেছিলেন। তাই আছে 'শিল্পী'র মতো গল্প। অধিকাংশ তাঁতী দাদন নিয়ে বায়না মতো কাপড় বুনছে। ইচ্ছে মতো সূক্ষ্ম কাজের সুতো নেই। যুদ্ধে চালান বন্ধ। যেটুকু বা আছে, তাও কালোবাজারে অন্তর্হীণ। মদন সেরা শিল্পীদের অন্যতম। সে কিছুতেই লোভীর লোভের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না— আসুক দারিদ্র্য অনাহার। সারারাত একদিন মদনের ঘরে তাঁতের আওয়াজ পেয়ে পাড়াপড়শীরা অবাক। তবে কি মদন গোপনে দাদন নিয়েছে? বিরক্ত উত্তেজিত মদন সবাইকে জানালে, হাতে পায়ে অসহ্য অস্বস্তি, তাই খালি মাকু চালিয়েছে সারা রাত। শিল্পীর এই অভিমানটুকু মানবিক। মানিকবাবু জীবনের নিছক নেতিভাষ্য করেননি। নতুন সম্ভাবনা প্রতি-শ্রুতির দিগন্তও তাঁর দৃষ্টির অন্তর্ভূত।

'দুঃশাসনীয়' গল্পে রাবেয়ার মৃত্যু সে-যুগের অনেক আত্মহত্যার ব্যাখ্যা-স্বরূপ। 'নমুনা' গল্পের নিরপরাধ মেয়ের অসহায় মৃত্যু দুঃশাসনীয় গল্পে সমষ্টিগত রূপ পেয়েছে। কালাচাঁদের মতো এখানে আছে বিপিন সামন্ত, আজিজ, ঘোষ। রাবেয়া, বিন্দু, মালতী, আমিনা, বৈকুণ্ঠ মালিকের

স্ত্রী সকলেই সমাজের কুচক্রীদের হাতে বলি। বস্ত্র সমস্যার সেই দুঃসহ দিন-গুলির অপূর্ব বর্ণনা: "*গাছপালার আড়ালে একটা ছনের বাড়ি। বাড়ির* সামনে ভাঙাবেড়া কাত হয়েও দাঁড়িয়ে আছে। বেড়ার ওপাশ থেকে নিঃশব্দে ছায়া বেরিয়ে এসে হনহন করে এগিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে জমকালো কতগুলো গাছের ছায়ার গাঢ় অন্ধকারে। নয়তো কাছাকাছি এসে পড়ে থমকে দাঁড়াবে, চোখের পলকে একটা চাপা উলঙ্গিনী বিদ্যুৎ ঝলকের মতো ফিরে যাবে বেড়ার ওপাশে। ডোবাপুকুরে বাসন মাজবে ছায়া, ঘাট থেকে কলসী কাঁখে উঠে আসবে ছায়া। ছায়া কথা কইবে ছায়ার সঙ্গে, দিদি, মাসী, খুড়ী বলে পরস্পরকে ডেকে হাসবে কাঁদবে অভিশাপ দেবে অদেষ্টকে আর কথা শেষ না করেই ফিরে এদিকে ওদিকে এ-কুঁড়ে ও-কুঁড়ের পানে চাইবে বিড়বিড় করে বকতে বকতে। বিদেশীর সামনে পড়ে গেলে চকিতে ঝোপের আড়ালে অন্তরাল খুঁজে নিয়ে ভীত করুণ প্রতিবাদের সুরে ছায়া বলবে, "কে? কে গো ওখানে?"

যতক্ষণ থাকে সূর্যের আলো, মেয়েরা ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। ভোলা নন্দীর মতো কেউ হয়ত কোমরে নেংটি এঁটে স্ত্রীলোকদের দিয়েছে কাপড়, কেউ বা সম্বল করেছে পায়খানার নোংরা চট। সকলের বাইরে যাবার জন্যে আছে একটিই আবরণ। সমস্ত দেশজুড়ে চলেছে দুঃশাসনের রাজত্ব। সেখানে ঘোষ ও আজিজে কোনো ভেদ নেই। দ্রৌপদীর লজ্জা-হরণের জন্য ছিলেন দর্পহারী মধুসূদন; মালতী, বিন্দু, আমিনা, রাবেয়া, বৈকুণ্ঠ মালিকের স্ত্রীর লজ্জা অন্ধকারে ছাড়া ঢাকা পড়ে না। রাবেয়া আনোয়ারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিমানী। যে-মরদ কাপড় যোগাতে পারে না, সে কেমন স্বামী? আনোয়ার চেষ্টার ত্রুটি করে না একখানা কাপড় যোগাতে, কিন্তু যারা বস্ত্রবিতরণের কর্তা, তারা যে বলে, হাতিপুরের কোটা এখনো এসে পৌঁছায়নি। রসুল মিয়া ওপরতলার লোক, কিন্তু তিনি বোঝেন, হাওয়া ঘুরতে পারে। তাই আনোয়ারকে একটা পুরনো কাপড় দিতে রাজী হন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নয়, কয়েকদিন পরে। এই সান্ত্বনায় রাবেয়ার উষ্মা কমে না। তবে আনোয়ারের প্রতি অভিমান ঘুচে গেছে। তাই পরম শান্ত মনে আনোয়ারকে খাইয়ে পরনের নোংরা চটটা টান মেরে ফেলে দিয়ে সে পুকুর ঘাটে গেছে। সেই তার শেষ বিদায়। ইটের বস্তায় ঘাড় গুঁজে রাবেয়া তুহিন শীতলজলে 'শান্তি খুঁজে নিয়েছে।'

এখানে পরিস্থিতির বাস্তব চিত্র আছে; সমস্যার কার্যকারণ ব্যাখ্যা আছে, নেই প্রতিকারের ইঙ্গিত। রাবেয়ার মৃত্যু হার মানার কাহিনী। হয়ত অমুক্ত আছে লেখকের অভীপ্সা—যারা বাঁচতে দিল না, ভবিষ্যৎ সমাজ যেন তাদের ক্ষমা না করে।

'পেট ব্যথা' অন্য ধরনের গল্প। এখানে দরিদ্র মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণ নয়, আছে কুচক্রী জনস্বার্থবিরোধী লোকদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ। ভৈরব সামান্য চাষী, তার চাষের অবস্থা খুবই মন্দ। মানোর মা ওরফে তার স্ত্রী তার মতই দুঃখসহিষ্ণু। তবু তাদের দুর্ভাগ্য ঘোচে না! মানো মরেছে অপুষ্টিতে অনাহারে, এখন পালিত ছাগী কালীকে বিক্রী না করলে জীবিকার সংস্থান জোটানো ভার। তাই একটি দাম্পত্যকলহের অবসানে ভৈরব কালীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সদরের দিকে। হাটে তাকে বিক্রী করলে ন্যায্য দাম পাওয়া যাবে। বহু পথ পেরিয়ে হঠাৎ মাঠের মধ্যে দেখা কৈলাসের সঙ্গে। গ্রামের মানুষের ভাগ্য নিয়ে যারা লোভের পাশা খেলছে, কৈলাস তাদেরই একজন। সে পারমিট-লাইসেন্সের গুণে অর্থশালী, প্রভাবশালী। সেই কৈলাস 'শুঁড়ির পো' বিদ্রূপে ভৈরবের সঙ্গে আলাপ শুরু করে। ভৈরব তাতে কান দেয় না। কৈলাস জানায়, সে টাকা দিয়ে সরকারের কাছে লাইসেন্স নিয়েছে, ও অঞ্চলের সব গরু ভেড়া ছাগল তার কাছে বিক্রী করতে হবে। কালীর জন্য ধার্য দাম আট টাকায় ভৈরব রাজী হল না। শেষ পর্যন্ত এক সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থ পরিবারে কালীকে রেখে আসতে পেরে ভৈরব প্রকৃতই খুশী। পোষা জীব সন্তানের তুল্য, সে পড়বে কসাইয়ের হাতে! ভৈরবের বেদনা এখন অনেক লঘু। তাই একুশ টাকার থেকে মানোর মা'র জন্যে কাপড়ের বদলে গামছা এবং টুকিটাকি জিনিস কিনে. কিছু তেলেভাজা গলাধঃকরণ করে ভৈরব আবার গাঁয়ের হাঁটা-পথ ধরেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার প্রায় আসন্ন, কৈলাস গুণ্ডাসহ ভৈরবকে ধরে টাকা-পয়সা কেড়ে নিল। আট টাকা ন্যায্য দাম এবং আট আনা কমিশন, এ ছাড়া সবই না-কি কৈলাসের প্রাপ্য। ভৈরবের অসম্মতি, বচসা, বিরোধ। সঙ্গে সঙ্গে কৈলাসের ভাড়াটে গুণ্ডাদের প্রহারে ভৈরবের সংজ্ঞালোপ, রক্তবমি! পথচারী কিছু লোক স্থানীয় ডাক্তারের কাছে যখন নিয়ে গেল, তখনও তার রক্তবমি হচ্ছে। তেলেভাজার পরিমাণ অল্প, রক্তই বেশী। কিন্তু ডাক্তার জেনেছে, কৈলাসের বিরাগভাজন এই

কেস। ওষুধের চোরাকারবারে কৈলাসই তার খুঁটি, সুতরাং সে প্রত্যক্ষ-দর্শীর কথাও কানে তোলেনি। যথার্থ চিকিৎসার ব্যবস্থা না করেই ডাক্তার বাড়ি গেছে। কিন্তু সেখানেও নিস্তার নেই। কানে কানে ছড়িয়ে পড়েছে কৈলাসের এই আচরণের কথা, ডাক্তারের কথাও। তাই আর একটি রোগী এল। সেও প্রহৃত, রক্তবমি করছে। তাকে কি কলিক ব্যথার চিকিৎসা করা যাবে? সে রোগী হচ্ছে কৈলাস। সমবেত প্রতিরোধের কাছে টাকার বিনিময়ে কেনা বাহুবল সহজেই হার মানে। যাকে ঘুষ দিতে হয় এবং যে ঘুষের চোরাপথে মর্যাদার সোপান বেয়ে ওঠে—উভয়কেই নিখুঁতভাবে চেনা যায় মানিকের উত্তরপর্বের গল্পসংগ্রহে।

'হারানের নাতজামাই' এবং 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' যে কোনো মানদণ্ডেই উৎকৃষ্ট গল্প। সংগ্রামের মধ্যেই জীবনের প্রকাশ প্রতিক্রিয়ার আঘাতে জীর্ণ হয়ে মানুষের জোর বাড়ে, প্রতিরোধে সক্রিয় হয়। আন্দোলনের আকার, কৌশলও অল্প নয়, তাতেই গল্পেরও মুন্সীয়ানা। মানিকবাবুর সাহিত্যসত্য এই জীবন-অন্বেষাকে আয়ত্ত করে তার সঙ্গেই অভিন্ন হতে চেয়েছে। ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের চব্বিশ পরগণা এবং হাওড়ার বড়া-কমলাপুর তাঁর গল্পে অমরত্ব অর্জন করেছে। পলাতক কৃষক নেতাকে পুলিশ ও জনবিরোধী প্রভাবশালী বড় মানুষদের হাত থেকে কেমন করে আশ্রয় দিয়ে বাঁচাল গ্রামের মানুষ, বিনা অপরাধে জেল-খাটা নাতির শোকে কাতর বৃদ্ধ থেকে সুরু করে লজ্জাশীলা গ্রাম্য মেয়ে ময়না পর্যন্ত নিখুঁত অভিনয়ে ভুবন মণ্ডলকে বানালো হারানের নাতজামাই। সব বিসম্বাদ ভুলে মেনে নিলে এমন কি প্রকৃত নাতজামাই জগমোহনও। জগমোহনের উদ্ধত গর্জনে গল্পে নাটকীয় বিদ্যুৎগতি সঞ্চার হয়েছে। সব সংস্কার, সংকীর্ণ গ্রাম্যতা, কলহের চেয়ে বড় প্রীতি, ভবিষ্যৎ মঙ্গল দূতের প্রতি ভালবাসা। ময়নার মা চরিত্রটি ভুবনের চেয়ে সার্থক। ময়নার মা মানিক-সাহিত্যে নতুন সংযোজন। গল্পের উপসংহারে প্রতিরোধের চিত্রটিও সুন্দর। ভাষা আবেগবর্জিত অথচ যাথার্থ্যের জন্য এর বেশী আলঙ্কারিক সৌন্দর্যও নিষ্প্রয়োজন।

নাটকীয়ভাবে গল্পটির সূচনা। বিনা ভূমিকাতেই। জোতদার চণ্ডী ঘোষের পাইক কানাই শ্রীপতির সঙ্গে এল লেঠেল এবং পুলিশ। রবীন্দ্রনাথের 'দুর্বুদ্ধি' গল্পে গ্রাম্যজীবনে জমিদার ও দারোগার সম্বন্ধ নিখুঁত

বর্ণিত হয়েছে। এখানেও তারই একটা নির্লজ্জ উদাহরণ। কৃষক নেতা ভুবন মণ্ডলকে পুলিশ-জোতদার জোট ধরতে চায়। কারণ 'ভুবন আমাগো, বুঝাইছে, সাহস দিছে, একসাথ করছে, ধান কাটাইছে'। কিন্তু যে 'দশটা গাঁয়ের বাপ' তাকে গ্রেপ্তার করা সহজ নয়। নেতাকে ভালোবেসেই তাকে সবাই বাঁচাতে চায়। তখন ভুবন হারানের ঘরে। তাই হারানের মেয়ে ময়নার মাকেই কৌশল করতে হয়। ময়নার বর সাজিয়ে সে-যাত্রা ভুবন রক্ষা পেল। কিন্তু বুঝতে দেরি হয় না, অন্য ঘরেও তাকে বাঁচানোর সমান চেষ্টা হত। গল্পের দ্বিতীয় পর্যায়—প্রকৃত নাতজামাই জগমোহনের আবির্ভাবে। এখানে নাটকের যেন দ্বিতীয় সন্ধি। লোকমুখে ময়নার জামাই-আসার গল্প শুনে প্রকৃত জামাই স্বভাবতই রুষ্ট, ক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে। সে একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়া চায়। এই অংশটির জন্য সংলাপ অপরিহার্য। এবং গল্পে এখানেই সংলাপ সবচেয়ে রসোত্তীর্ণ।

কিন্তু এমন রসোত্তীর্ণ গল্পেও অসতর্কতা এবং দ্রুত রচনার ছাপ আছে। মথুরের কাহিনীটি বোঝা যায়নি। সে কি ভুবন মণ্ডলের প্রকৃত পরিচয় জানিয়ে ছিল থানায়, অথবা হারানের নাতি মণ্ডলকে নিয়ে গোঁদালপাড়া থেকে ফেরার পথে মণ্ডলকে মথুর পুলিশে ধরিয়ে দেয়? সবাই মিলে বেঁধে নিয়ে যাবে মথুরকে বিচারের জন্য। জগমোহনের নাক কান কেটে ফেলার অধিকার সর্বাগ্রে।—এটুকুর মধ্যে কিছু ইঙ্গিত আছে, কিন্তু গল্পের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়।

কৃষকদের সঙ্গে জোতদারদের সং‌্গ্রামে সন্ত্রস্ত অঞ্চল ছোট বকুলপুর। অনেক গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ, খদ্দর-পরা গ্রামকর্মীদের নির্দেশে, স্টেশনে রক্তপাতও হয়েছে। যারা এখনো ধরা পড়েনি, তারা গা-ঢাকা দিয়েছে। সর্বত্র ক্ষিপ্ত ক্ষুব্ধ পুলিশ গোয়েন্দা এবং তাদের সহকর্মীদের চর। তাই স্টেশন থেকে নেমে লোক কোথাও জটলা করে না, চায়ের দোকানও প্রায় জনশূন্য। এমন জায়গায় ভিনগাঁ থেকে এলো দিবাকর এবং আন্না। স্বামী-স্ত্রী। সঙ্গে বাচ্চা। তারা খবর পেয়েছে, ছোট বকুলপুরে সব তছনছ হয়ে গেছে। তাই আন্না এসেছে বাপের বাড়ির কুশল জানতে। দু'জনেই রাজনীতির আগুন থেকে দূরে। কিন্তু ওদের যে গ্রেপ্তারের লোক চাই। এই হলো ছোট বকুলপুরের যাত্রীর পরিবেশ।

নব-আলপনা, ত্রিজ, স্বার্থপর ও ভীরুর লড়াই, সবার আগে চাই, বুড়ী

ঢেউ—গল্পের উপকরণ এবং খসড়া মাত্র। জীবিকার তাগিদে অতি দ্রুত লিখতে হয়েছে তাঁকে কিন্তু 'ঘামের ফোঁটা' নয়, রক্তের দাগ ('রক্ত-নোন্‌তা' ছাড়াও অন্যান্য গল্পে রক্তের মূল্যে অধিকার অর্জনের কথা আছে) দেখা যায় সর্বত্র। গোত্রান্তরিত শিল্পীর নবচেতনায় সঞ্জীবিত সে রক্তের স্বাদ। মনের চরিত্রশালায় সংগ্রামে প্রবুদ্ধ মানুষগুলির ছায়া পড়েছে। কেবল স্রষ্টার অতি ব্যস্ততায় এ গল্পগুলি রসোত্তীর্ণ হতে পারল না। তবু লক্ষণীয়, পূর্ণজীবনের সন্ধানী মানিকবাবুর একটি নূতন পরিচয় উন্মোচিত হয়েছে। প্রথম পর্বের অতসীমামী, মিহি ও মোটা কাহিনী, সরীসৃপ বা ভেজালের সঙ্গে কি গভীর পার্থক্য। লেখকের মানসিক রূপান্তর নেতিবাচক মনঃসমীক্ষণের ব্যাসকূট ছেড়ে সহজ সরলভাবে মেহনতী মানুষের জীবন-সংগ্রামে জীবনসত্যের প্রতিফলন দেখেছে। মাছের ল্যাজ ও মাংসের ঝাঁজ, সবার আগে চাই, খাটাল—বিষয় ও মুহূর্ত বিচারে লেখকের দৃষ্টিবদলের চিহ্ন। কিছু গল্প আছে উপন্যাসের অংশ। বলা বাহুল্য এইসব রচনায় প্রায়শঃই ছোটগল্পের শিল্পগত দাবি পূরণ হয়নি। গল্পমূল্যে উৎকৃষ্ট—সখী, প্রাণাধিক, কালোবাজারে প্রেমের দর, নীচু চোখে একটি মেয়েলী সমস্যা। এই গল্প চতুষ্টয়ের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ 'সখী'। বিভা ও রানী দুই বাল্য সখী। বিবাহের পর অনেকদিন উভয়ের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ নেই। ছাব্বিশ বছর বয়সেই পাঁচ বছরের সাংসারিক অভিজ্ঞতায় তারা জেনেছে অনেক। হঠাৎ একদিন স্বামী অমিয়কে নিয়ে রানী এল বিভার বাড়ি। প্রথমে দু'জনের মধ্যেই আড়ষ্টতা, সংকোচ। বিভার উদ্বেগ, বুঝি সংসারের দৈন্যদশা দেখে ফেলে সখী। পরে অবশ্য পুরোনো ঘনিষ্ঠতা আরো নিবিড় হয়। 'দুজনেরই ভাঙাচোরা অতীতের প্রতিবিম্ব নিয়ে যেন দুটি আয়নার মতো তারা পরস্পরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।' রানীর স্বামী অমিয় জেল-ফেরৎ সাংবাদিক। সে জানে, কেন বিভার স্বামী অবসর বিনোদনের সময় পান না। 'আপিস, ছেলে-পড়ানো, বাজার, রেশন, কয়লা, ওষুধ ডাক্তার—কি করেই বা পারবেন?' মেয়েলী আলোচনায় গল্পের পরিবেশ যখন প্রায় মধুবিড হয়ে পড়েছে, তখনই আবার বাস্তব সত্যের উদ্ঘাটন। রমেশের বুড়ি-মার কান্না, অশেষের টি-বি-তে মৃত্যু। বিভার আশঙ্কা, যদি অশেষের মতো ওর স্বামীরও টি-বি হয়? রানী সান্ত্বনা দেয়, 'রক্তে' একদিন রাস্তাই লাল হয়ে গেল। আর ভাবি না। কী আছে অত ভয়

পাবার, ভাবনা করার ?' এ-গল্প মধ্যবিত্তের নবজন্মের কথা। 'প্রাণাধিক'ও এই সূত্রে আলোচ্য। বড়লোক বন্ধু জ্যোতির্ময়ের সাহায্য নিলে ভাগ্য পরীক্ষায় অবনীর জয়লাভ অনিবার্য। অবনীর বাবা সরোজের ইচ্ছাও ছিল অনুরূপ। কিন্তু গল্পের পরিণামে দেখি, আত্মমর্যাদাই অবনীর প্রাণাধিক প্রিয়। জ্যোতির্ময় ফিরে গেল। প্রলোভনের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অবনীর মতো মধ্যবিত্ত কলঙ্কমুক্ত খাঁটি সোনা। কিন্তু গল্পের অন্তিমে সরোজের মৃত্যু কি অনিবার্য ছিল ?

'কালোবাজারে প্রেমের দর' মধ্যবিত্তের অন্যতর অভীপ্সার চিত্র ('যাকে ঘুষ দিতে হয়' তুলনীয়) তুলে ধরে। একটি অংশ যেমন জাতি, পেশা, অহংকার খুইয়ে ('ফেরিওয়ালা'র অবনী) মেহনতী শ্রমিক-কিষাণের শরিক হচ্ছে, অন্য অংশ তেমনি উচ্চবিত্ত, অভিজাত হতে চায়। কিন্তু ওপরে ওঠার পথ সহজ নয়। তাই ধনঞ্জয়-লীলার ভালোবাসার প্রাসাদ ভেঙে গেল। তারাই ভেঙে দিল। তাদের প্রেম সত্য, কিন্তু সত্যতর, প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। একমাত্র মিঃ নিরঞ্জন দাসই সে স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণে সক্ষম। ধনঞ্জয় তার মাধ্যমেই বড় বড় নতুন কন্‌ট্রাক্ট পাবে। তাই ধনঞ্জয়ের পক্ষে মিঃ দাসকে আপ্যায়ন জানায় লীলা। মিঃ দাসের ভালো লেগে গেল লীলাকে। তিনি অবশ্যই বড় কন্‌ট্রাক্ট দেবেন ধনঞ্জয়কে। কিন্তু তিনি লীলাকে বিবাহ করতে চান। লীলার কাছে এ প্রস্তাব বজ্রাঘাতের মতো। সারারাত অঝোর কান্না, অনিদ্রা এবং দুঃসহ কষ্টের পরে প্রত্যুষেই সে সিদ্ধান্ত নিলে, মিঃ দাসের প্রস্তাবে সম্মত হওয়াই উচিত। ধনঞ্জয়ও বহু চিন্তার পর অনুরূপ সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছিল লীলার কাছে। 'যাকে ঘুষ দিতে হয়' গল্পের মাখনও সামান্য ব্যবসায়ী। কিন্তু এখন সে মস্ত ধনী। গাড়ি বাড়ি ইত্যাদির অধিকারী। সুশীলাকে নিয়ে মাখন একদিন বেড়াতে বেরিয়েছে গাড়ি করে। এমন সময় তার সৌভাগ্যের হেতু মিঃ দাসের মোটরের সঙ্গে সাক্ষাৎ। দাস তখন মদ্যপানে বিভোর জেনেও বাগানবাড়িতে তার কাছে সুশীলাকে রেখে যেতে হল। নতুবা যে সোয়া লক্ষ টাকার কন্‌ট্রাক্ট মাখনের হাতছাড়া হয়।

'যাকে ঘুষ দিতে হয়' গল্পটিকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, "মধ্যবিত্ত ত্রিশঙ্কুর মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি", 'অমানুষিক' তাহলে গ্রামীণ চাষীর সর্বস্ব হারানোর কাহিনী। গরীব ছিদাম আধপেটা সিকিপেটা খেয়েই চালাচ্ছিল।

কিন্তু জমি, স্ত্রীর কানের মাকড়ি, রূপোর পৈঁছে, গাই সবই যখন একের পর এক অভাবের গ্রাসে নষ্ট হল, তখন ছিদাম বেরিয়ে পড়েছে নিরুদ্দেশে— আরো অনেকের মতো। সে ভিক্ষে করেছে, আরো নানান পেশা। তারপর ফিরে এসেছে। সবোর সঙ্গে মিলে সে ভিক্ষার বেসাতি করে কিছু পয়সাও এনেছে। কিন্তু সময়ের ধর্মে কেউ তার জন্য অপেক্ষা করেনি, তার স্ত্রী কুঞ্জাও না। ঘরের চেহারা বদলেছে। এসেছে আসবাবপত্র, নতুন গাই, নতুন গহনা। ললিতবাবুর কাছে এখন কুঞ্জা বিক্রীত। সবাই মরেছে, ছিদাম দীর্ঘদিন নিরুদ্দেশ। এ ছাড়া কুঞ্জা অনন্যোপায়। নিষ্ঠুর বাস্তবের একটি নির্মোহ ছবি।

'সাড়ে সাত সের চাল' গল্পের সন্ন্যাসীর মতো ছিদাম জীবনে পরাভূত। কিন্তু ছিদামের পরাভবই শেষ কথা নয়। তার প্রমাণ 'ছিনিয়ে খায়নি কেন'-র যোগী ডাকাত। সে বেচারীও পেটের দায়ে ভিখিরি হয়ে এসেছে শহরে। কখনো লঙরখানায় মিলেছে জলো খিচুড়ি, কখনো তাও না। মহাজনের গুদাম থেকে চাল ছিনিয়ে নেওয়ার শাস্তি পেয়েছে যোগী। জেল থেকে বেরিয়ে শহরের মন্দ পল্লী থেকে খুঁজে বার করেছে তার স্ত্রীকে। 'বললে না পিত্যয় যাবেন বাবু' বলে যোগী যা বলেছে সবই বিশ্বাসযোগ্য। সে অভিজ্ঞতায় বুঝেছে, না খেয়ে 'বাঁচার তাগিদও ঝিমিয়ে যায়'। 'আজ কাল পরশুর গল্প'-এর রামপদ যোগীরই আর এক সংস্করণ। তবে গল্প হিসেবে রামপদ-র কাহিনী বেশী সার্থক। পেটের দায়ে আরো অনেক মেয়ের মতো রামপদর বৌ মুক্তাও শহরে গেছে। অভিমন্যু যেমন ব্যূহের মধ্যে ঢুকতে জানতো, বেরনোর পথ জানতো না—আমাদের সমাজ তো প্রায় তার বিপরীত, বেরনোর সব পথ খোলা, প্রবেশের পথ রুদ্ধ। কিন্তু সেই ধারণা ভাঙছে, সেই সংস্কারের অর্গল খুলছে। তাই মহিলাসমিতির কর্মীরা যখন মুক্তাকে রামপদর কাছে ফেরৎ দিল, রামপদ গ্রহণ করেছে। 'এ যেন প্রলয়ের সময় কে কার ডোবার জল নোংরা করছে তাই নিয়ে ব্যস্ত হওয়া।' কিন্তু রাতারাতি গ্রাম্য সমাজ বদলে যায়নি। এ ঘটনায় আলোড়ন জেগেছে। সেই আলোড়নের বাস্তবতাই গল্পটিকে রসোত্তীর্ণ করেছে। ভাঙা চালের আড়ালে শোলের ঝোল আর ভাত খেতে খেতে মুক্তা যা বলেছে, তা তো সকলেরই রক্ত দিয়ে অনুভব করা সত্য: "দাসমশায় দুধ দিতে চেইছিল, মোকেও দেবে খেতে-পরতে। তখন কি জানি মোর অদেষ্টে

এই আছে? জানলে পরে রাজী হতাম, বাচ্চাটা বাঁচতো। [illegible] হলই, সে-ও মরল!" অনেক দুঃখের মধ্য দিয়ে আবার স্বাভাবিকতা এসেছে। ঘনশ্যামের চরিত্র উদ্‌ঘাটনও সত্যসন্ধানী লেখকের পরিচয় দেয়। তবে ঘনশ্যামের চেয়ে গিরি চরিত্র হিসেবে উজ্জ্বল।

'রক্ত নোন্‌তা', 'ভালবাসা'-র মতোই স্কেচধর্মী গল্প। ডাঃ দাস বারান্দায় অপেক্ষা করছিলেন। অদূরে নিরস্ত্র মানুষ ও সশস্ত্র পুলিশের সংঘর্ষ। আহত কয়েকজন এল চিকিৎসার জন্য, নবীনও। যে চোদ্দ বছরের রক্তাক্ত ছেলেটিকে সকলে বহন করে নিয়ে এল, সে ডাক্তারেরই ছেলে। শোকে অভিভূত হয়ে ডাঃ দাস কর্তব্যে অবহেলা করেননি। তিনি জানতেন ছেলেটি মরে গেছে। তবু অন্যেরা বাঁচুক। এ মৃত্যুর প্রতিরোধের শপথ কান্নাকে ভুলিয়ে দেয়।

'সমুদ্রের স্বাদ' মানিকবাবুর গল্প সংকলন হিসেবে প্রতিনিধিস্থানীয়। বিষয়ের পরিধি মূলত মধ্যবিত্ত সমাজদেহে সীমিত। কেবল পূর্ব পর্যায়ের 'আশ্রয়'-এর মতো গুণ্ডা অন্য শ্রেণীভুক্ত। তারা উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত মানবমণ্ডলীর অখ্যাত জীবমাত্র।

'সমুদ্রের স্বাদ' গল্পটির বিষয় অভিনব। বর্ণনারীতি কবিত্বমণ্ডিত, রোমান্টিক বিষণ্ণতা এর মুখ্য পাত্রী নীলা চরিত্রের ভিত্তি। সে কথা বলে কম। শুধু দুঃখ পায়, আর কাঁদে। নীলার বড় সাধ ছিল সমুদ্রদর্শনের। মামার বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি এসেও সে সাধ অপূর্ণ রয়ে গেল। আর সকলের সমুদ্র স্নানের বর্ণনা শুনে সে কাঁদে। কাল্পনিক হলেও সমুদ্রের সঙ্গে একটা বিশাল মুক্তির ভাবানুষঙ্গ গড়ে উঠেছে তার মনে। নিজের অশ্রুর লবণ-সমুদ্রেই সমুদ্রের স্বাদ চরিতার্থ হল। গৃহবদ্ধ নারীজীবনে অনেক সাধই যে এমনি 'রাঁধার পর খাওয়া আর খাওয়ার পর রাঁধা'য় জলাঞ্জলি যায়, তার সাংকেতিক কাহিনীরূপে এর স্বাদ স্বতন্ত্র। মানিকবাবুর গল্পে অনুস্যূত স্বাভাবিক অম্লকটু-কষায়ের তুলনায় 'সমুদ্রের স্বাদ' করুণরসাশ্রয়ী। সমালোচনার অঙ্কুশে শাসন করেননি নিজের সৃষ্ট জগৎকে; এখানে তিনি বরং সহানুভূতি মমতায় স্নিগ্ধ। উপসংহারটি করুণ এবং মানিকবাবুর স্বভাবসিদ্ধ। সমুদ্র স্নানের গল্প শুনে কর্মরত নীলা অন্যমনস্ক। "একটা আঙুল কাটিয়া গিয়া টপটপ করিয়া ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়িতেছে, আর তার চোখ দিয়া গাল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে জল।" এই পর্যন্ত বেশ।

কিন্তু "মাঝে মাঝে জিভ দিয়া নীলা জিভের আয়ত্তের মধ্যে যেটুকু চোখের জল আসিয়া পড়িতেছে, সেটুকু চাটিয়া ফেলিতেছে।"—একটা তীব্রতা, বীভৎসতার সৃষ্টি করে। এটা মানিকবাবুর স্বভাবসিদ্ধ হলেও এ গল্পের দৃষ্টিভঙ্গির কাছে এই বাক্য অপ্রত্যাশিত। যে জিজ্ঞাসা সঞ্চারিত করা লেখকের অভীপ্সা, এ বাক্যটি বাদ দিলেও তার ব্যঞ্জনা স্থায়ী হতে পারে।

'ট্র্যাজিডির পর', 'মানুষ হাসে কেন', মিহি ও মোটা কাহিনীর 'হাত' গল্পের মতো বিশুদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক অনুশীলন। গল্পের জগতে এদের প্রবেশাধিকার দেবার দুঃসাহস মানিকবাবুর ছিল। তবে রসসিদ্ধিতে এগুলি উল্লেখযোগ্য নয়। 'ভিক্ষুক', 'পূজা কমিটি', 'আপিস', মধ্যবিত্তের মনচিত্র। মধ্যবিত্ত "পচা ভদ্রতার মিথ্যা মুখোস খুলে সবাই ছোটলোক হোক এ কামনা করতাম।" তাই যাদবের মতো চরিত্রের সৃষ্টি ('ভিক্ষুক')। গ্রাম্য স্টেশনে নেমে যেতে একা সে ভয় পায়। সঙ্গে টাকা আছে। সঙ্গী একটা পাওয়া গেল। তারপর সেই সঙ্গীকে সন্দেহ। যদি সেই চোর হয়। সুতরাং বানিয়ে মিথ্যা বলে যাদব। বেকার, ছেলের অসুখ। সঙ্গী দশটি টাকা দিয়ে গেল। কলকাতা এসে বাসা ভাড়া করল যাদব। আর পেয়ে গেল উঞ্ছবৃত্তির পথ। অবসর সময়ে ভিক্ষা। মিথ্যাভাষণ পুঁজি। ছেলের কলেরা। কখনো ভিক্ষা পায়, কখনো পায় না। ট্রামের একটি ধোপদুরস্ত ভদ্রলোককে ইনিয়ে বিনিয়ে বলবে কিছু, তার প্রস্তাবনার আগেই তিনি আরম্ভ করলেন। যাদব শুনে গেল তাঁর বাচনরীতি, যেমন জুনিয়র উকিল শোনে সিনিয়র উকিলের বক্তৃতা।

'আফিম' গল্পের হরেন মিত্র, অবসরপ্রাপ্ত, আফিমখোর। নরেন তার ভাই, মায়া ভাদ্রবৌ, বিমল ভ্রাতুষ্পুত্র। হরেনবাবুর নামেই পরিবারের মর্যাদা, তিনিই এ-সংসারের ধারক ছিলেন, কিন্তু এখন তো বাহুল্য তৈজসের মতো। নভেল-পড়া ছাত্র বিমলের মা ভাবেন, বৃদ্ধের নেশার অনুপান হয়ে দুধের অপচয় ঘটে, অথচ তরুণ যুবক পায় না। নরেন ভাবে, আফিমের টাকাটা সংসার খরচ হতে পারত। অনটন থেকে লটারী-টিকিট এবং আরো অনেক কিছু হয়, চোখে পড়ে শুধু হরেন মিত্রের নেশা। আবার চাকরি জোটালেন হরেনবাবু। হাল ধরলেন। তখন বিমল, মায়া, নরেনের প্রতিক্রিয়া বাইরের শোভাসর্বস্ব মধ্যবিত্ত পরিবার-সম্বন্ধের মূলেই

কুঠারাঘাত করে। হরেনের মনোরঞ্জনে সবাই উৎসুক, অতীত অসন্তোষ প্রকাশের জন্যে সবাই অনুতপ্ত। মধ্যবিত্ত অন্তঃসারশূন্যতা উদ্ঘাটনের গল্প-গুলির মধ্যে 'আফিম' শ্রেষ্ঠ।

ঘনশ্যামের বিবেকেও ('বিবেক') বন্ধুত্বের খাদ। ধনী অশ্বিনীর অবজ্ঞা পেয়েও তার সঙ্গে সদ্ভাব রাখার আগ্রহ, তাই ঘনশ্যাম চুরির ঘড়িটি ফেরত দিল; গরীব শ্রীনিবাসের প্রতি বন্ধুত্ব, কৃতজ্ঞতা, তার পুত্রের জন্য মমতা সবই ঘনশ্যামের বিবেকের এলাকার বাইরে। সব মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত এই শ্রেণী এখন দিগ্‌ভ্রান্ত। প্রশ্ন উঠতে পারে, এ ধরনের লেখার সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের পার্থক্য কোথায়? প্রথম পর্যায়ের বিদ্রূপ ক্ষুরধার, উপ-সংহারগুলি উদ্যত বেত্রদণ্ডের মতো, এ-পর্বের রচনায় তা নেই। মধ্যবিত্তের অগ্রণী ভূমিকা সমাপ্ত—এই অন্তিম ঘণ্টাধ্বনি যেন শোনা যায়। বন্ধুর চোখ উপড়ে নিয়ে তারই স্ত্রীর সঙ্গে পলায়ন যেখানে সত্য, সেখানে আর শিক্ষা, সংস্কৃতি রুচির গর্ব কেন?

'বৌ' গল্পসংগ্রহ মানিকবাবুর নিয়ত নিরীক্ষার এক কৌতূহল সঞ্চারী সংকলন। দোকানী, কেরানী, সাহিত্যিক, কুষ্ঠরোগী, পূজারী ও জমিদারের স্ত্রী এবং দ্বিতীয় পক্ষ (বিপত্নীকের বউ) ও তেজী বউ।—বিভিন্ন পরিবেশে রেখে নারীর বধূরূপ দর্শন। কিন্তু যে পরিমাণে পরিকল্পনা আছে, সে পরিমাণে 'জীবনে জীবন যোগ করা' নেই। 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প'-এ স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থের 'কুষ্ঠরোগীর বউ'। কিন্তু তার মধ্যে স্বামীর মনোবিকারই প্রধান, বৌ কেবল প্রতিরোধ করেছে। ভালোবাসার অধিকারে যে নিবিড় সান্নিধ্য ছিল রোগের পূর্বে, কুষ্ঠরোগের প্রকাশে কেন তার পরিবর্তন হবে? যতীনের ধারণা মহাশ্বেতার এই দূরত্ব ভালোবাসার অভাবে। সে তার চোখের সামনে সুস্থ দেহ নিয়ে বিচরণ করছে, দেখেও বিষণ্ণ হত যতীন। বৌ স্বামীর মতো হবে। তারও হোক কুষ্ঠ। চেষ্টাও যতীন কম করেনি। অসুস্থ দেহে অসুস্থ মানসিকতা। শেষ পর্যন্ত কুষ্ঠ-রোগীদের সেবার ভার নিয়ে মহাশ্বেতা স্বামীর প্রতি ভালোবাসার অভিব্যক্তি দেখালে। গল্পে নারীমনের দ্বন্দ্ব-বেদনার চেয়ে মুখ্য যতীনের মনোজগৎ। এখানেই গল্পটির ব্যর্থতা।

অবচেতনের সুপ্তিলোক বুঝি নগ্নতর প্রকাশের অপেক্ষায় ছিল। 'ভেজাল' তার প্রমাণ। ফ্রয়েডীয় জীবনদৃষ্টিতে কল্লোল লেখকগোষ্ঠীর মতো

মানিকবাবুও প্রভাবিত। কথনো ফ্রয়েডীয় লিবিডোর তাড়না, কথনো মন-বর্জিত দেহের ক্ষুধা মানিকবাবুর গল্পে প্রকাশিত। এ-প্রভাব ষোলআনা তিনি অতিক্রম করতে পারেননি। তবে দ্বন্দ্ব বেধেছিল। সেই মনঃ-সংকটেই উত্তরণের প্রতিশ্রুতি। মানুষের মনের 'ভেজাল' ছাড়িয়ে তিনি খাঁটি মানুষের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। শিল্পমূল্যে সেগুলি হয়তো মাটির কাছাকাছি মানুষের সঙ্গে 'কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা'র সার্থক রূপায়ণ নয়। তবু এ আত্মীয়তা অর্জনীয় এবং অর্জনের ক্ষেত্রে মানিক-বাবুর আন্তরিক চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। এই মহতী চেষ্টার চিহ্ন 'মাটি-ঘেঁষা মানুষ' (চাষীর মেয়ে কুলীর বৌ)। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, পরবর্তী বাংলা ছোটগল্পে মানিকবাবুর ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের, বিশেষত 'ভেজাল'-এর প্রভাবই সর্বাধিক। প্রগতি ও প্রগতিবিরোধী শিবির এ বিষয়ে সমকণ্ঠে মানিকবাবুর সচল শিল্পীসত্তাকে অস্বীকার করেছেন। 'হলুদ-পোড়া' লেখকের আবহধর্মী গল্পের নিরীক্ষা মাত্র। পরিবেশ বর্ণনায় দক্ষতা আছে; কিন্তু সেখানে প্রথম পর্যায়ের লক্ষ্যহীন শক্তির প্রকাশ, গোত্রান্তরের চিহ্ন বা মানসসংকট অনুপস্থিত।

পূর্ণ জীবনের সন্ধানে ও সংস্কার মুক্তি

মধ্যবিত্তের মার্কসবাদে দীক্ষা প্রায়শ বুদ্ধির অঙ্গীকার। প্রাণমন তথা সমগ্র সত্তার সঙ্গে তার সার্থক স্বীকরণ সময়সাপেক্ষ ও অনেক অন্তর্বেদনা-নির্ভর। একটি শ্রেণীর অন্তঃসারশূন্যতা প্রকাশে শিল্পীর সম্যক আনন্দ নেই। সে জীবনশিল্পী হতে চায়। তাই সৃষ্টির প্রেরণা নির্মীয়মাণ নতুন চেতনার চরে এসে লাগে।

ফসল তোলার পালা অনেক পরের কাজ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে এই আত্মজিজ্ঞাসা তথা শিল্পজিজ্ঞাসা শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তাঁকে নতুন নিরীক্ষার পথে নিয়ে গেছে। মার্কসবাদের সংস্পর্শে এসে না-কি মানিক-বাবুর আত্মিক-মৃত্যু হয়েছে এবং এর জন্য তাঁর শিল্পীমনে বহিরারোপিত মতাদর্শই দায়ী। আঙ্গিকপ্রকরণে সুঠাম, ত্রুটিহীন রচনাই যদি শিল্প-বিচারের চূড়ান্ত মান হয়, তাহলে মানিকবাবুর তৃতীয় পর্বের গল্প সত্যি সামগ্রিকভাবে ক্রমোৎকর্ষমুখী নয়। অনেক গল্পই হয়ে গেছে স্কেচধর্মী; চরিত্রগুলির সাধারণ রূপ আছে, বিশিষ্ট রূপ নেই। রেখাচিত্রের মতো একটি মানুষের আগমন ও তিরোভাব। বিরোধ, দ্বন্দ্ব, পাঠকের অনুভব-

গোচররূপে স্তরে স্তরে ফুটিয়ে তোলেননি। ভাষায় এসেছে প্রচারধর্মী, বক্তৃতা-ঘেঁষা রীতি। যে-ফরমুলার চরিত্রায়ণ ছিল প্রথম পর্বে, তাই দেখা দিল তৃতীয় পর্বেও; পার্থক্য এই, প্রথমে মনোবিকার, পরে উদীয়মান নতুন জীবনবোধ ফরমুলার লক্ষ্য।

এই সমালোচনাকে ভাবাবেগবাষ্পে আর্দ্র হয়ে অস্বীকার করে লাভ নেই। কিন্তু এই স্বীকৃতি কি প্রমাণ করে? প্রমাণ করে, মনের সর্বাঙ্গীণ শ্রেণীচ্যুতি কী কঠিন। জীবনযাত্রার বেড়াগুলিই বাধা। প্রমাণ করে, বুদ্ধির স্তরে বুর্জোয়া বিরোধিতার প্রতিশ্রুতি নিলেও নিজের ভাবধারায় থেকে যায় তার সূক্ষ্মতর অস্তিত্ব। আঙ্গিক-প্রকরণের উৎকর্ষও এ-ক্ষেত্রে অন্যভাবে বিচার্য। পুরনো জীবন ত্যাগের পরেও থাকবে পুরনো পরিচ্ছদের মোহ? ভাষা, তির্যক মন্তব্য, উপসংহারের বিদ্যুৎ-দীপ্তি তো তৃতীয় পর্বের বাহন হতে পারে না। নেতিবাচনের উপমা উৎপ্রেক্ষা সংলাপ যতই বলিষ্ঠ হোক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোত্রান্তর স্বীকার করলে এই পর্ব তা ন্যায়ত প্রত্যাশিত নয়। নতুন সমাজচেতনা প্রতিষ্ঠার পূর্বে তার সার্থক ভাষা আসে না। মানিকবাবুর গল্পের আঙ্গিক অংশে যা আমরা হারিয়েছি, তার পূরণ হয়নি বিকল্প আঙ্গিক রূপক প্রতীকের মূল্যে। হবার কথাও নয়। তিনি যে এতদিনের সংস্কার-মোহ থেকে প্রায় রাহুমুক্ত হয়েছিলেন, এ সত্যটিই তাঁর পূর্ণজীবনসন্ধিৎসার সাক্ষী। তিনি গড়তে চেয়েছিলেন। তাই রুদ্র পঞ্চাননের দৃষ্টি নয়, রচনায় পড়েছিল শিবের প্রসন্ন দক্ষিণ দৃষ্টি। প্রলয় নয়, তৃতীয় পর্বে তিনি স্থিতির প্রয়াসী। তাই মেহনতী মানুষের মধ্যে খুঁজে পেলেন জীবনের নারায়ণ-মূর্তি। তখনই লেখা হয় 'মাটির মাশুল', আগামী বিপ্লবের 'খতিয়ান'। শেষ পর্যায়ের অনেক গল্পের প্লটের সঙ্গে সমকালীন ধর্মঘট, কৃষক মজুরের সংগ্রাম, তাদের রুজি-ইজ্জতের দাবির প্রত্যক্ষ যোগ আছে। বড়া-কমলাপুরের কৃষক জাগরণের কথাই হয়তো রূপায়িত হয়েছে 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পে। অনেক কৃষকনেতার আত্মগোপন-কাহিনীই সাহিত্যগত হয়েছে ভুবন মণ্ডলের চরিত্রে ('হারানের নাতজামাই')। দরিদ্র শরৎমৃদী দরিদ্র মাধবের সমবেত চেষ্টায় জব্দ হল ধনী যাদব। ছোট সংস্করণে বড় বিরোধ, বড় সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত পাই ('এদিক ওদিক')।

'ছেলেমানুষি' এবং 'স্থানে ও স্থানে' প্রায় এক প্লটের ভিন্ন বিন্যাস।

'সাথী' ও 'গায়েন' একই বিষয় অবলম্বনে রচিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠিপত্র থাকলে দেখা যেত এমন কয়েকটি লাইন, 'এরা আমার মনের অবকাশ ভরে রেখে দেয়।' তাই নানা নামে ও পরিবেশে সেই চেনা মানুষগুলির ব্যক্তিত্বকে চারিত্র্যকে সাহিত্যে প্রকাশের ব্যাকুলতা। মূর্তি গড়ে মনে হয়, প্রকৃত মানুষটির মুখের আদল এসেছে বটে, কিন্তু এ যেন অনড়। তখনই আবার সৃষ্টির আসনে বসেন শিল্পী। সেজন্যেই একটি চরিত্র, একটি প্লট নানা পরিবর্তিত রূপে ভিন্ন আবেদন নিয়ে দেখা দেয়। উপন্যাসের অনেক উপকাহিনী, ছোট ঘটনার সঙ্গেও বহু গল্পের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, আপন সৃষ্টির প্রতিবাদ। 'নির্মম আত্ম-সমালোচনায় মূল্যে বিশ্বাসী' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোত্রান্তর ও পূর্ণ-জীবনের সন্ধানে সাধনার আশ্চর্য ফলশ্রুতি। পূর্ব পর্যায়ের অনেক গল্প তৃতীয় পর্যায়ে কী ঈপ্সিত পরিণতি লাভ করত, তার পরিচয় 'ভালবাসা' ও 'শান্তিতলার কথা'। বিপিন ও মালতীর সুখী দাম্পত্যজীবন যেন অনন্ত প্রেমের সংসার। ব্যঙ্গ দিয়ে প্রেমের স্নেহ-সুকুমার পরিবেশকে বিদীর্ণ করা নয়, তার কোমল মাধুর্যের মূল্য অঙ্গীকারেই লেখকের দৃষ্টিবদলের পরিচয় পাই। একদিন প্রতীক্ষমাণা মালতী শুনল স্বামীর বন্ধু সতীনাথের মুখে বিপিনের মৃত্যু সংবাদ। উন্মত্ত সাম্প্রদায়িকতার যূপকাষ্ঠে বলি। শোকার্তা বেরিয়ে পড়ল পথে, বিপিনকে শেষবারের মতো দেখবে। সামনে পড়ল শুভ-বোধসম্পন্ন মানুষের শান্তিসেনাবাহিনী। মালতী দেখল তার দুর্ভাগ্যের মুক্তি এদের মধ্যে, তার সর্বনাশ এরা প্রতিরোধ করতে চায়। শব-সাক্ষাৎ ছেড়ে যোগ দিল শান্তি মিছিলে। অনায়াসে 'ভালবাসা' বৌ-পরিকল্পনার অন্তর্গত হতে পারে। 'কেরানীর বৌ'-এর নতুন পরিচ্ছদ। আবার 'শান্তিলতার কথা' 'শ্রমিকের বৌ' নামের যোগ্য। শ্রমিক সুখেন্দুর পরিবার। বোন নন্দ স্ত্রী শান্তিলতা এবং আরো অনেকে। প্রতিবেশী দিবাকর যুদ্ধ-ফেরত সৈনিক, রাসমণি তার স্ত্রী। স্বামীর কাছে প্রহৃত হয়ে খুঁটিতে বাঁধা শান্তিলতা। কেউ ভরসা পায় না বাঁধন খোলার। পরে সে যদি ভাবে, এত যাদের দরদ, তাদের সঙ্গেই থাক, আমার দরকার নেই। সুখেন্দু লোক ভালো, কিন্তু বড় তেজী। সমস্ত বস্তির একটি বাস্তব আবহ ঘনিয়ে উঠেছে গল্পে। শেষে লোকে ধরাধরি করে নিয়ে এল ক্ষত-বিক্ষত সুখেন্দুকে। সঙ্গে গুণ্ডা রাজাবাবু। সুখেন্দু দালালি করতে নারাজ।

চড়ামেজাজের লোক। কী বলতে কী বলেছে। তারই এই শাস্তি। পিলে লিভার ফেটে গেছে হয়তো। রক্তবমি হচ্ছে। দাঁত দিয়ে বাঁধন কাটল শান্তিলতা। স্বামীর সেবায় মগ্ন হয়ে গেল। এল বস্তির সবাই. চিকিৎসার ব্যবস্থা হল। যন্ত্রণাকাতর সুখেন্দুর নিরলংকার উক্তি 'আর তোকে মারব না শান্তি'—প্রকৃত মানুষটির ভেতরের দিক। এ-জীবনে শৃংখলা, তথাকথিত কৃষ্টি নেই, কিন্তু আছে প্রেম। সে নিত্য প্রেমে হয়তো আছে নিত্য প্রহার। তবু 'মমতাদি' গল্পের উপসংহারের সঙ্গে তুলনা করলেই স্পষ্ট হবে, লেখকের নারী চরিত্রের ধারণা কত পরিবর্তিত, সুস্থ হয়েছে। শান্তিলতা-সুখেন্দু গর্কির একটি গল্পকে মনে পড়ায়।

'ছেলেমানুষি', 'স্থানে ও স্থানে' দাঙ্গার পটভূমিতে লিখিত। একবাড়ির দুই অংশের বাসিন্দা তারাপদ ও নাসিরুদ্দীন। ধর্মের বিভেদ থাকলেও হিন্দু মুসলমানের পার্থক্য বুঝবে কেন শিশু গীতা আর হাবিব। হালিমার সঙ্গেও ভাব হল ইন্দিরার। কোনো ব্যবধান টেঁকেনি। শিশুই ভাঙলে দুই পরিবারের মধ্যে পার্টিশন। শিশু তো সংস্কার নিয়ে জন্মায় না। তাই সাদা কালো তার চোখে অকাট্য সত্য। তারপর দাঙ্গা। সন্দেহ, সংশয়, পশুর মতো হিংস্র দৃষ্টি। অন্ধকারে ঘাতকের উল্লাস। বিবেকের অপমৃত্যু। হারিয়েছে গীতা। তারাপদর বাড়ির সন্দেহস্থল নাসিরুদ্দীন-পরিবার। হাবিবও নিখোঁজ। নাসিরুদ্দীনের পরিবার মনে করে লুকিয়ে রেখেছে বুঝি তারাপদরা। উন্মত্ত জনতার ক্রুদ্ধ, জান্তব চীৎকার। কে বলবে এরা পরস্পর দীর্ঘকাল ধরে পরিচিত। শেষে দে. খা গেল, চীৎকারে বিচলিত হয়ে কৌতুক দেখার আনন্দে চিলেকুঠি থেকে ছাদের রেলিং ঘেঁসে দুই শিশু দাঁড়িয়ে —গীতা আর হাবিব। দাঙ্গাটাই তো ছেলেমানুষি। এমন সুস্থ ব্যঙ্গ-মনোভাব পেয়েছি একমাত্র অন্নদাশঙ্করের ছড়ায়। 'স্থানে ও স্থানে'-র বক্তব্যও অনুরূপ। একজনের বাপের বাড়ি হিন্দুস্থানে, শ্বশুরবাড়ি পাকিস্তানে। রাষ্ট্রনৈতিক সংঘর্ষে দেশ বিভক্ত হল বটে, কিন্তু এ বিভাগ প্রায় অসম্ভব। বাংলার প্রতিটি ব্যক্তির পারিবারিক জীবন এতে ক্লিষ্ট।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের শিল্পরূপ নিয়ে বিতর্ক আছে। কোথাও মনে হয় তিনি আশ্চর্যরকম শিল্পসচেতন; যেমন 'হাত', 'সিঁড়ি', কালো-বাজারে প্রেমের দর', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী', 'হারানের নাতজামাই'। নানা সময়ে লেখা গল্প যদৃচ্ছ উল্লেখ করা হল। কোথাও

প্রতীকী তাৎপর্য গল্পের বিষয়ের সঙ্গে নিঃশেষে মিলে গেছে। যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই লেখক বলেছেন। কিছু কম নয়, কিছু বেশীও নয়। উল্লিখিত শেষ দুটি গল্প রাজনৈতিক পরিস্থিতিরই সাহিত্যভাষা। এক্ষেত্রে সংবাদসর্বস্বতা বা প্রচারধর্মিতার বিপদ অত্যন্ত বেশী। কিন্তু আশ্চর্য চরিতার্থতায় নাটকীয় উপস্থাপনার কৌশলে তিনি সে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছেন।

কিন্তু আমার মনে হয়, শিল্পরূপ সম্বন্ধে মানিকবাবুর সতর্ক চেতনা ছিল না। যা প্রেমেন্দ্র মিত্রে সর্বদা সক্রিয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতা অনুশীলন ও জীবনবিন্যাস মিলে একেকটি গল্পের অবয়ব তৈরি করে দিয়েছে। যেখানে তিনের রাসায়নিক মিলনে বাধা জন্মেছে, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর যোগ ঘটেনি অন্তরের গভীরে, সেখানেই গল্পরূপে এসেছে শৈথিল্য, সামঞ্জস্যের অভাব। এ সমস্যা তাঁর গল্পের চিরন্তন সমস্যা। বোধকরি তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মূল্যায়নেও এই সমস্যা সবচেয়ে দুর্গম। একই গ্রন্থে আশ্চর্য সংযম, পরিমিতি বোধ, আবার বাক্‌সর্বস্বতা, নিটোল বাঁধুনির পরে দুর্বল কাঁটা-ছেঁড়া খসড়া। তাই 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'র পাশে স্থান পায় 'বাগ্দীপাড়া দিয়ে'। বাগ্দীপাড়ায় নতুন চেতনা সঞ্চারের পরিচয় আছে; আর তারা জমিদারের গোলাম হয়ে গরীব প্রজাদের ঘরে আগুন লাগাবে না, ধর্মের গোলামি থেকেও তাদের মুক্তি চাই। তাই বানের জল নিকাশের জন্য নালা তৈরি হল ঠাকুরের বেদি কেটে। দুলেকে সেই জলে ভাসিয়ে দেওয়া শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের শেষ দুটি বাক্যের মতোই শিল্পের দিক থেকে হানিকর। যা ব্যঞ্জনায় অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী, প্রত্যক্ষভাষণে তাতেই শিল্পের অপলাপ।

'মানুষ হাসে কেন', 'ট্রাজেডির কেন', ছিনিয়ে খায়নি কেন', 'গলায় দড়ির কেন' —নিঃসন্দেহে লেখকের সন্ধানী মনের পরিচয়। কিন্তু কি পেলেন জীবনশিল্পী তাঁর সেই সন্ধানী জিজ্ঞাসায়? না-খেয়ে ঝিমিয়ে পড়ে মানুষ, তাই ছিনিয়ে নিতে পারে না? তাহলে ভৈরব কি করে রুখলো শক্তিমান নারী-শিকারীদের সমবেত শক্তির জোরে? সেই জোরে ছিনিয়ে খেতে পারত। মনোহরের স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল পেটের দায়ে। তাই সে দ্বিতীয়বার শয্যাসঙ্গিনী নিয়েছে, কিন্তু আর বিবাহ করেনি। যতদিন পারবে, পুষবে, তার মুখ চেয়ে আর একটি মানুষকে সে আত্মহত্যা করতে দেবে না। এই ব্যাখ্যা কি যুক্তিসম্মত, মার্কসবাদী এথিকস-সম্মত? অতি-

সরলীকরণ দোষে কোনো কোনো গল্প শিল্প হয়ে উঠতে পারেনি। যেমন 'গুণ্ডা', 'কোনদিকে', 'একটি বখাটে ছেলের কাহিনী', 'ছাঁটাই রহস্য' প্রভৃতি। রচনাগুলি মন্তব্যভারে পীড়িত, তাদের রঙে রসে ফুটে উঠতে দেওয়া হয়নি।

'গুণ্ডারা একজাত' এবং 'অত্যাচার মানেই বিকার'—সিদ্ধান্ত হিসেবে মিথ্যে নয়, কিন্তু 'মেজাজ' গল্পের মেজাজের পক্ষে কি এ-সব কথা অবান্তর নয়! হিটলার এবং নারী-লুঠেরা সকলেই একজাতের গুণ্ডা বললে বোধহয় ফ্যাসিবাদের ঐতিহাসিক রাজনৈতিক তাৎপর্য অস্বীকার করা হয়। যেমন 'উপায়' গল্পে মল্লিকার উপায়-আবিষ্কার। প্রমথরা অত সহজে মরে না। একটি ঘটনা ব্যতিক্রম হতে পারে, কিন্তু দুঃস্থানারীর আত্মরক্ষা করে জীবিকা উপার্জনের 'উপায়' ঐ পথে মিলতে পারে না।

আরেকটি গল্পের রস-পরিণাম নিয়েও সংশয় জাগে। গল্পটির নাম 'সতী'। 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশের সময়ই পড়ে বেদনাবোধ করেছিলাম। কিন্তু মানিকবাবুর অনুরাগী পাঠক মাঝে মাঝেই প্রত্যাশা-ভঙ্গের বেদনায় যেহেতু অভ্যস্ত, তাই শেষ পর্যন্ত রচনার দ্রুততা, লেখকের নিয়ত-নিরীক্ষার কথা ভেবেই নিরস্ত হতে হয়। মধ্যযুগে 'সতী' বলতে বোঝাত স্বামীর সহমৃতা। গল্পের 'সতী' চরম দারিদ্র্যক্লিষ্ট এক সতী, সিঁদুরের বদলে ইঁটের গুঁড়ো সিঁথিতে দিয়ে স্বামীর কল্যাণ সাধে, কিন্তু শিশুপুত্র ও স্বামীকে নিয়ে সে সুখী জীবনের স্বাদ পেল না। নিজে অনাহারী, তাই শিশুর মুখেও দুধ জোগাতে পারে না। যখন স্বামী মরল না খেয়ে, তখন শিশুর কান্না থামাতে না পেরে আছাড় মেরে শিশুকে মেরে সে সতী হয়েছে বাসের তলায় আত্মহত্যা করে। লেখকের পর্যবেক্ষণ সত্য, আজো এমন ভয়ানক ঘটনা ঘটে। জঠর-জ্বালার নিবৃত্তি করতে না পেরে পুত্রকন্যা-সমেত গোটা পরিবার আত্মহত্যা করছে। কোথাও বা অসমাপ্ত এই হত্যাকাণ্ডের কথা স্বীকারোক্তির মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু যা-ঘটে, তাই কি সাহিত্যের সত্য? কমিউনিস্ট লেখক ব্যাক্তলেও মা হয়ে শিশুসন্তান হত্যার বীভৎসতা বর্ণনা করবেন কেন? সমাজের নিষ্ঠুরতা বর্ণনার জন্য মাতৃমনোভাবের উচ্ছেদ দেখানো অপরিহার্য নয়, অভিপ্রেতও নয়। অথচ তারই পাশে 'ফেরিওয়ালা' গল্পটি লেখকের মানস-পরিবর্তনের সাক্ষ্যবহ। মধ্যবিত্তের অভিমান ভাঙছে, মোহ ভাঙছে। সে সুখেন্দুর মতো কারখানার

টার্নার ('শান্তিলতার কথা') হচ্ছে, সুশান্তর মতো ট্যাক্সিচালক ('প্যাক') হচ্ছে, আবার ফেরিওয়ালাও হচ্ছে। তিনটি অভাবী সংসার, একের আয়নায় অপরে নিজেকে দেখেছে। এই দেখাতেই গল্পের সার্থকতা। 'বিচার' বা 'ঢেউ' চরিত্রপ্রধান নয়, পরিস্থিতি-প্রধান গল্প। কিন্তু বক্তব্য ও শিল্পরূপের দিক থেকে নিখুঁত। দুটিই মতিলালের গল্প। কারখানায় ধর্মঘট হবে—মাত্র এক ঘণ্টা পরে। মতিলাল একজন অগ্রণী শ্রমিক। ভজিলাল বিরোধী ইউনিয়নের। তাই পুরনো বন্ধুর সঙ্গে এখন তিক্ত সম্পর্ক। মতিলালের মতে ভজিলাল দালাল। কিন্তু ভজিলালের মেয়ে রামপিয়ারী বিরোধের অবসান ঘটালে। সে একজন মজুরের মেয়ে এবং মজুরাণী। তাই কংগ্রেসী ভদ্র ট্রেড-ইউনিয়নিস্ট গোষ্ঠীদের চেয়ে সহজে বুঝেছে মজুরের সমস্যা, মজুরির সমস্যা। ভজিলাল মতিলাল মিলে গেছে। আন্দোলনের ঢেউ সাড়া জাগিয়েছে পেছিয়ে-পড়া ভজিলালদের মনে। 'বিচার' গল্পে আছে মতিলালের ন্যায়-বিচার। জলের লাইনে সবাই দাঁড়িয়ে। সকলেরই তাড়া, কাজ আছে। তবু লাইন চাই শৃঙ্খলার জন্য। কেউ লাইন ভাঙছে না। আবার কারুকে আগে দিতে হয়। সেটা মনুষ্যত্ব বোধের দায়ে। সুধীর লক্ষ্মীকে লাইন ছেড়ে দেওয়া অত্যন্ত ন্যায়বিচার হয়েছে। প্রত্যেকে অভাবী, প্রত্যেকে খেটে-খাওয়া মানুষ। কিন্তু প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য উন্মুখ। গোটা বস্তিতেই একপ্রাণ, একতা। শিল্পী মানিকবাবুর গোত্রান্তর এইসব গল্পে সার্থক, রসের দিক থেকে চরিতার্থ।

আমরা 'বিশপস ক্যাণ্ডেলস্টিকস্' পড়েছি, পড়েছি লেডি গ্রেগরির 'রাইজিং অফ দি মুন'। গর্কির গল্পে-উপন্যাসে আছে রাজনৈতিক কর্মীদের আত্মগোপনের কথা। খাঁটি দেশজ পরিবেশে বোধহয় জোতদার বনাম কৃষকের 'তেভাগা' লড়াইয়ের ছবি এখানে অঙ্কিত। ভুবন মণ্ডল কোনো অসাধারণ চেহারার বাবু-জননায়ক নয়, তাহলে চাষার ঘরে তাকে গোপন করা কঠিন হত। গোটা গ্রামে যে-মানুষটির জন্য ঘর আছে, তার নাগাল পুলিশ পায় না। পুলিশী সন্ত্রাস শাসকশ্রেণীর বৈশিষ্ট্য। সমবেত মানুষের লড়াই, জনগণের সঙ্গে নেতায় একাত্মতা উজ্জীবিত কৃষকসমাজের বৈশিষ্ট্য।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের সঙ্গে তারাশঙ্করের গল্পের সামগ্রিক তুলনা অবান্তর। দুই সমকালীন শিল্পীর দৃষ্টিকোণ ভিন্ন। জীবন থেকে সত্য উপলব্ধির আগ্রহ ভিন্ন। কিন্তু সূচনাপর্বে কিছু সাদৃশ্য ছিল।

'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পমালার সূত্রে 'দেবতার ব্যাধি', 'বেদেনী' বা 'অগ্রদানী' গ্রথিত হতে পারে। উভয়ের বাস্তবতা-বোধ তখনো Critical Realism ছাড়াতে পারেনি। তার সঙ্গে আছে জীবনের Elemental force-কে দেখানোর আগ্রহ। তাই তারাশঙ্কর ও মানিক উভয়েরই প্রথম পর্যায়ের গল্পে বিকৃত চেহারার মানুষ, আসুরিক মানুষের বর্ণনা আছে। তফাৎ এই, মার্কসবাদে দীক্ষিত হবার আগেই মানিকবাবু মনোবিশ্লেষণের (বিকলনের ?) গভীরে আগ্রহী হন, তখন মানুষের চেহারা আর চরিত্রকে চালিত করেনি। কিন্তু তারাশঙ্করের এ প্রবণতা শেষ পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। তাঁর 'কালাপাহাড়', 'তমসা', 'বেদেনী', প্রভৃতি একই বিশ্বাসের বিন্দুতে স্থির।

বাগ্দী দুলে কাহারদের জীবন নিয়ে দু'জনেই সাহিত্য রচনা করেছেন। দু'জনের রচনাতেই দুর্ভিক্ষ, চোরাচালান, কন্ট্রোল, মজুতদারী, জমিদারের গুপ্তহত্যা, নারীলোলুপতা, ওষুধে ভেজাল ইত্যাদির বর্ণনা আছে। কিন্তু নতুন যুগের হাওয়ায় বদলে যাচ্ছে মেহনতী অন্ত্যজ মানুষেরা। তারা ভাঙা শিরদাঁড়া উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে। এই সত্য মানিকবাবু দেখেছেন, বন্দনা জানিয়েছেন। তারাশঙ্কর আদিম জীবনের লালসা ও রিরংসার সমন্বিত মূর্তিকেই বলিষ্ঠতা ভেবেছেন, তার বিলোপে দুঃখ পেয়েছেন। 'শুকসারী-র নয়বালার মধ্যে তারাশঙ্করের শিল্পীসত্তাই 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' শুনিয়ে স্টেশনের নবাগতদের আকৃষ্ট করতে চেয়েছে। ট্রেনের গতির শব্দকে ছাপিয়ে সেই করুণ—'তাই ঘুনাঘুন তাই ঘুনাঘুন' বেশিদূর পৌঁছবে কি ? তাই ময়না, রামপিয়ারী, মতিলাল, ভৈরবরা আশেপাশে থেকেও তাঁর নজরে পড়েনি।

বলা বাহুল্য, তাতে বাংলা ছোটগল্পেরই ক্ষতি হয়েছে। তারাশঙ্করের ছোটগল্পের বিস্তার, সমস্যার কেন্দ্রে পৌঁছবার ঐতিহাসিক প্রবণতা সংগ্রামী মানুষের জীবনকে নতুন রূপে শিল্পের অস্তিত্বে পৌঁছে দিতে পারত। কিন্তু তিনি বর্গচরিত্র থেকে চোখ সরালেন না। তাই শেষ পর্যন্ত পাঠকের খেদ থেকে যায়।

মানিকবাবুর গল্পের অনুরাগী পাঠকেরও খেদ অল্প নয়। বেশ অনুভব করা যায়, তিনি সুহৃদসম্মিত সমালোচনার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত ছিলেন। একটু মার্জনা, একটু বর্জনের অভাবে অনেকগুলি গল্প ব্যর্থ হল। 'মেজাজ'-এর ভৈরবের পাশে 'গুপ্তধন'-এর ভীম দাঁড়াবে কেন ? প্রতিশোধে ভূমিহীন

কৃষক কৃষক প্রতিবেশীদের জমি বানে ডোবাবে? 'সতী' গল্পের ফলশ্রুতি প্রগতি লেখক সংঘের লেখকেরা সমর্থন করেছিলেন? 'উত্তরকালের গল্প সংগ্রহ'-এর তৃতীয় সংস্করণেও দেখি রামপদ ('আজকাল পরশুর গল্প') হয়ে গেছে 'কেশব', 'কানাইয়ের বৌ' হয়েছে 'বনমালীর বৌ'। এগুলি ঠিক মুদ্রণ প্রমাদ নয়।

'সখী' গল্পের দুই মধ্যবিত্তনারীর ভদ্রতার মুখোসের নীচে রিক্ততা, দেশ-প্রেম, আদর্শবাদ সুন্দর ফুটেছে। কিন্তু চল্লিশের কোঠায় পৌঁছে না-কি মেয়েদের থাই থাই রোগ হয়—এ-সংবাদ কি ঐ গল্পের সঙ্গে অপরিহার্য? এ-সব প্রশ্ন ওঠেনি কেন? অথচ গ্লাডকভের 'সিমেণ্ট' যথার্থ সমাজতন্ত্রী বাস্তবতার নিদর্শন কিনা, স্মিরনভের শেকস্পীয়র-ভাষ্য কতটা যান্ত্রিকভাবে মার্কসবাদের নমুনা—এ-সব সূক্ষ্ম বিচারও বাংলা সাহিত্যে হয়েছে।

মানিকবাবুর গল্প সম্বন্ধে শেষকথা না হলেও সারকথা, কোনো বিশেষ রচনার উৎকর্ষ অপকর্ষ দিয়ে তাঁর গল্পের শিল্পবিচার চলে না। তাঁর সৃষ্টির চেয়ে তিনি মহত্তর। তাঁর নিয়ত নিরীক্ষা, গভীর জীবন-সন্ধিৎসায় তিনি একালের সাহিত্যিকদের কাছে নতুন দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন।

ফ্রয়েড থেকে মার্ক্স

সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ডারউইনের বিবর্তনবাদ, ফ্রয়েডের যৌনবাদ এবং মার্ক্সের দ্বন্দ্ববাদ মানবেতিহাসের তিনটি সর্বাধিক বৈপ্লবিক মতবাদ। মতবাদ তিনটির মধ্যে রয়েছে পারম্পর্য। সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে বেদ-বাইবেল-কোরানের অতিপ্রাকৃত আধ্যাত্মিক ভাববাদী ধ্যানধারণা, সংস্কার ও দর্শনের দাপট থেকে এই তিনটি আবিষ্কার মানুষের চিন্তা ও জ্ঞানকে মুক্তি দিয়েছে, দিয়েছে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি।

ডারউইনবাদ সর্বশক্তিমান 'ঈশ্বর'-এর উচ্ছেদ ঘটিয়ে সৃষ্টি রহস্যে 'প্রকৃতি' বা 'জড়জগৎ'-কে স্থাপন করেছে। ফ্রয়েডবাদ ডারউইনের 'দেহতত্ত্বে' 'মনস্তত্ত্ব' বসিয়েছে এবং দেখিয়েছে 'মন' দেহনিরপেক্ষ 'অধি-আত্মা' নয়, মন হল দেহ প্রক্রিয়ার প্রতিফলন, তাপের যেমন উষ্ণতা। এবং মার্ক্সবাদ এই সত্যে পৌঁছে দিয়েছে, মানুষ হল 'সামাজিক', মনসর্বস্ব 'ব্যক্তি' মাত্র নয় আর সমাজের বিবর্তন হল দ্বন্দ্বমূলক।

ডারউইনের বিবর্তনবাদ বাকী দুটি মতের মৌল ভিত্তি। দেহের বিবর্তনের পর মনের বিবর্তন এবং তারপর সমাজ বিবর্তনের বিজ্ঞান গত শতকের তিনজন মনীষীর চিন্তাধারা ধরা দিয়েছে।

সাহিত্য সংস্কৃতিতে উপরিউক্ত মতবাদ তিনটির প্রভাব প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পড়তে শুরু করেছিল। ইংরাজী সাহিত্য হয়ে বাংলা সাহিত্যে এই প্রভাব উনিশ শতকীয় নবজাগরণে বিশেষভাবে পরিস্ফুট। ঈশ্বরবাদ, দেবত্ব ও অতি-প্রাকৃতবাদের মোহ ও কুয়াশা কাটিয়ে শিল্প সাহিত্যে মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা দেখা যায় মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্য'-এ এবং অক্ষয়কুমার বড়াল-এর 'মানব বন্দনা' কবিতায়। ঐ শতকের ছয়ের দশক থেকে ডারউইনবাদ বাংলা সাহিত্যে প্রভাব ফেলেছে।

ফ্রয়েডবাদের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে পড়েছে রবীন্দ্রনাথ থেকে। 'গল্পগুচ্ছ'-এর গল্পগুলিতে চরিত্র সমূহের বিকাশ ও বিক্রিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন (Psycho-analysis) জাত।

'রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টা' কথাটার অন্যতম অর্থ,—

*রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্লটকে গৌণ করে 'চরিত্র' অর্থাৎ 'মানব মন ও আচরণ'-*কে মুখ্য করেছেন এবং ফ্রয়েডবাদের পদ্ধতিতে মনোবিকলন করেছেন। 'গোরা'য় জাতীয়তাবাদী সমাজবাদের ব্যতিক্রমী, ভূমিকা বাদ দিলে, 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি', 'ঘরে বাইরে', 'শেষের কবিতা', 'যোগাযোগ', 'দুইবোন', 'মালঞ্চ', 'তিনসঙ্গী', এমন কি বিপ্লববাদের ওপর উপন্যাস 'চার অধ্যায়'-এ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য সৃষ্টির মৌল প্রেরণা থেকেছে 'প্রেম' এবং এবং সে প্রেমের কম্‌প্লেক্স তিনি ফ্রয়েডীয় মনোদর্শনের পথেই গড়েছেন।

শরৎচন্দ্রের-ও প্রধান উপজীব্য 'প্রেম', তবে তাঁর তীব্র সমাজসচেতনতা এবং রক্ষণশীলতা ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের জটিলতায় জড়িয়েও শেষ পর্যন্ত মার্ক্সীয় নৈতিকতায় সরল পরিণতি লাভ করেছে।

জগদীশ গুপ্ত থেকে থেকে 'কল্লোল' যুগের পথিকৃৎ বুদ্ধদেব বসু, শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু প্রমুখ ফ্রয়েডবাদের 'পাঁকে' অকুণ্ঠ নিমজ্জিত হলেন। 'পাঁক' বলা হল এ কারণে যে এই শতকের তিনের দশকের তরুণ কথাকারগণ ফ্রয়েডবাদের সমগ্রতাবাদ দিয়ে কেবল উপরিতলের 'কাম' তত্ত্বটুকুই নিয়েছেন এবং 'নগ্নতার' অর্থ করেছেন 'বিবস্ত্র'। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রজনী'তেও 'ফ্রয়েড' ছিলেন. রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রে তো খুব বেশী করেই আছেন। কিন্তু বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ ফ্রয়েডবাদ বা মানবজীবনে যৌন প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে সংযম, শোভনতা ও পরিশীলনের উৎকর্ষ দেখিয়েছেন, জগদীশ গুপ্ত ও তাঁর অনুসারী বুদ্ধদেব-অচিন্ত্যের দল তাকে 'রোমান্টিকতা' আখ্যা দিয়ে মপাসাঁ-ফ্লবেয়ার হতে চাইলেন এবং ফ্রয়েডবাদের আক্ষরিক ও আংশিক, অগভীর ও স্থূল উপরিতলটুকু আশ্রয় করলেন। কথাসাহিত্যে বাস্তববাদ বা বস্তুতন্ত্রের নামে 'কল্লোল' যুগ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত যে 'আধুনিকতা', প্রথমে রবীন্দ্রনাথ এবং শেষদিকে শরৎচন্দ্রও যার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, কার্যত ছিল ফ্রয়েডীয় যৌনবাদ। প্রথমে মনোবিজ্ঞানী গিরীন্দ্রশেখর বসু 'স্বপ্ন' নামে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব নিয়ে একখানি এবং পরে নৃপেন্দ্রকুমার বসু ফ্রয়েডের 'লিবিডো' তত্ত্ব নিয়ে দুখানি গ্রন্থ 'ফ্রয়েডের ভালবাসা' এবং 'ফ্রয়েডের নারীচরিত্র' বাংলায় প্রকাশ করেন তিনের দশকে। হ্যাভিলক এলিসের যৌনমনোদর্শন-ও এই

সময় বাংলায় অনূদিত হয়। বাংলা কথাসাহিত্যে ফ্রয়েডবাদ ভিত্তি করে গল্প উপন্যাস লেখার ধুম পড়ে যায়। বিজ্ঞানভিত্তিক কথাসাহিত্য রচনার নামে মার্ক্সবাদের পরিবর্তে কথাশিল্পীগণ ফ্রয়েডবাদ-কেই ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য-এর 'বিবস্ত্র মানব'-এর মতো বেশ কিছু উপন্যাস বাংলার সাহিত্যের বাজার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ছেয়ে ফেলে।

'কল্লোলের কুলবর্ধন' নামে একদা অভিহিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন জিজ্ঞাসাও শুরু হয়েছিল ফ্রয়েডবাদ দিয়ে। তাঁর সাহিত্য রচনা-কালকে প্রথমে দুটি পর্বে ভাগ করা হয় ১৯৩৫ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত (প্রাক্-যুদ্ধ) প্রথম পর্ব এবং ১৯৪১ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্বটিকে অবশ্য দুটি অধ্যায়ে ভাগ করা উচিত: প্রথম অধ্যায় ১৯৪১ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত যুদ্ধকালীন এবং ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬ যুদ্ধোত্তর কিংবা স্বাধীনতা-উত্তর কাল।

প্রথম পর্বটি সম্পূর্ণতঃ ফ্রয়েডীয়। এই কালেই লেখা 'জননী', 'দিবারাত্রির কাব্য', 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'জীবনের জটিলতা', 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' উপন্যাসাবলী এবং 'অতসী মামী', 'প্রাগৈতিহাসিক' 'মিহি ও মোটা কাহিনী' এবং 'সরীসৃপ' পর্যায়ের ছোটগল্পগুলি।

মার্ক্সবাদী সমালোচকগণ যতই জোর গলায় নিজেদের মহলে বলার চেষ্টা করুন যে মানিকবাবুর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'শহরতলী' (নারায়ণ-চৌধুরী), কিংবা 'সার্বজনীন' (সরোজমোহন মিত্র: 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম পর্ব' বর্তমান প্রবন্ধলেখক সম্পাদিত ৯৮০ দ্রষ্টব্য) এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ছোটগল্প 'যাকে ঘুষ দিতে হয়', 'শিল্পী', 'একান্নবর্তী', 'হারানের নাতজামাই', 'মাসীপিসী', 'ফেরিওয়ালা', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' প্রভৃতি উত্তর কালের গল্পসংগ্রহ, সাধারণ পাঠক—অবশ্যই তাঁরা সবাই বুর্জোয়া নন এবং অনেকেই রাজনীতিতে মার্ক্সবাদীদের পক্ষে—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলতে 'জননী', 'পদ্মানদীর মাঝি', পুতুলনাচের ইতিকথা' এবং ছোটগল্পের বেলায় 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সমুদ্রের স্বাদ', 'বউ' পর্যায়ের গল্প-গুলিকেই নির্দেশ করে থাকেন। মোদ্দা কথায়, উত্তরকালের (যখন মানিকবাবু মার্ক্সবাদে কমিটেড্) গল্প উপন্যাস অপেক্ষা প্রথম কালের লেখাগুলির জন্যই (যখন তিনি ফ্রয়েডবাদকে মুখ্য উপজীব্য করে

লিখছিলেন) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর আপমর পাঠকসাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা এবং বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্কর বিভূতিভূষণের সাথে তিন বাঁড়ুজ্যের অন্যতম রবীন্দ্র-শরৎ পরবর্তী শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কথাশিল্পীরূপে মানিকের স্বীকৃতি। সমালোচকগণের যদি গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে তাহলে 'গ্যালপ পোল' করে যে কোনো পত্রপত্রিকা মাধ্যমে মানিক-পাঠকদের মানিকবাবুর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির প্রথম দশখানির সন্ধান যদি নেন তাহলে দেখবেন, তাতে পুতুলনাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি, প্রাগৈতিহাসিক, কুষ্ঠরোগীর বউ গল্প উপন্যাসগুলি শীর্ষস্থানে রয়েছে। বর্তমান লেখক একশত জন যুবছাত্র গ্রন্থপাঠকের মতামত নিয়ে নমুনা সার্ভে করেই এই সিদ্ধান্তে এসেছেন।

'জননী' উপন্যাসে মানিকবাবু যদিও 'প্রেম' বা যৌনসম্পর্ককে উপজীব্য করেননি, তথাপি একজন নারীর বধূ থেকে মাতৃত্বে বিকাশের যে অসামান্য চরিত্রচিত্রণ তিনি করেছেন তা ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের পথ ধরেই হয়েছে। নিজে বধূ থাকা কালীন শাশুড়ীকে যে চোখে দেখেছিলেন, এবং নিজে শাশুড়ী হয়ে পুত্রবধূর প্রতি ঈর্ষায় যে মনের পরিচয় দিলেন,—এ দুয়ের প্রাথমিক স্ব-বিরোধিতা এবং অন্তিম সুসংহতি নারীর প্রেয়সী ও জননী দুই রূপের অনবদ্য বিশ্লেষণ। ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্বের অনুপ্রেরণা না থাকলে এ জাতীয় মনস্তত্ত্ব বাংলা সাহিত্যে অভাবিত হত। তবে প্রথম উপন্যাসে মানিকবাবু ফ্রয়েডবাদের সরলীকৃত বিকৃত যৌন-ক্ষুধার মতলববাজীতে পা দেননি, দিয়েছেন ফ্রয়েড নির্দেশিত গহীন গোপন মনের অতলতায় ডুব।

'পুতুলনাচের ইতিকথা' শিরোনামই বলছে, মানুষ হল 'পুতুল', 'জড়' মাত্র। যে নেপথ্য অশরীরী শক্তি মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে রূপায়িত ও নিয়ন্ত্রিত করছে, তার নাম 'কাম'। ঐ যৌনশক্তি জীবনকে বা মানব-মনকে পুতুলের মত খেলাচ্ছে, নাচাচ্ছে। মানবজীবনের ইতিহাস হল এই জড়ের নাচনকোঁদন! শশী ডাক্তার-কুসুম-মতি-কুমুদ-সেনদিদি-অমূল্য-অনন্ত-বিন্দু-গোপাল-দের নিয়ে গাওদিয়া গ্রামে মানুষের মিছিলে লেখক একটাই অনির্দেশ্য অপ্রতিরোধ্য শক্তির লীলা দেখে বেদনায় বিক্ষুব্ধ হয়েছেন —সে শক্তির নাম 'লিবিডো'। উপন্যাসখানিতে বারবারই লেখক 'পুতুলের মতোই চেতনাহীন', 'পুতুলের মতোই কর্তব্যকর্ম' সমাধার কথা বলেছেন।

আদর্শবাদী শশী ডাক্তার, যে কুসুমের 'আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু' কথার উত্তরে মনে মনে বলে—"শরীর! শরীর! তোমার মন নাই কুসুম",—সেও কিন্তু শেষ অবধি কুসুমের চলে যাবার সময় দুর্বল হয়ে যায়, তাকে তার সাথে থাকতে বলে। কেন এমন হয়? এই পর্যায়ে মানিকের উত্তর—লিবিডোর জন্য।

অথচ তীব্রভাবে ফ্রয়েডীয় এই উপন্যাসেও মানিক শশীর চরিত্রায়ণে বলেন, 'শশী ইহাও বুঝিয়াছে যে জীবনকে শ্রদ্ধা না করিলে জীবন আনন্দ দেয় না। শ্রদ্ধার সঙ্গে আনন্দের বিনিময়, জীবন দেবতার এই রীতি।'

এই জীবনবোধ থেকেই পরে মানিক মার্ক্সবাদে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

'পদ্মানদীর মাঝি' একখানি শ্রেষ্ঠ মার্ক্সবাদী উপন্যাস হয়ে ওঠার সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল। মানিকবাবু এখানে যে-মাঝিদের জীবনকে উপজীব্য করেছেন বাংলা কথাসাহিত্যে তারা ছিল অভাবিত। শৈলজানন্দ 'কয়লা-কুঠীর দেশে' উপন্যাসে কয়লাখনির শ্রমিকদের জীবন নিয়ে এসেছিলেন এর পরেই, কিন্তু তা শ্রেণীসংগ্রামের কাহিনী হয়নি, হয়েছে শুধু জীবন সংগ্রামের বাস্তব চিত্র। কিন্তু মানিক কুবের-গণেশ-আমিনুদ্দি-যুগল-রাসু-প্রীতম-কপিলা-মালা-গোপীদের যে কাহিনী নিয়ে এলেন, আক্ষরিক অর্থেই তা হল সর্বহারার গল্প। পদ্মাপাড়ের কেতুপুর গ্রামের নিঃস্ব রিক্ত মাঝিদের জীবনে হোসেন মিঞার হওয়ার কথা প্রতারক, শোষক, জোতদার, মহাজন বা বুর্জোয়ার ঝানু মুৎসুদ্দি এবং ে র ময়নাদ্বীপ হওয়ার কথা সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশের প্রতীক। কিন্তু তা হয়নি। হোসেন মিঞার প্রতি ঘৃণার পরিবর্তে কবি ভাবুক সৃজনশীল রহস্যময় মানু' হিসাবে লেখকের অনুরাগই প্রকাশ পেয়েছে। সর্বোপরি কুবেরের মতো একজন নিঃস্ব নিরীহ গোবেচারা জেলের কপিলার দ্বারা যৌনতায় প্ররোচিত (seduced) হওয়া এবং খোঁড়া বউ-মেয়েকে ফেলে কপিলাকে নিয়ে ময়নাদ্বীপ যাত্রা ফ্রয়েড্‌বাদের ভয়ঙ্কর অনিবার্যতায় উপনীত করে। এ উপন্যাসেও তাই মানিকবাবু জীবনজিজ্ঞাসা ও দুর্জ্ঞেয়তার অনুসন্ধানে যৌন শক্তিরই জয় দেখিয়েছেন।

'দিবারাত্রির কাব্য' ফ্রয়েডবাদের রূপক। গল্প উপন্যাসের তথাকথিত 'শাশ্বত ত্রয়ী' (Eternal Triangle) বা ত্রিভুজপ্রেমের সমস্যা ও সম্পর্কের 'পারমুটেশান' ফ্রয়েডীয় তত্ত্বেরই অভিজ্ঞান। হেরম্ব-সুপ্রিয়া-অশোক ত্রিভুজ প্রেমের দ্বন্দ্ব ও কুটৈষণা ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের ছাঁচে ঢালা। কৈশোরে সুপ্রিয়ার

হেরম্বের প্রতি আসক্তি জন্মায়, কিন্তু তার বিয়ে হয় অশোক দারোগার সাথে। সুপ্রিয়ার অবচেতন মনে কৈশোরপ্রেম বাসা করে থাকে। হেরম্বের অবচেতনের অবস্থাও অনুরূপ। অতএব সে স্ত্রী উমার প্রতি 'শীতল'। অপরিতৃপ্ত উমা তাই আত্মহত্যা করে। এর ফলে হেরম্বের অবচেতনে জন্মায় স্ত্রীহত্যার অপরাধবোধ। অন্য একটি উপকাহিনীতে রয়েছে অনাথ-মালতী। তাদের জীবনও বিকৃত মানসিকতায় উদ্‌ভ্রান্ত ও অসুখী। মালতী প্রেম করে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করলেও অনাথের প্রতি এখন সে বিমুখ। দুই অসুখী অতৃপ্ত দম্পতি তাই সাধনভজনের আত্মপ্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। এদের কিশোরীকন্যা আনন্দের প্রতি হেরম্ব হল আসক্ত; আনন্দও প্রৌঢ় হেরম্বকে ভালবাসল। এই যে কাহিনী, এর প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্রই ফ্রয়েডীয় যৌনতত্ত্বের দ্বারা নির্মিত। এ উপন্যাসে যে আত্মহত্যা ও হত্যার বাসনা রয়েছে—অশোকের হেরম্ব ও স্ত্রীকে হত্যার ইচ্ছা, হেরম্বের স্ত্রীর মৃত্যুকামনা কিংবা প্রৌঢ়ের প্রতি কিশোরীর আসক্তি ও কৈশোর প্রেমের অবচেতন মনে অবস্থানের যে মনস্তত্ত্ব, তা যে আন্‌কোরা ফ্রয়েডীয় প্রভাব, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

'জীবনের জটিলতা' উপন্যাসে মানিক প্রেম সম্পর্কের জটিলতাই দেখিয়েছেন। বিমল ভালবাসত লাবণ্যকে। অথচ সে একই সঙ্গে আসক্ত হল সহ-ভাড়াটিয়া অধরের স্ত্রী শান্তার প্রতি। অবশ্য বিবাহিতা শান্তা-ই প্রথম তার প্রতি অনুরক্তা হয়। একটি ত্রিভুজে এইভাবে রইল বিমল-শান্তা-অধর। আর একটি ত্রিভুজও তৈরী হল 'ক্রস-কানেকশান' প্রক্রিয়াতেই: বিমলের বোন প্রমীলাকে ভালবাসত যে-নগেন সে সরে গিয়ে ভালবাসতে শুরু করল বিমলের প্রাথমিক প্রেমিকা লাবণ্যকে। এই উদ্ভট cross-connection প্রেম ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারার ফল। বিমল, নগেন শেষ পর্যন্ত লাবণ্য, প্রমীলা, শান্তাদের কে কাকে বিয়ে করল এবং কে ফাঁকে পড়ে থাকল, সে কৌতূহল না মিটিয়ে এটুকু বললেই কাজ চলে যে, বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের চিত্র থাকা সত্ত্বেও মানিকবাবু এখানেও 'ভাববাদ ও বস্তুবাদের সংঘাতে' বিপর্যস্ত।

'অমৃতস্য পুত্রাঃ' (১৯৩৮) প্রথম পর্বের শেষ উপন্যাস। এখানে ফ্রয়েড ও মার্ক্স উভয়েই অংশত আছেন। ধনাঢ্য বীরেশ্বর দ্বিতীয় দার গ্রহণ করায় প্রথমা স্ত্রী পুত্র শ্যামলালকে নিয়ে অন্যত্র যান। শ্যামলালের পুত্র অনুপম কিন্তু

প্রাচুর অর্থে বিলেত গিয়ে 'ক্যারিয়ার' গড়তে চায়। আদর্শনিষ্ঠ পিতার আদর্শভ্রষ্ট অর্থসর্বস্ব পুত্রের চরিত্র-ই কাহিনীটির মূল বিষয়, যদিও তরঙ্গ নামে একটি রহস্যময়ী মননশীলা নারী চিরকুমারী থাকা এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন আনার কাজে আত্মনিয়োগের ঘোষণা করে আত্মহত্যা করে বসে। এর থেকেই বোঝা যায় মার্ক্সীয় রাজনীতি মাথায় একটু একটু প্রবেশ করলেও এখনও মানিকবাবু ফ্রয়েডীয় যৌনবাদের নেশার আচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

ছোটগল্পের ক্ষেত্রে মানিকবাবুর ফ্রয়েডে অবস্থান কতদূর ও কতদিন ছিল তা অন্যতম মার্ক্সবাদী সমালোচক ডঃ সরোজমোহন মিত্রের বকলমে বলা যাক: 'এই গল্পগুলোর সব কটি গল্পই যৌন জীবনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রকাশ করেছে। এই জীবনে যে বিকৃতি আছে তাকেই মানিকবাবু তুলে ধরেছেন।' 'ভেজাল' গল্পগ্রন্থের (১৯৪৩) সম্পর্কে এই মন্তব্যের পর 'প্রাগৈতিহাসিক'-এর গল্পগুলি সম্পর্কে: 'এ গ্রন্থেও ফ্রয়েডের প্রভাব অনুভূত হয়। প্রেম এখানে এক অন্ধ যৌনক্ষুধা ছাড়া আর কিছু নয়।' প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অতসীমামী'র গল্পগুলি সম্পর্কেও একই কথা: 'এই গল্পগুলিতে আছে পাশ্চাত্য, ফ্রয়েডীয় এবং শরৎচন্দ্রের প্রভাব।' 'মিহি ও মোটা কাহিনী' (১৯৩৮) প্রসঙ্গে: 'এই গল্প সংকলনে মানিকের উপর ফ্রয়েডের বহুল প্রভাব বিদ্যমান।' 'সরীসৃপ' (১৯৩৯)-এর প্রসঙ্গেও ওই একই কথা, 'মানব মনে নানা যৌনক্রিয়ার যে বিচিত্র জট পাকিয়ে রয়েছে তাকেই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন।' [মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য]

প্রসঙ্গত, সরীসৃপ, সর্পিল,—এই নামকরণগুলিও ফ্রয়েডীয়; ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্বে সাপ লিবিডোর বা কামের প্রতীক। এছাড়া 'প্রাগৈতিহাসিক' নামকরণের তাৎপর্যেও রয়েছে ফ্রয়েডবাদ; কেননা ফ্রয়েডই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে যৌনক্ষুধা-ই হল আদিমতম, ভূমিষ্ঠ হবার মুহূর্ত থেকে অবিচ্ছিন্ন রূপান্তরের মাধ্যমে প্রাচীনতম জীবনধর্ম। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আবহমানকাল ঐ আদিম রিপুই জীবজগৎকে চালিত করছে।

এই বক্তব্যের বিপরীততত্ত্ব এনেছেন মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স। যৌনবাদের ক্ষুদ্রতা, নীচতা, জড়ত্ব ও অসম্মান থেকে মানবজীবনকে মুক্তি এনে দিলেন যে সমাজবিজ্ঞানী মার্ক্স, মানিক তার দ্বারা তাঁর সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করে

তুলতে শুরু করলেন ১৯৪১-এ 'শহরতলী' উপন্যাস দিয়ে। এর পর মার্ক্সবাদ ভিত্তিক উপন্যাস লিখলেন প্রতিবিম্ব (১৯৪৩), দর্পণ (১৯৪৫), শহরবাসের ইতিকথা, চিন্তামণি, চিহ্ন (১৯৪৬), জীয়ন্ত (১৯৫০), স্বাধীনতার স্বাদ (১৯৫১), সোনার চেয়ে দামী (১৯৫২), সার্বজনীন (১৯৫২) প্রভৃতি। কিন্তু লক্ষণীয় যে, মানিকবাবুর এই 'উত্তরণ' সার্বিক নয়। মার্ক্সবাদী কথা-সাহিত্যে তিনি ১৯৪১-৫২ সময়কালেও নিশ্ছিদ্র থাকেননি। রাজকুমার নামক এক 'পার্ভাটেড্' যুবকের চতুর্মুখী প্রেমের বিজ্ঞানভিত্তিক নিরীক্ষার নামে 'চতুষ্কোণ'-এর মতো অদ্ভুত ফ্রয়েডীয় যৌনবিকারের কাহিনী তিনি দিব্যি রচনা করলেন যখন তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এবং সবে 'চিহ্ন' নামক রসিদ আলী দিবসের ছাত্র-আন্দোলনের ওপর অনন্য মার্ক্সবাদী উপন্যাসখানি উপহার দিয়েছেন। 'চিহ্ন' (১৯৪৭) ও 'চতুষ্কোণ' (১৯৪৮)-এর প্রায় একই সঙ্গে প্রকাশ থেকে এই সিদ্ধান্তই সত্যের খাতিরে অনিবার্য হয় যে, মানিকবাবুর চিন্তাধারা কখনোই ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়নি এবং তাঁর মার্ক্সবাদে উত্তরণ শেষাবধি ফ্রয়েডবাদের পিছুটানে বিড়ম্বিত হয়েছে।

এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে 'চতুষ্কোণ'-এর অতিরিক্ত সাক্ষ্যও দেওয়া যায়। ডঃ মিত্রের কথায়, 'আরোগ্য (১৯৫৩) থেকে মানিকের উপন্যাসের অন্তিম পর্ব শুরু। এই সময়কার উপন্যাসগুলোতেও মানিকের সমাজসচেতনতার পরিচয় আছে, বলিষ্ঠ বাচনভঙ্গী আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ পর্বের উপন্যাস-গুলোতে এসেছে চিন্তার অসংলগ্নতা, নামের অসঙ্গতি।' শেষ পর্বের উপন্যাস-গুলিতে মানিক অনেকটাই ফিরে গেছেন যুদ্ধপূর্ব প্রথম পর্বে—সেই ব্যক্তি-কেন্দ্রিক চারিত্রিক জটিলতা ও মনোবিকলনে। তফাৎ এইটুকু যে, এ পর্বে চরিত্রগুলি কেরানী, মজুর, চাষী, মাঝি,—কিন্তু শ্রেণীসংগ্রাম নয়, ব্যক্তিগত সম্পর্কই উপজীব্য। 'নাগপাশ' উপন্যাসটিতে ধর্মঘট আছে, রাজনীতি করে চাকরী খোয়ানোর কথাও আছে, কিন্তু কোনো লক্ষ্য ও বলিষ্ঠ বক্তব্য নেই। 'চালচলন', 'শুভাশুভ', 'পরাধীন প্রেম', 'হলুদনদী সবুজ বন', 'মাশুল', মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান' প্রভৃতি সর্বত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক চরিত্রসৃষ্টি, অসংলগ্ন অস্পষ্ট বক্তব্য। এর মধ্যে সামান্য ব্যতিক্রমী, এক ঝলক আলোর মত মার্ক্সীয় সৌন্দর্যে ভাস্বর উপন্যাস হল 'হরফ'।

এই একই কথা বলা যাবে ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও। 'উত্তরকালের গল্প

সংগ্রহ' মানিকের ফ্রয়েডমুক্ত মার্ক্সবাদী কথাশিল্প রচনার এক অনুপম নজির। কিন্তু ঐ সংগ্রহের গল্পগুলি, কালানুক্রমিক নিরবচ্ছিন্ন নয়। প্রথম পর্বে মানিক লেখেন মোট ১০৬টি গল্প; উত্তরকালের গল্পসংগ্রহে আছে ৫৮টি গল্প। শেষোক্তগুলি মার্ক্সীয় চিন্তাধারায় রচিত, যদিও এর মধ্যে 'কুষ্ঠরোগীর বৌ'-এর মত ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বমূলক গল্পও আছে।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে, বুদ্ধিজীবিগণের যে-অংশ সাহিত্যে রাজনীতি বিশেষতঃ মার্ক্সবাদের প্রতিফলন দেখে সরস্বতীর পদ্মবনে মত্ত হাতীর দাপাদাপি মনে করে ভ্রূকুঞ্চন করেন আর যে-অংশ সাহিত্যে প্রেম-রোমান্স দেখেই 'ফ্রয়েড' মনে করে প্রতিক্রিয়াশীলতা ও অপসংস্কৃতির ভূত দেখেন, তাঁরা উভয়তই বাড়াবাড়ি করেন। মানিকবাবু ছিলেন মনের দিক থেকে বিজ্ঞানী। সারা জীবন তিনি প্রশ্নাকুল ছিলেন, মানবজীবনের প্রকৃত নিয়ন্তার সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। এক সময় তিনি ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান সূত্রে জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজেন। কিন্তু তাতে তাঁর পরিতৃপ্তি হয় না। তাই পরে তিনি মার্ক্সবাদে, কমিউনিজমে, সর্বহারার একনায়কত্ব ও আন্তর্জাতিকতায় মানব সমাজের শোষণ ও বৈষম্যমুক্তির পথ দেখতে পান। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানব-সম্পর্ক নির্মাণে 'লেবার' (Labour)-এর সাথে 'লিবিডো'র ও যে কতকটা স্থান আছে তা তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। এটা স্ব-বিরোধিতা বা বিচ্যুতি নয়, বরং এই সংশ্লেষেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ণতা ও সাফল্য।

'কমিটেড' লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়

আজকের বুদ্ধিজীবী মহলে বহুল প্রচারিত শব্দগুলির মধ্যে Commitment অন্যতম প্রধান একটি শব্দ বলে গণ্য করা যেতে পারে। একটি শব্দের জন্মের পর থেকে সভ্যতা এবং জীবনপ্রবাহের ধারাবাহিক গতির বাঁকে বাঁকে সে নিজের অর্থের দ্যোতনা পরিবর্তন করে। কখনো সীমানা ছাড়িয়ে আরও ব্যাপক ব্যঞ্জনায় শব্দটি মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। কখনো বা ব্যাপকতা বর্জন করে একটি গণ্ডীর মধ্যে সীমায়িত হয়ে যায়। নির্বিশেষ প্রবণতা থেকে নিবদ্ধ হয়ে যায় বিশেষে। Commitment অর্থে আমরা বুঝি দায়বদ্ধতা। একটি বিশেষ স্বার্থ, সত্তা বা শ্রেণীর পক্ষে চিহ্নিত হয়ে যাওয়া। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই দায়বদ্ধতা সত্যের প্রতি হতে পারে। হতে পারে জীবনের প্রতি, অথবা দুই পরস্পর বিরোধী সংগ্রামরত যে সামাজিক শক্তিগুলোর সংঘর্ষ ও একের বিরুদ্ধে অন্যের জয়লাভে তিলে তিলে সভ্যতার অগ্রগতি ঘটে—এই দুই পক্ষের যে কোন একটির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনও হতে পারে। Commitment শব্দটি জীবন বা সত্যের প্রতি দায়বদ্ধতার ব্যাপক অর্থ ক্রমশঃ ত্যাগ করে বলা যেতে পারে আজ তার চূড়ান্ত পরিণতিতে এসে পড়েছে। আজকের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে কোন সচেতন মানুষ, শিল্পী বা বুদ্ধিজীবীর Commitment বলতে আমরা বর্তমান যুগে সভ্যতার অগ্রবর্তী বাহিনীর বা তার চিন্তা ও দর্শনের প্রতি আনুগত্যকেই বুঝি।

কোন কোন লেখক বা চিন্তাশীল ব্যক্তি কোন একটি শ্রেণী বা দর্শনের প্রতি দায়বদ্ধ, এভাবে নির্দিষ্ট করে দিলে স্বভাবতই মনে করার যথেষ্ট কারণ থাকে, যেন এমনও অনেকে থাকতে পারেন চিন্তা বা শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে যাঁদের কারুর প্রতিই কোন দায়বদ্ধতা বা আনুগত্য নেই। কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলে কারুরই বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, যেহেতু সমাজ ও সভ্যতা, শিল্প চর্চা এবং চিন্তাবিকাশের শুরুর যুগ থেকেই স্পষ্টত দ্বিধাবিভক্ত এবং যাঁরা চিন্তা বা শিল্প সৃষ্টি করেন তাঁরাও যেহেতু এই দুই ভাগের যে কোন একটাতে থাকতে বাধ্য তাঁদের সৃষ্ট ফসল তাই এই দুইয়ের যে কোন একটির পক্ষে না হয়ে পারে না।

চিন্তার যন্ত্র হল মস্তিষ্ক। মানবদেহের এই অঙ্গটি, সকলেই জানেন, অন্যান্য সব অঙ্গের মতই কিছু বস্তুগত উপাদানে তৈরী। অন্যান্য প্রত্যঙ্গ থেকে এর পার্থক্য শুধু এই যে, এর গঠনপ্রণালী অত্যন্ত জটিল এবং সূক্ষ্ম। এই জটিল সংগঠন সম্পন্ন বস্তু নির্মিত যন্ত্রটি যে ফসলের জন্ম দেয় তা কিন্তু বস্তু নয়। যন্ত্র-বিজ্ঞানের একেবারে প্রাথমিক নিয়ম অনুযায়ী মস্তিষ্ক নামক এই অত্যন্ত বিকশিত যন্ত্রটিও আবার অন্যান্য যন্ত্রের মতই বাইরে থেকে রসদের যোগান না পেলে কোন ফসলের জন্ম দিতে পারে না। আবহমান কাল ধরে মানুষের পৃথিবীতে যে অন্তহীন জীবনপ্রবাহ বহমান সেই সমাজ ও জীবনই আমাদের মস্তিষ্কের রসদ। যে কোন চিন্তাশীল মানুষের দায়বদ্ধতা তাই অন্তত: জীবনের প্রতি হতে বাধ্য। জীবনই জন্ম দেয় সত্যের। সমাজ ও জীবনের স্তর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সত্যের ধারণাও তাই যায় পাল্টে, পরম সত্য বলে কিছু থাকে না। সত্য নিয়ত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে—এটুকুই শুধু পরম সত্য। চিন্তাশীল কোন মানুষের আর একটি দায়বদ্ধতা তাই সত্যের কাছে। সমাজের অবিরাম গতিধারার কোন স্তরে জীবনপ্রবাহ যদি দুটি সমান্তরাল স্রোতে প্রবাহিত হয় জীবনের সত্যও তখন দ্বিধাবিভক্ত হতে বাধ্য এবং দুই জীবনধারার যে কোন একটির মধ্যে অবস্থানকারী কোন মানুষ এ দুয়ের যে কোন একটির প্রতি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অনুগত না হয়ে পারে না। কারণ সেই বিশিষ্ট পরিবেশ, অনুষঙ্গ ও শ্রেণী অবস্থান থেকেই গড়ে ওঠে তার জীবন-ভাবন, ও দর্শন।

Non-committed লেখক বা শিল্পী বলে তাহলে কেউ কি থাকতে পারেন? আমাদের মতে এর স্পষ্ট উত্তর হল—না। কেউ ভাবতে পারেন আমার কোন দায়বদ্ধতা নেই। তারস্বরে চিৎকার করে ঘোষণাও করতে পারেন তাঁর এই বিশ্বাসের কথা। ঘুরিয়ে বললে সেটাই তাঁর দায়বদ্ধতা। দুই পরস্পর বিবদমান শিবিরের একটির মধ্যে যাঁর অনিবার্য অবস্থান তিনি যদি বলেন—আমি কারুর পক্ষেই কথা বলতে চাই না, তাহলে তা শুরুতেই ভীষণভাবে সত্যের অপলাপ ঘটালো। কারণ তিনি নিজেকে অবৈজ্ঞানিক-ভাবে এবং অসত্যভাবে এমন জায়গায় স্থাপন করতে চাইলেন যেখানে আদৌ তাঁর অবস্থান নয়। এইরকম চিন্তাধারার মানুষদের দুই শিবিরে বিভক্ত এই বিশ্বের মাটিতে দাঁড়িয়ে আমরা প্রশ্নটা এভাবে করতে চাই, বর্তমান বিশ্বে যে দুটি শ্রেণী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিরন্তর সংগ্রাম করছে

আপনি কি তাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর পক্ষে? এই উত্তরে তিনি যদি হ্যাঁ বলেন তাহলে তাঁর Commitment স্পষ্ট হয়ে যায়। মজা এই—অন্য শ্রেণীটির সম্পর্কে তাঁর মতামত জানার জন্য দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন করার দরকারই হয় না, কারণ এই প্রথম প্রশ্নের উত্তরে তিনি যদি না বলেন তাহলেও তাঁর Commitment স্পষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং সঠিকভাবে উপস্থাপিত করতে না পারলে প্রশ্নটা করা এবং উত্তর দেওয়ার পদ্ধতির মধ্যেই চূড়ান্ত বিভ্রান্তির অবকাশ থেকে যাচ্ছে।

Commitment তাহলে প্রথমতঃ জীবনের প্রতি, দ্বিতীয়তঃ সত্যের প্রতি এবং শেষ পর্যন্ত জীবনকে যাঁরা অনন্ত গতিময়তায় ভূষিত করতে চান তাঁদের আদর্শ এবং কর্মের প্রতি। যে বৈজ্ঞানিক দর্শন এই চূড়ান্ত বিজয়ের পথ নির্দেশক তাকে বাদ দিয়ে বর্তমান যুগের বিজয়ী শ্রেণীর প্রতি নিজের দায়বদ্ধতা গড়েই তোলা যাবে না, এটা ঠিক। কিন্তু তা যদি নাও থাকে, অন্ততঃ সত্য ও জীবনের প্রতি যে কোন বড় মাপের শিল্পীর স্বাভাবিক ভাবেই প্রয়োজনীয় আনুগত্য থাকতে পারে। এমন কি বর্তমান কালের ঈপ্সিত দায়বদ্ধতার আশা-পাশ দিয়েও তিনি হেঁটে যেতে পারেন। কিন্তু আগামী দিনের বিজয়ী মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা বা তার পক্ষে নিজেকে চিহ্নিত করণ সর্বশক্তিমান সমাজদর্শনের কম্পাস ছাড়া কি করে সম্ভব? 'লেখকের কথা'-য় মানিকবাবু বলেছেন, "মার্ক্সবাদই যখন মানবতাকে প্রকৃত অগ্রগতির সঠিক পথ বাতলাতে পারে, অতীত কি ছিল, বর্তমান কি হয়েছে এবং কিভাবে কোন ভবিষ্যৎ আসবে জানিয়ে দিতে পারে, তখন মার্কসবাদ সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে সাহিত্য করতে গেলে এলোমেলো উল্টোপাল্টা অনেক কিছু তো ঘটবেই।" পরে আবার বলেছেন, "মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচিত হবার আগে কেন সাহিত্য করতে নেমেছিলাম ভেবে আত্মগ্লানি বোধ করলে সেটা মার্কসবাদের শিক্ষার বিরুদ্ধেই যাবে, যান্ত্রিক একপেশে বিচারে সৃষ্টি হবে আরেকটা বিভ্রান্তির ফাঁদ।......... জগতে আমি একা মার্কসবাদ না জেনে সাহিত্য চর্চা করিনি—আমার সামান্য লেখার সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যে এঁদের বিপুল সৃষ্টিকে ব্যর্থ আবর্জনা বলে উড়িয়ে দেবার স্পর্ধা আমি কোথায় পাবো?"

এই মুহূর্তে দেশ এবং বিদেশের অসংখ্য কালজয়ী কথাসাহিত্যিকের নাম স্মরণ করা যেতে পারে যাঁদের শিল্পচর্চায় এই কষ্টিপাথরের বিচারে ফাঁক

হয়ত ছিল, কিন্তু ফাঁকি ছিল না। রাজতন্ত্রী বালজাকের সাহিত্যচিন্তা সম্পর্কে এঙ্গেলস্ লরা লফার্গ-এর চিঠিতে (১৮৫৩, ১৩ই ডিসেম্বর) যে উক্তি করেছেন, তাতেই আমাদের বক্তব্যের সমর্থন মিলবে "By the by I have been reading scarcely anything but Baljac while laid up and enjoyed the grand old fellow thoroughly. There is a history of France from 1815—1848……and what boldness! What a revolutionary dialectic in his poetical justice." অমার্কসবাদী বালজাকের শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি আদৌ কোন দায়বদ্ধতা ছিল না, থাকার কথাও নয়। তাহলে স্থূলবিচারে বলতে হয়—হয় তাঁর কারুর প্রতিই কোনরকম দায়বদ্ধতা রাখার কোন দায়ই ছিল না, অথবা শোষক-শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিই তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ। শ্রমিকশ্রেণীর শিক্ষক এঙ্গেলস্ তাহলে বালজাকের জয়ধ্বনি করেছেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর হল—বালজাকের দায়বদ্ধতা জীবন ও সত্যের প্রতি। এবং এই আনুগত্যের কারণেই এই সৎশিল্পী নিজের অজান্তেই পরোক্ষে নিপীড়িত মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে পারেন। অথবা তলস্তয় প্রসঙ্গে লেনিনের দ্বিধাহীন ঘোষণার কথা সাহিত্য বিচারে কে বিস্মৃত হতে পারেন? তলস্তয় ধর্মীয় বিশ্বাসের পক্ষে, জমিদারী প্রথার পক্ষে, বলশেভিক বিপ্লবের শত যোজন দূরে তাঁর অবস্থান, অথচ লেনিনের মতে তিনিই সোভিয়েত বিপ্লবের দর্পণ। বিখ্যাত সেই লেখার শুরুতেই লেনিন বলেছেন—"To identify the great artist with the revolution which he has obviously failed to understand, and from which he obviously stands aloof, may at first sight seem strange and artificial. A mirror which does not reflect things correctly could hardly be called a mirror. Our revolution, however, is an extremely complicated thing." তলস্তয়ের দায়বদ্ধতা হল রুশ কৃষক জীবনের প্রকৃত অবস্থার প্রতি। "Tolstoy is original, because the sum total of his views taken as a whole, happens to express the specific features of our revolution as a peasant bourgeois revolution. From this point of view, the contradictions in Tolstoy's views are indeed a mirror of these contradictory conditions

in which the peasantry had to play their historical part in our revolution." দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে যাঁর যে মতবাদই থাকুক না কেন, যে কোন কালজয়ী শিল্পী যদি সততার সঙ্গে জীবনের ছবি আঁকেন, জীবন যেহেতু কখনো পিছনের দিকে হাঁটে না, চূড়ান্ত বিচারে স্রোত সবসময় সামনের দিকে প্রবাহিত হয়, তাই বড় মাপের শিল্পীর তুলিতে মতাদর্শ নিরপেক্ষভাবেই জীবনের সত্য চিত্রিত হয়ে উঠতে পারে। এবং এই সার্থক চিত্রায়ণেই তিনি হয়ে ওঠেন কালজয়ী।

আজকের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে দুই বিবদমান শিবিরের পরিপ্রেক্ষিতটি স্মরণে রেখে আমাদের সামনে মুখ্য প্রশ্ন তাহলে এই—কার পক্ষে commitment? এটা ঘোষণা করে দেওয়া প্রয়োজন, প্রতিক্রিয়ার পক্ষে, শোষকের স্বার্থের অনুকূলে যাঁদের দায়বদ্ধতা তাঁরা বিবিধ ছলে ও কৌশলে সেই অঙ্গীকারকে আড়ালে রাখতে চান, নিরপেক্ষতার ভাণ করেন। এর কারণ বোঝা কঠিন নয়। সভ্যতার ইতিহাসে কোনদিন দুষ্কৃতকারীরা তাদের নিজেদের কোন অন্যায় এবং পাপকে কখনো চিৎকার করে বলার সাহস রাখে না। এখানে আলোচনার অবকাশ নেই, তথাপি এটুকু উল্লেখ করলে অসঙ্গত হবে না—শোষকের প্রতিক্রিয়ার সমগ্র দার্শনিক বনিয়াদটির ভিত্তিমূল ধরে স্বচ্ছন্দে টান দেওয়া যায়, এই আলোচনা প্রসঙ্গেই। সভ্যতা ও সমাজবিকাশের মূল দ্বান্দ্বিক কার্যকারণ সম্পর্কগুলি আড়াল করে, বানানো স্বার্থপ্রণোদিত মিথ্যার জাল বুনে তারা মানুষের সামনে তাদের অজ্ঞতার সুযোগে হাজির করে এমনকি তাদের বুনিয়াদী দর্শন চিন্তাকেও।

'আমি কারও পক্ষে নই' এই কপট নিরপেক্ষতার কথা তাঁরাই বলবেন যাঁরা শোষণ ও অসাম্যের পক্ষে বুদ্ধির কারবার করেন। সুতরাং দায়বদ্ধতা একটা থাকেই। প্রশ্ন হল কার পক্ষে সেই আনুগত্য। ভাল শিল্প রচনা করলেই আজ আর ভাল শিল্পী হওয়া যাচ্ছে না. জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা ক্রমশঃ হয়ে পড়ছে জটিল থেকে জটিলতর। শিল্পের জন্যই শিল্পসৃষ্টির তত্ত্ব তো অচল হয়েই গেছে বহুদিন, জীবনের জন্য শিল্প বললেও আজকের সচেতন বোধ ও বোধির তৃপ্তি নেই। কোন্ জীবন, গতিময়তার পক্ষে না স্থিতাবস্থার, প্রগতির পক্ষে না প্রতিক্রিয়ার, শোষণ বঞ্চনার পক্ষে না তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের, তা বলতে হবে স্পষ্ট করে। আর মানুষ নিয়েই যেহেতু এই সব চিন্তা ও অনুষঙ্গ, মানুষই যেহেতু সকল উপরিতলগত চিন্তার

আশ্রয় ও উপজীব্য—আজকের লেখক ও শিল্পীকে তাই স্পষ্ট উচ্চারণে বলতেই হবে—কোন মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর অসিচালনা করবেন? Master of Art—তুমি কার পক্ষে? এই প্রশ্ন তুলেছেন বলশেভিক রাশিয়ায় গোর্কী, ভারতে প্রথম সম্ভবতঃ মানিক। 'তিনি অল্প ক'দিনেই দলীয় হয়ে গেছেন'—এই সমালোচনার উত্তরে মানিক কায়দা করে এড়িয়ে গিয়ে জবাব দেননি, স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, "দু'টো দল হয়ে গিয়েছে, উপায় কি! ব্যক্তিগতদের ব্যক্তিপ্রীতির দল এবং জনসাধারণের নৈর্ব্যক্তিক স্বজাতি-প্রীতির দল। দ্বিতীয় দলে গত না হলে প্রগতি হয় না।" মানিকের এই স্পষ্ট ঘোষণা আমাদের গ্রহণ ও বর্জনের কষ্টিপাথরটাকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সংগ্রামী মানুষের এই দ্বিতীয় দলের পক্ষে কলমকে যাঁরা ব্যবহার করছেন আজ ও উত্তরকালের মানুষের শ্রদ্ধা ও সম্মান পাবেন তাঁরাই। ক্ষণকালের থেকে তাঁরাই পৌঁছে যাবেন নিত্যকালের দুয়ারে।

বাংলা সাহিত্যে মানিকের যে যুগে আবির্ভাব "তার কয়েক বছর আগে কল্লোল যুগ আরম্ভ হয়েছে"। কল্লোলের জন্ম হয়েছিল কলকাতায় ১৯২৩ সালে। তিনবছর পরে এখানেই বেরিয়েছিল কালি-কলম এবং তার এক বছর পরে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হল প্রগতি। ঐ যুগের আর একটি সমধর্মী পত্রিকা সংহতি প্রকাশিত হয়েছিল সমসাময়িক কালেই।

গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের সাহিত্যের দুই প্রধান সেনাপতি প্রমথ চৌধুরী আর নজরুল হলেন প্রথম পথিকৃৎ—একজন গদ্যে একজন পদ্যে। অসংখ্য নতুন স্বাদের রচনায় এই দুই রথী যদিও নিজেদের সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সাহিত্যকে নবরূপে সাজিয়ে, তবুও কল্লোল—কালি-কলম—প্রগতির তরুণ-লেখক গোষ্ঠীই আমাদের সাহিত্যে বাস্তবতার প্রধান উদ্‌গাতা। কল্লোলের আবির্ভাবের কালে সমগ্র বাংলায় দুই সর্বাধিক জনপ্রিয় শিল্পী হলেন শরৎচন্দ্র ও নজরুল। অভিজাত পত্র পত্রিকার মধ্যে তখন প্রবাসী, ভারতী আর সবুজপত্র আসর জুড়ে অধিষ্ঠিত। সমকালীন যুগচেতনা আর মুজফ্‌ফর আহমেদের সান্নিধ্য নজরুলকে সেই সময়ে কমিউনিস্ট মতাদর্শের কাছাকাছি এনে দিয়েছিল। তাঁর প্রচেষ্টায় বেরোলো ধূমকেতু। রবীন্দ্রনাথ এই নবযুগ-প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানালেন। এই সময়েই কিন্তু এই বাংলার নিম্নবিত্ত গরীব মানুষের বাস্তব জীবন, যন্ত্রণা ও সমসাময়িক যুগের অতৃপ্ত কামনা বাসনা স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ছবি স্পষ্ট ভাষা ও

রেখায় আঁকা হল কল্লোলে। যুগের পরিপ্রেক্ষিতেই সেই লেখকদের বিরুদ্ধবাদ ও ভাবালুতার জন্ম। কিন্তু যে দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হলে সেই বিরোধিতাকে নিয়ে যাওয়া যায় ইতিবাচক সংগ্রাম ও উত্তরণে, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য কল্লোলের তা ছিল না। তাঁদের দাবী ছিল, তাঁরা বস্তুবাদী সাহিত্যচর্চা করছেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদকে আদর্শ হিসাবে তাঁরা জীবনে ও আচরণে গ্রহণ করতে পারেন নি, যা তাঁরা করতে চাইছেন, যে হাতিয়ার দিয়ে তা' সমাধা করা যায় তা' তাঁদের সাহিত্যের পেছনে ছিল না।

এই পটভূমিকায় এলেন মানিক। তাঁর প্রথম গল্প 'অতসীমামী' রচিত হয়েছিল ১৯২৮ সালে। আকস্মিকভাবে লেখা এই গল্পটির জন্ম ইতিহাস সাহিত্য পাঠক মাত্রেরই জানা। শ্রমজীবী মানুষ ও তাঁদের দর্শনের প্রতি মানিকের যে দায়বদ্ধতার কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি, অতসীমামীতে তা ছিল না। ছিল না এর পরে লেখা আরও অনেক গল্প উপন্যাসে। কিন্তু সেই বিশেষ শ্রেণীর প্রতি, তাঁদের দর্শনের প্রতি আনুগত্য না থাকলেও, দায়বদ্ধতা একটা ছিলই। গোটা মানিক-সাহিত্যের উপর একনজর চোখ বুলোলে সচেতন পাঠকের চোখ এড়াবে না, বাংলা কথাসাহিত্যের এই অন্যতম প্রধান শিল্পীর আজীবন সাধনাতেই ছিল এক সোচ্চার commitment। জীবন ও সত্যকে এই শিল্পী ভালোবেসেছেয দুঃসাহসী মন নিয়ে। বৈজ্ঞানিক মনন ও অসংখ্য বিচিত্র অভিজ্ঞতার শরিক মানিক সাহিত্য শুরু করেছিলেন জীবনের সকল রহস্য উদ্‌ঘাটনের দুর্মর প্রচেষ্টায় এবং যুগ পরিবেশ, অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধিৎসা তাঁকে মার্কস্‌বাদের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেবার পর অনিবার্য সম্ভাব্যতায় তিনি বুঝেছিলেন জীবন ও তার অন্তহীন রহস্যকে জানতে হবে, এটা তো ঠিকই—এ পর্যন্ত পৃথিবীর অসংখ্য পরিব্যাপ্ত হৃদয়ের মহান্ শিল্পী তা জানার এবং জানানোর প্রচেষ্টাতেই রচনা করেছেন সংখ্যাতীত অনবদ্য সাহিত্য শিল্প। কিন্তু এটুকুই সব নয়, এই অন্তহীন রহস্যকে জানার সঙ্গে সঙ্গে এরই মধ্যে পাল্‌টাতে হবে জীবন। তা করতে গেলে শুধু শিল্পী-সুলভ গুণের অতুল অধিকারী হলেই চলবে না, তার সঙ্গে আবশ্যিকভাবে যুক্ত করতে হবে সেই বীক্ষণকে যা এযুগে অগ্রগতির পথে হাঁটার একমাত্র দিগ্‌দর্শন।

যুগপরিবর্তনের, সমাজ ও মানবজীবনকে নতুন করে গড়ে তোলার

একমাত্র হাতিয়ার সেই বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ। মানিকের সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বে আন্তরিক শিল্পী সত্তা নিয়ে জীবনের রহস্যের মাদকতায় ভরপুর এক গভীর জীবনপ্রেমিক শিল্পীকে আমরা পেয়েছি। আর উত্তরপর্বে পেয়েছি সেই মানিককে যিনি শুধু বর্ণনা. আবেগ বা জ্ঞান অর্জনে ক্ষান্ত নন, অর্জিত জ্ঞানকে প্রয়োগ করতে চান তিনি।

মানিক-সাহিত্যিক সত্তার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য তাহলে এই যে তিনি commitment-এর ক্ষেত্রেও বিবর্তিত ও শেষপর্যন্ত গুণগতভাবে পরিবর্তিত। তাঁর প্রথমপর্বের সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে উজ্জ্বল ফসলগুলো আজও সবচেয়ে জনপ্রিয়। 'জননী' উপন্যাসে (মার্চ. ১৯৩৫) সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বা 'দিবারাত্রির কাব্যে'র (ডিসেম্বর, ১৯৩৫) বিচিত্র প্রেমানুভূতির শিল্পীরূপে মানিক বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ঐতিহ্যের জন্মদাতা হয়ে ওঠার প্রায় সকল চিহ্নই রেখেছিলেন। প্রেমের রহস্যভেদে মনোবিকলনের পদ্ধতি অবলম্বন করে মানিক এক অনাস্বাদিত নির্মোহ ভঙ্গীতে প্রেমকে তার আদিম স্বরূপে অনাবৃত করেছেন। ফ্রয়েডের প্রভাব তো ছিলই, অন্যদিকে মানিকের হৃদয়ের অন্তস্থলে ও চেতনায় যৌবনের শুরু থেকেই প্রচলিত প্রেমের উপন্যাসধারার সম্পর্কে আক্ষেপও ছিল। প্রথম যৌবনে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় লেখক ছিলেন শরৎচন্দ্র। অনায়াস ভঙ্গিমায়. গল্প বলার অনবদ্য গুণে, সমস্যার প্রতি দরদী সহানুভূতিতে শরৎচন্দ্র পাঠকের হৃদয় ছুঁয়ে যেতে পারতেন সহজেই। তাঁর নায়িকারা মানিককে ভাবাতো অনেক, কাঁদাতো কম। শুরু থেকেই শিল্পী মানিক এই প্রশ্নের জবাব খুঁজছিলেন। "বাংলা সাহিত্যে নারীত্ব অভিনব মর্যাদা পেলো কিন্তু বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে কেন?" এই অভাবটা তিনি সাহিত্যে পূরণ করতে চেয়েছিলেন। ফ্রয়েড ছিলেন তাঁর সাহিত্যচর্চায় এই পর্বের বৈজ্ঞানিক পথপ্রদর্শক।

বিদগ্ধ সমালোচকরা মানিকের শিল্পী জীবনের বিবর্তনে সুস্পষ্টভাবে কয়েকটি পর্যায় নির্দেশ করেছেন। প্রথম পর্যায় হল প্রেমরহস্য উদঘাটনে মনোবিকলন পদ্ধতির ফ্রয়েডীয় প্রভাবের স্তর। আত্মনিমগ্নতা ও ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সমস্যার চর্চা করতে করতে এর পরে একটু একটু করে তিনি সমষ্টির দিকে তাকানো শুরু করেছেন। সমগ্র সমাজ সম্পর্কে নানা ধরনের চিন্তাভাবনা তাঁকে ক্রমশঃ আলোড়িত করেছে। চূড়ান্ত স্তরে মানিক

সাহিত্য পরিপূর্ণভাবে সমাজসচেতন এবং এই কালের সমস্ত রচনায় তাঁর দ্বিধাহীন দায়বদ্ধতা শ্রমিক কৃষক ও সংগ্রামী মানুষের প্রতি। সাহিত্য জীবনে মানিক জীবনকে চেনবার তীব্র আর্তিতে যাত্রা শুরু করেছিলেন। দীর্ঘ সাধনায় চিনেছিলেন জীবন ও সত্যকে এবং অন্তিম পর্যায়ে তিনি বর্তমান সময়ের জীবন যুদ্ধের কাণ্ডারী সচেতন শ্রমজীবী মানুষের প্রতি নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছেন তাঁর দায়বদ্ধতা। এখানেই মানিক আমাদের পথপ্রদর্শক, এইখানে তাঁর মাহাত্ম্য।

'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) আর 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬) মানিকের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি উপন্যাস। মার্কসবাদে দীক্ষিত সমাজ সচেতন মানিক এখানে অনুপস্থিত, কিন্তু এই উপন্যাসদুটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে জীবনের প্রতি তাঁর সুগভীর প্রীতি ও মমতা উপচে পড়ছে। পদ্মাপারের বঞ্চিত দরিদ্র জেলেদের আপাতশ্রীহীন জীবন, দামাল পদ্মার জীবনাবেগ, সেই মানুষগুলির সুখদুঃখের খুঁটিনাটি, কামনা বাসনা এই উপন্যাসে শিল্পীর অনবদ্য সততায় প্রকাশিত। পদ্মানদীর মাঝি-তে দীর্ঘপথ পরিক্রমা করে শেষ পর্যন্ত মানিক সমাজ-বাস্তবতার কূলে জেগে উঠেছেন। কুবেরের চরিত্র বাংলা সাহিত্যে আজও একটা নতুন দিক্ নির্দেশ করছে।

পুতুলনাচের ইতিকথা-র শশী ও কুসুম নিজেদের বৈচিত্র্যের জোরে পাঠকের মন কেড়েছে ঠিকই, কিন্তু মানিক এই উপন্যাসেও মানুষের ব্যক্তি-সত্তাকে তার আত্মপ্রত্যয়কে প্রাধান্য দেননি, উদাসীন নিয়তির হাতে, অজানা ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন তাদের।

এই পর্বের অন্য একটি উপন্যাস হল দুই খণ্ডে বিভক্ত 'শহরতলী' (১৯৪০-৪১)। ক্রমশঃ বিবর্তিত হতে হতে এই উপন্যাসে শহরতলীর জীবন রূপায়ণে মানিক অনেক পরিণত। শহরতলীর এক পাইস হোটেলের মালিক যশোদা। নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষকে শুধু ভাত বিক্রী করে পয়সা আদায় করাটাই তার একমাত্র কাজ নয়; মানিকের এই বিচিত্র চরিত্র সেই দরিদ্র শ্রমিকদের সুখ দুঃখের সঙ্গে গভীর মমতায় নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছে। কারখানার অনিচ্ছুক মালিকের বিরুদ্ধে দাবী আদায়ের সংগ্রামে যশোদা অনায়াসে শ্রমিকদের পক্ষ নিয়েছে। এই উপন্যাসে মানিকের পদচারণার ক্ষেত্র বদলের সুস্পষ্ট আভাস। ফ্রয়েড ছেড়ে তিনি সমাজ সচেতন জীবন রহস্যে উঁকি মারছেন।

চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে মানিক-সাহিত্যে সুস্পষ্ট পক্ষ নেওয়ার যুগ শুরু। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত বহুকালের সযত্নলালিত মূল্যবোধগুলি হারিয়ে ক্রমশঃ এক অদ্ভুত শূন্যতায় পৌঁছেছে। গ্রামে সমগ্র চাষীসমাজ ও তার জীবন ছিন্নভিন্ন, শহরে শ্রমিকজীবনে চূড়ান্ত অসন্তোষ, সীমাহীন বিক্ষোভ। বেঁচে থাকাটাই সমগ্র সমাজের সব মানুষের পক্ষে এক কঠিন দায়। এই বিষণ্ণ ভাঙাচোরা সময়ের অনিবার্য ফল হিসাবে মধ্যবিত্ত সমাজে জন্ম নিয়েছিলো অনিশ্চয়তা আর নেতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। ফাঁকি ও ভণ্ডামিতে ভরে গিয়েছিলো তথা-কথিত ভদ্রলোকের জীবনযাত্রা। মানিকের অন্তর্ভেদী মমতাময় শিল্পী-চোখ এই সমস্যার অতলান্ত গভীরতায় গিয়ে পৌঁছেছিল অনায়াসে। অবচেতন মনের অন্তর্লীন অন্ধকারে তিনি আর আবদ্ধ থাকতে চাননি। ব্যক্তিজীবন থেকে চোখ ফিরিয়ে জীবনের উন্মুক্ত প্রসারিত আঙিনার আলোয় বেরিয়ে এসে সমষ্টি আর শ্রেণী জীবনের মধ্যে তিনি নতুনকালের শিল্পের উপাদান খুঁজেছেন। এই সময়েই মানিক কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন (১৯৪৪)। আচরণে ও লেখায় ফাঁক তিনি রাখতে চাননি। যতদিন বেঁচেছিলেন এই প্রত্যয়ে তিনি দ্বিধাহীন। আচরণগত কোন স্খলনে তাঁর আত্মসমালোচনা, হৃদয়ের যন্ত্রণা ও অনুশোচনার পরিচয় এই পর্বে তাঁর টুকরো টুকরো নানা কথায়, লেখায় পাঠক সমালোচকের কাছে ধরা পড়েছে। কর্মী ও লেখক মানিক নবলব্ধ বিজ্ঞানচেতনায় মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

এই পর্বে মানিকের যে উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি হল 'দর্পণ', 'হরফ', 'সোনার চেয়ে দামী', 'জীয়ন্ত', 'স্বাধীনতার স্বাদ', 'সার্বজনীন', 'আরোগ্য', 'হলুদ নদী সবুজ বন', 'ইতিকথার পরের কথা', 'শান্তিলতা', 'মাঝির ছেলে' প্রভৃতি। জীবন জিজ্ঞাসার নতুন এক দিগন্ত তখন মানিকের চোখে। কর্মে ও আচরণে ঘনিষ্ঠ ও সৎআত্মীয়তা অর্জনের দুর্মর সাধনায় তাঁর নিরলস প্রয়াস। 'ইতিকথার পরের কথা'-য় (১৯৫২) কৈলাস বা 'হলুদ নদী সবুজ বনের' (১৯৫৬) ঈশ্বর বাংলা সাহিত্যের নব যুগের নায়ক। সুখেন্দু বা যাদব বাবুও আমাদের প্রতিদিনের জীবনের খুব কাছের পরিচিত মানুষ, অথচ সাহিত্যের আসরে তারা নতুন। এই পর্বের রচনায় মানিক প্রথম দিকে যেন একটু ছকবাঁধা পুঁথিগত তাত্ত্বিক ধারণা থেকে চরিত্র

গড়ার চেষ্টা করেছেন। চরিত্রগুলি ফ্রেমের মধ্যে নিশ্চল হয়ে আছে। সর্বসময়ে তাতে যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়নি। পদ্মার দামাল ঢেউএর মাঝিদের উদ্দাম জীবনাবেগ এখানে নেই। কিন্তু যা আছে তা হল এতদিনের জগদ্দল সংস্কার থেকে ব্রাত্যমুক্তি। ঈশ্বর চরিত্র কুবের বা ধনঞ্জয় নয়। সে ভূমিহীন চাষী, ক্রমে মজুরে পরিণত। আত্মচিন্তা প্রধান মনোলোক বিশ্লেষণ এই পর্বের লেখায়, এই নবনায়কদের চিত্রায়ণে তাই অনুপস্থিত। ঈশ্বরের সমাজ সংহত, সমষ্টিবদ্ধ। মধ্যবিত্তের বিচ্ছিন্ন আত্মকেন্দ্রিক জীবন ভাবনায় সে সমাজ দীন নয়। 'ইতিকথার পরের কথা'-য় শুভময় গতানুগতিক জমিদারপুত্র নয়। আভিজাত্য ছুঁড়ে ফেলে সে সাধারণ। স্বদেশ সমাজ ও মানুষের চিন্তায় তার মনে আথালপাথাল। কৈলাস দত্ত চরিত্রটি মানিক সাহিত্যে এক কথায় অনবদ্য সংযোজন। শ্রমিক কৃষক সংহতির সে যোগসূত্র। শুভময় এ উপন্যাসে ক্রমশঃ সামন্ত মনোভাব ত্যাগ করেছে, কৈলাস নিম্নবিত্ত অবস্থা থেকে পরিণত হয়েছে মজুরে। চরিত্রের শ্রেণীচ্যুতি ঘটাতে হবে, ঘটানো যায় এবং তাতে সাহিত্য মার খায় না, নজিরবিহীন ক্ষমতায় মানিক তা দেখিয়েছেন। এ দুটি গ্রন্থের ত্রুটি অনেক—তবু সাহিত্যে এরা নতুন কালের ইঙ্গিতবহ।

'শান্তিলতা' (১৯৫৯) পূর্ণাঙ্গ রচনা নয়, উপন্যাসের খসড়ামাত্র। এই উপন্যাসের নায়িকা চরিত্রটি পাঠকের মন ভরাবার আগেই থেমে গেছে; তার পূর্ণাঙ্গ বিবর্তন না পাওয়ার ক্ষোভ চিরকালের বাংলা উপন্যাস-পাঠকের থেকে যাবে। 'মাঝির ছেলে' (১৯৬০) একটু স্বতন্ত্র ধরনের রচনা। 'পদ্মানদীর মাঝি'র সেই পরিচিত পরিপ্রেক্ষিত, পরিবেশ, পাত্র-পাত্রী প্রভৃতি উপাদানের নবরূপায়ণ এই উপন্যাস। 'নাগা' চরিত্র মানিকের আর এক আন্তরিক সৃষ্টি। আর যাদববাবু—এই মাঝিদের জীবনসূত্র গ্রথিত করার কেন্দ্রীয় পুরুষ। উত্তরকালের লেখা এই সব উপন্যাসে যেমন, তেমনি বেশ কয়েকটি অসাধারণ গল্পেও মানিক নিপীড়িত মানুষের প্রতি, তাদের শ্রেণীদর্শনের প্রতি আন্তরিক দায়বদ্ধ। শাশ্বতকালের শিল্পী হিসাবে তিনি অনায়াসে এখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে অবধারিতভাবে যে দিকটি এসে যায়, তা হল বিবর্তনের প্রথম ও শেষ পর্বের মানিকের সাহিত্য রচনায় শিল্পগুণের তারতম্য ও উপন্যাসগুলির জনপ্রিয়তার প্রসঙ্গটি। আগেই উল্লেখ করেছি

'পদ্মানদীর মাঝি' মানিকের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস কিন্তু সেখানে তাঁর Commitment সামগ্রিকভাবে নিপীড়িত মানুষের প্রতি নয়। পদ্মার উদ্দাম প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপটে আঁকা কুবের মাঝিদের চরিত্র চিত্রণে মানিক অনায়াস সাফল্য অর্জন করেছেন। এর একটা কারণ হল, এই উপন্যাসের শরীর গড়তে মানিককে হাতড়ে হাতড়ে পথ খুঁজতে হয়নি। তাঁর শিল্পী-সত্তা এখানে সহজ প্রাণাবেগে স্ফুরিত হয়েছে। তুলনায় 'হলুদ নদী সবুজ বন' অথবা 'ইতিকথার পরের কথা'য় মানিক উপলব্ধি করেছেন, নিজস্ব একটা জীবনদর্শন ছাড়া একালে মহৎ শিল্পী হওয়া সম্ভব নয় এবং দর্শনহীন সেই সাহিত্যরচনা শাশ্বতকালের বিচারে মূল্যহীন। মানুষের জীবনকে শিল্পীর চোখ দিয়ে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের পর থেকে শিল্পায়িত করে বর্ণনা করা সাহিত্যে বহুকালের Tradition. কিন্তু শুধু বর্ণনায় তৃপ্ত না হয়ে বা দায়িত্বপালন শেষ না করে একটি বৈজ্ঞানিক জীবন দর্শনের আলোকে জীবনকে নতুন পর্যায়ে উত্তরিত করে দেওয়ার সাহিত্যপ্রয়াস কঠিন ও বিরামহীন শ্রমসাপেক্ষ।

সুতরাং যখন থেকে মানিক নির্দিষ্ট অর্থে কমিটেড, তখন থেকেই তাঁর উপন্যাস যেমন বক্তব্যে তেমনি শরীর নির্মাণেও পুরোনো পথে হাঁটেনি। নতুন বক্তব্য রূপায়িত করতে গিয়ে উপন্যাসের নান্দনিক ক্ষেত্রে এবং মানিকের শিল্পীমানসেও গোত্রান্তর ঘটেছে। এই পর্যায়ের উপন্যাসের ভাষা বর্ণনা ও উপমারীতি বিশ্লেষণ ক'রে দেখানো খুব কঠিন হবে না যে, মানিকের শিল্পীসত্তা আগের চেয়ে কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠায় ও বিশেষ উদ্দেশ্যসাধন করতে গিয়ে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সংহতিও ক্ষেত্রবিশেষে হয়ত বা একটু বিচ্যুত হয়েছে। সমাজপ্রেক্ষিতের উপর জোর দিতে গিয়ে মানিক মনের জগৎ কিছুটা হারিয়ে ফেলেছেন। এই পর্যায়ে তাঁর উপন্যাসের জনপ্রিয়তা যেহেতু অপেক্ষাকৃত কম, মানিক যখন বিশিষ্ট অর্থে কমিটেড্ ছিলেন না তখনকার উপন্যাসের জনপ্রিয়তা যেহেতু বেশী, তাই চিন্তার এই বিবর্তন মানিককে আরও সার্থকতায় ভূষিত করেছে কিনা, পাঠক সমালোচকের মনে এ প্রশ্ন জাগতেই পারে। নতুন বক্তব্য, দ্বিধাহীন স্পষ্ট পক্ষ অবলম্বনের ঘোষণা মানিক সাহিত্যের উত্তর-কালের জয়পতাকা। পুরোনো জীবন, পুরোনো পরিচ্ছদের মোহ তো কাটাতেই হবে। নতুনের অন্তর্নিহিত প্রাণবস্তুর উপযোগী বর্ণচ্ছটাময় পরিচ্ছদ

পর্যন্ত যতদিন না অসংখ্য লেখকের বিরামহীন শ্রমে গড়ে উঠছে ততদিন তার অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু পুরানো পরিচ্ছদের মোহ থাকা চলবে না। বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত আত্মীয়ের জীবনাবসানে মানুষ শোকাচ্ছন্ন হয়, কিন্তু পরিচ্ছদহীন নবজাতকের জন্মগ্রহণে সেই শোক সে কাটিয়ে ওঠে। নিজের শ্রমে সে নতুন করে তাকে পোশাক গড়ে দেয়। পুরাতন ব্যবহৃত পোশাক নতুন শিশুকে মানায় না। প্রথম পর্বের উপন্যাস রচনায় মানিকের ভাষা সাংকেতিক, মন্তব্য তির্যক। এই আঙ্গিক উত্তর পর্বের উপন্যাসের বাহন হতে পারে না। নতুন সমাজ চেতনা প্রতিষ্ঠার আগে তার সার্থক ভাষা আসে না।

কিন্তু মানিক সাহিত্যে নতুনকালের রচনার ক্ষেত্রে, শ্রমিক-কৃষক বা মেহনতী জনসাধারণের জীবনের রূপকার হিসাবে তাঁদের জীবন ও দর্শনের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্যে তিনি যে শুধু সার্থক শিল্পোত্তীর্ণতার ইঙ্গিত রেখেছিলেন তাই নয়—অনায়াসে তিনি প্রমাণ করেছিলেন নতুন জীবন, নতুন মানুষের কথা তার উপযোগী নতুন অঙ্গসজ্জায় কি বিপুল ইঙ্গিতবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়েও শিল্পের চরম উৎকর্ষে পৌঁছুতে পারে! চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ের পর থেকে মানিক উপন্যাস রচনার ফাঁকে ফাঁকে যে ছোট গল্পগুলি রচনা করেছিলেন সেগুলি 'অতসীমামী'র সময়ের জীবন ভাবনার স্তর পেরিয়ে এক ভিন্নতর স্বাদে উত্তীর্ণ। তাঁর প্রথম পর্বের লেখা একটি গল্প 'আত্মহত্যার অধিকার' এ একটি দরিদ্র পরিবার বিধাতা ও মানুষের প্রতি নিষ্ফল আক্রোশে নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছে। 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পটির রস বীভৎস; কিন্তু এই গল্পই মানিককে ছোটগল্পকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছিল। প্রথম পর্বের গল্পের ফ্রয়েডীয় প্রভাব স্বজ্ঞানে পরিত্যাগ করে মানিক ক্রমশঃ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করছিলেন, কারণ তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন উপলব্ধি করছিল যে মানুষের জীবন ও সমাজ সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় মনোবিকলনের দ্বারা নয়। সেই নিয়ন্তা হল অর্থনীতি।

যুদ্ধপরবর্তীকালে মানিকের গল্পগ্রন্থ 'ভেজাল' প্রকাশিত হয়েছিল এবং তার কিছুদিন পরেই দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় লেখা হয়েছিল 'আজ কাল পরশুর গল্প' গল্পগ্রন্থটি। এই পর্যায়ের বিভিন্ন গল্পগ্রন্থে প্রকাশিত অসংখ্য গল্প মানিকের নবলব্ধবোধের সুস্পষ্ট পরিচায়ক। আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে অনেকগুলি

গল্পের নাম উল্লেখ করা যায়। এগুলির মধ্যে সমগ্র মানিক সাহিত্যে উত্তুঙ্গ চূড়ার উপরে প্রজ্জ্বলিত দীপশিখার মত কয়েকটি গল্প আজও ভাস্বর জ্যোতিতে উজ্জ্বল। 'আজকাল পরশুর গল্প', 'যাকে ঘুষ দিতে হয়', 'সাড়ে সাত সের চাল', 'ছিনিয়ে খায়নি কেন', 'একান্নবর্তী', 'চক্রান্ত', 'ছাঁটাই রহস্য', 'বাগদীপাড়া দিয়ে', 'মাসিপিসী' প্রভৃতি গল্পগুলি এক দায়বদ্ধ কথা-সাহিত্যিকের অনবদ্য রচনা। আঙ্গিক ও বক্তব্যের গভীর আত্মীয়তায় শিল্পোত্তীর্ণ। মানিক সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় মেহনতী মানুষের পক্ষে পূর্ণ অনুগত এবং আঙ্গিক প্রকরণে ও নন্দনতত্ত্বের বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ দুটি গল্পের নাম 'হারানের নাতজামাই' ও 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী'। মানিক লিখেছিলেন, "লেখক কে ? পিতার মতো যিনি দেশের মানুষকে সন্তানের মতো জীবনাদর্শ বুঝিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করার ব্রত নিয়েছেন।" শুধু পিতার মত নয়, নিরন্ন মজুর বা কৃষকের শিক্ষকের মত দরদে, সাহসে ও গভীর ভালবাসায় মানিক তাদের অন্ধকারে আলোর পথ চিনিয়ে দিয়েছেন। সাহসী সেনাপতির মত সংগ্রামের পথে পা বাড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। এবং রণক্ষেত্রে কোন্ কৌশলে সংগ্রামী মানুষ অর্জিত জমিতে পা রাখবে তার হদিসও দিয়েছেন এই দুটি গল্পে। দায়বদ্ধ মানিক এখানে আনুগত্য বজায় রেখেও শিল্পের সুষমা ও লালিত্য দিয়ে এই গল্পদুটিকে মহিমান্বিত করেছেন তুলনাহীন দক্ষতায়। আমাদের সাহিত্যে এযাবৎ রচিত কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পের মধ্যে সমস্ত সমালোচক নির্দ্বিধায় এই দুটি গল্পকে স্থান দিয়েছেন।

কমিটেড্ মানিকের সাহিত্য আজও সেই বিপুল জনপ্রিয়তা পায়নি একথা ঠিক। কিন্তু এই যুক্তিতে নতুন কালের সাহিত্যিকরা শিল্পসৃষ্টিতে পেছনের দিকে পথ হাঁটতে পারেন না। মানিক উত্তরকালের হাতে যে দায়িত্ব তুলে দিয়ে গেছেন তা পালন করার দায়িত্ব আমাদের। নতুন জীবন জয় করে আনার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় নতুন বক্তব্যকে করতে হবে সাহিত্যের উপজীব্য, তার উপযুক্ত আঙ্গিক গড়ার কাজ শুরু করেছিলেন মানিক, আরও নিপুণভাবে তা আমাদের গড়তে হবে।

বিশ্বব্যাপী সাহিত্য ও শিল্পচর্চার ইতিহাসে এই গোত্রান্তরের ও পালা-বদলের পালা বহুবার আমরা দেখেছি। দেশ ও বিদেশে বড় মাপের শিল্পীরা সভ্যতার যে কোন সংকটে নিজেকে সামনের সারিতে এনেছেন,

প্রতিবাদী প্রত্যয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে মূক মানুষকে ভাষা দিয়েছেন, আজন্ম-লালিত পুরোনো বিশ্বাস ছেড়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে উঠে এসেছেন নতুনতর বিশ্বাসের আঙিনায়। শুধু শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, বুদ্ধির কারবারী যাঁরা,—চিন্তাবিদ্, বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক,—যিনিই হোননা কেন মস্তিষ্ককে কখনো বাঁধা দিতে রাজী হননি। নিজস্বলালিত পুরাতন চিন্তাচেতনায় ভবিষ্যতের যে ঘটনা দেখতে পাননি ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক গতিধারায় অনিবার্যভাবে সেই অবাঞ্ছিত ঘটনা যখন ঘটেছে, নিদারুণ দুঃখ পেতে পেতেও তাঁরা সত্যকে অস্বীকার করেননি। খৃষ্টীয় যাজকদের বিচার প্রহসনের বলি হিসাবে আগুনে পুড়ে মরতে হয়েছে বৈজ্ঞানিক ব্রুনোকে, নিদারুণ লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন গ্যালিলিও নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূল্য হিসাবে, স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছে আইনস্টাইনকে, সভ্যতার কলঙ্ক ঢাকতে রণক্ষেত্রে মহান্ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন র‍্যালফ ফক্স, ক্রিস্টোফার কডওয়েল। আশৈশব যে ভাববাদী ধ্যানধারণা অন্তরে লালন করেছেন তাতে আঘাত লেগে হৃদয়ের অভ্যন্তরে বারবার রক্তক্ষরণ হয়েছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের—তবুও সত্যকে গ্রহণ করার মহত্বেই তাঁরা আপন কীর্তির চেয়েও মহান্ হয়ে উঠেছেন, হয়ে উঠেছেন চির-কালের মানুষের শিক্ষক ও শিল্পী। এসবই ঘটেছে পুরোনো বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তা ও দায়বদ্ধতা ছেড়ে নতুনের দিকে পা বাড়ানোর ফলশ্রুতিতে।

বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে মানিক সেই ক্রমবিবর্তিত দায়বদ্ধতার সর্বাধুনিক শিল্পী। বীজ রোপিত হয়েছে, পড়ে আছে বিস্তীর্ণ আবাদের জমি—উত্তরকালের অসংখ্য দায়বদ্ধ শিল্পী সেই বীজ থেকে অঙ্কুরিত করবেন মহীরুহ—নতুনকাল অপেক্ষা করে আছে অনাগত সময়ের সেই দরদী ফসল ঘরে তোলবার জন্য।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

"An artist truly great must have reflected in his work at least some essential aspects of the revolution."—Lenin.

বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একজন দায়বদ্ধ, অঙ্গীকারবদ্ধ ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ লেখকের নাম। লেখক-শিল্পীর তাবৎ দায়বদ্ধতা তাঁর দেখা মানুষের প্রতি, মানব-সমাজ-প্রবাহের প্রতি, দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামের অগ্রগমনের প্রতি। নতুন উষার স্বর্ণদ্বার খোলার দায়বদ্ধতার প্রতিশ্রুতি বহন করে চলেছেন যুগে-যুগে, কালে-কালে এক একজন কবি-লেখক-শিল্পী। গতানুগতিক সমাজের শাসন-শোষণ ত্রাসনের মৌরসী-ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত ভাঙার নিরবচ্ছিন্ন উত্তরাধিকার পৃথিবীর সব দেশেই কোন কোন লেখক শিল্পীর উপর বর্তায়। দায়িত্ব বর্তায় সুখী সমৃদ্ধ ও শোষণমুক্ত এক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাঙ্গলিকী শোনানোর কাজের।

বাংলা সাহিত্যে মানিকের সুমহান প্রসিদ্ধি উপন্যাস ও গল্প লেখকের ভূমিকায়। প্রাক্-মানিক বাংলা সাহিত্য সংসারে অদৃষ্ট এবং মানিকোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে বিরল-দৃষ্ট ঘাম রক্তে ভেজা, পেশী তোলা সংখ্যাহীন মানুষের স্রষ্টা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এতদ্‌সত্ত্বেও বাংলা কবিতায় মানিকের নাম উল্লেখ মাত্রেই পাঠকের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াবে "কবি ছাড়া আমাদের জয় বৃথা" ঘোষণা, যা ইতোমধ্যেই মানুষের স্বীকৃতি লাভ করেছে। মানিকের প্রথম প্রকাশিত কবিতা তাঁর গল্পরচনার সমকালীন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের সাহিত্য ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন এই ভাবে: "আমার বিজ্ঞান প্রীতি জাত্-বৈজ্ঞানিকের কেন ধর্মী জীবন জিজ্ঞাসায়, ছাত্র বয়সেই লেখকের দায়িত্বকে অবিশ্বাস্য গুরুত্ব দিয়ে ছিনিমিনি লেখা থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি কতকগুলি লক্ষণে সুস্পষ্ট নির্দেশ যে, সাধ করলে কবি আমিও হতে পারি; কিন্তু ঔপন্যাসিক হওয়াটাই আমার পক্ষে হবে উচিত ও স্বাভাবিক।" এই কেন ধর্মীজীবন জিজ্ঞাসার দায়িত্বের ঔচিত্য বোধের কারণেই মানিক ঔপন্যাসিক, গল্প লেখক। যিনি বলেছেন "আড়াই বছর বয়স থেকে আমার দৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাস আমি মোটামুটি জেনেছি", এমন

অসাধারণ আত্মসচেতন মানুষের মুখের এই ঔচিত্যবোধের প্রস্তাবনা একান্তই অমোঘ ও স্বাভাবিক বলেই মেনে নিতে আমাদের অসুবিধায় পড়তে হয় না। তথাপি বিচিত্র মানব চরিত্রের স্রষ্টা ও উদ্গাতা ঔপন্যাসিক ও কথাকার মানিক কিছু অবিস্মরণীয় কবিতা বাংলা কবিতার ধারাবাহিকতার সাথে যুক্ত করেছেন। গল্প-উপন্যাসের মতো তাঁর কবিতাও কখনই বাংলা কাব্য সাহিত্যের গতানুগতিক ট্রাডিসনের পথ ধরে চোখ বুজে হাঁটে নি। শব্দ চয়নে, শব্দ বিন্যাসে, ভাব ব্যঞ্জনায়, চিত্রকল্প নির্মাণের অভিনবত্বে, শ্রেণী ও কাল সচেতনায়, আটপৌরে কথায় সংগ্রামী মানুষের মৌখিক ব্যবহারের বলনে—চলনে মানিকের কবিতাও অনেকটা নিঃসঙ্গ ও একক।

এই একই কেন ধর্মী জীবন-জিজ্ঞাসার কারণেই বাংলা সাহিত্যে গল্পকার ঔপন্যাসিক হিসেবে মানিকের খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি নিঃসংশয় ও অবিসংবাদী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে মাঝে মাঝেই কবিতা লিখতে হয়েছিল। কেন তাঁকে কবিতা লিখতে হয়েছিল, কেন কবিতা লেখার ব্যাপারটা মানিকের কাছে অপ্রতিরোধ্য সত্য হয়ে উঠেছিল, মানিকের সমগ্র অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির জটিল ইতিহাসের বিজ্ঞানভিত্তিক বীক্ষণের মধ্যেই তার ব্যাখ্যান মিশে আছে। "কবির খাতা ছাড়া পৃথিবীর কোথাও যে কবিতা নেই, কবির জীবনে পর্যন্ত নয়, তার এই জ্ঞান পুরোনো কিন্তু এই জ্ঞান আজও যে তার অভ্যাস হয়ে যায়নি, আজ হঠাৎ সেটা বোঝা গেছে…রোমান্সে আজও তার অন্ধ বিশ্বাস, আকুল উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ আজও তার কাছে হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, জ্যোৎস্না তার চোখের প্রিয়তম আলো…একদা নিরবচ্ছিন্ন দুঃস্বপ্নের রাত্রি দিন হয়ে উঠল…এতগুলি বছর ধরে তার মধ্যে দুজন হেরম্ব গাঢ় অন্ধকারে যুদ্ধ করেছে, আজ আনন্দের মুখে লাগা চাঁদের আলোয় তারা দৃশ্যমান হয়ে ওঠায় দেখা গেছে শত্রুতা করে পরস্পরকে দুজনেই তারা ব্যর্থ করে দিয়েছে, হেরম্বের পরিচয় ওদের লড়াই।…ফুলের বেঁচে থাকবার চেষ্টার সঙ্গে কীটের ধ্বংস পিপাসার দ্বন্দ্ব, এই রূপকটাই ছিল এতকালের হেরম্ব।"

মানিকের প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্যের' কবিতা ও নায়ক হেরম্বের দ্বন্দ্বের মধ্যেই মানিকের আত্মোপলব্ধির কাহিনী বিধৃত। কবিতার সাধ ও উপন্যাসের বৈজ্ঞানিক ঔচিত্য ও স্বাভাবিকত্ব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখক জীবনের মৌলিক দ্বন্দ্ব। পৃথিবীর কাল সচেতন, শ্রেণী সচেতন

যুগন্ধর ও সৎ লেখকের মতো লেখক মানিকের নৈর্ব্যক্তিকতা তাঁর বিশাল সামাজিক অভিজ্ঞতারই সাথে সম্পৃক্ত। তাই লেখক হিসেবে সুন্দর ও অসুন্দর প্রকৃতি, অথবা অতি প্রাকৃত, বৈজ্ঞানিক চৈতন্য ও অবচেতনা, জৈবিক জীবন ও দার্শনিক জীবন, ব্যক্তি ও বিশাল মানব সমাজ, রাজনীতি ও ইতিহাসের প্রবহমাণতা, আবার প্রাগৈতিহাসিকতার দ্বন্দ্ব ও আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও জগৎ একাকার হয়ে আছে। তাই তাঁর সাহিত্য জীবনের সুরুর দিনটি থেকেই অন্ধকার রাত ভেঙে আলোকিত প্রভাতের আবাহন, মৃত্যুর মৌরসী কর্তৃত্ব ভেঙে মানুষের বেঁচে ওঠার, যথার্থ বাঁচতে শেখার, ব্যক্তির ব্যক্তিগত ভাল মন্দের গণ্ডি ভেঙে সমষ্টির শুভবোধের ভুবন নির্মাণের এবং স্যাঁতসেতে সমাজ প্রতিবেশে দুর্দান্ত সূর্যের প্রখর তাপ সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে নিযুক্ত থেকেছেন আজীবন।

দুই ॥ তাই দিনের কবিতা, রাতের কবিতা আর দুই মিলিয়ে দিবারাত্রির কাব্য দিয়েই মানিকের জীবনে কবিতার প্রভাত। তখন মানিক একুশ বছরের দুর্দান্ত যুবক।

দিবারাত্রির কাব্যের এই প্রারম্ভিক কবিতার মধ্যেই কবি মানিকের দীর্ঘ, বহুধাবিরোধী অথচ পারম্পর্যময় জীবন কাহিনীর সূত্রপাত ঘটেছে। মানিকের জীবনকালে কিছু কবিতা 'বঙ্গশ্রী', 'অগ্রগতি', রবিবারের 'দৈনিক স্বাধীনতা', 'শারদীয় বসুমতী' অধুনালুপ্ত 'অভিধারা' ও 'সবুজের অভিযান' এবং মৃত্যুর পরে 'পরিচয়' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়াও আরও কিছু কবিতা কোন পত্র-পত্রিকার পাতায় বা দু'একজন ব্যক্তি মানুষের সংগ্রহে থেকে গেছে। সব মিলিয়ে মানিকের কবিতার সংখ্যাতত্ত্বের হদিস পাওয়াটাই এতকাল বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। মানিকের জীবনাবসানের প্রায় এক যুগ পরে তাঁর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত, উপন্যাসের মধ্যে ইতোপূর্বে ব্যবহৃত কবিতা, লেখকের আনুপূর্বিক কবিতার খাতা থেকে সংগৃহীত তাঁর জীবনের সুরু থেকে শেষ পর্ব পর্যন্ত নামাঙ্কিত ও নামহীন সবমিলিয়ে অর্ধ শতাধিক কবিতার একটি সংকলন বাংলা কথা সাহিত্যে জীবন-সংগ্রামমুখী, সাহিত্যদর্শনে দায়বদ্ধ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী রূপকার অনন্য মানিকের কবিতা লেখার সাধ-সাধনা ও সাধ্যের এক অভিজ্ঞানের জগৎ বাংলা কবিতার পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছে। এ প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসার।

'প্রথম কবিতার কাহিনী' নামের কবিতার মধ্যেই মানিকের কবিতার স্বভাব ও চরিত্রের হদিস পাওয়া সম্ভব। লেখার জীবন সুরু থেকেই কবিতা রচনার ধারা ক্ষীণভাবে হলেও প্রবহিত হয়ে আসছিল তবে মানিক জীবনের শেষ আট-দশ বছরই তাঁর কবিতার শ্রেষ্ঠকাল। গল্প-উপন্যাসের বহু বিস্তৃত প্রেক্ষাপটেই মানিকের জীবন-সংগ্রামী অভিজ্ঞতার নিরীক্ষণের স্ফুরণ ঘটেছে তবু সেই মঞ্চ থেকে ইচ্ছাকৃত ভাবেই তিনি হঠাৎ, হঠাৎ প্রস্থান করে জীবন-নাট্য-পালার বিবেকের মতো, দ্রষ্টার মতো মাঝে মাঝে কিছু কবিতা লিখেছেন। তাঁর দেখা পরিবেশের নানা পরস্পর বিরোধী অবস্থা কবিকে অভিমানী করেছে, ক্ষুব্ধ করেছে। বাংলা কথাসাহিত্যের মতো কবিতাতেও তিনি অজস্র কেনর ফুল ফোটাতে চেয়েছিলেন। সাজানো গোছানো কবিতা তিনি লিখতে চাননি। তাঁর জীবনচরণের মধ্যেও সাজানো গোছানো ব্যাপারটাই ছিল না। জীবনধারণের, জীবন সংগ্রামের মাটির ধরা-ছোঁয়ার বাইরের জগতে কবিতার বসবাস বলে কবি মানিক কখনও ভাবতে পারেননি। তাই তাঁর সময়ের এবং গতানুগতিক ধারার প্রেম-প্রেম, মিষ্টি-মিষ্টি, নিরাবলম্ব বায়ুভুক্ আদুরে কবিতার বিরুদ্ধে কবি মানিক গর্জে উঠেছেন। তিনি দেখেছেন অনেক কবিই যেন সেই নবাব-বাদশাহের দরবারী কবির মতো খোসামুদে, প্রভুর নির্দেশেই যেন তাঁরা কবিতা লিখে চলেছেন। এই অন্তঃসারশূন্য কবিতার আসরে মানিকের যোগ দেওয়া অসম্ভব। কবির জীবনে চলেছে নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব-সংঘাত। সর্ব-সময়েই অপরাজেয় মানিক মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন। মনের মতো জীবনের অর্থ খুঁজতে খুঁজতে, বাঁচার অর্থ-তাৎপর্য নির্মাণ কল্পেই কবি অবিরত কাজে নিযুক্ত থেকে আহ্বান করেছেন :

> "বসন্ত ডেকে এনে
> গেয়ে যেতে হবে সারা বসন্তে জয়গান
> জগতের কোকিলদের সাথে গলা মিলিয়ে।
> অনেক আলো জ্বালতে হবে মনের অন্ধকারে
> সুর মেলাতে হবে অনেক বেসুর শানায়ের
> অনেক ভাঙা পাঁজর জোড়া দিয়ে
> শুধরে নিতে হবে অনেক গান।"

নিজের ব্যক্তিক চৌহদ্দির ভাবের ঘর থেকে নেমে এলেন কবি সংসারে

সমাজে একেবারে বসতির মধ্যিখানে। চাষী মজুরের সাথে যোগে ভুগলেন, উপবাস করলেন, পান করলেন জীবনের অমৃত-গরল। দেখলেন তাঁর আশে পাশে অনেক মুখের মুখরতা, পোষা পাখির শেখানো বুলি, 'চোখ বোজা ভয়ে মুখে মন রাখা হাসি', বুঝলেন 'অশ্রুজলে ফলে না ফসল', 'নিত্য আত্মহত্যা করি বুদ্ধির ছুরিতে', 'বন্ধুরা মুখোশপরা বুদ্ধিজীবী জীব', 'জন্মভূমি বিদেশের মতো', 'মায়েদের মাসিদের অবসাদ-বিষাদ বেদনা', 'রোগ শোক ক্ষুধা ব্যথা বঞ্চনা হত্যা', 'জানিনা কোথায় থাকে আত্মীয়স্বজন', 'শীতে-মরা উপবাসী বাঁকা চাঁদখানি' বা 'ভূমানন্দে পরিস্রুত কঙ্কালের হাসি', ইত্যাকার সব তীক্ষ্ণ সঞ্জাত মিশ্র অনুভব হাতে নিয়ে জীবনের প্রথম দিকে কবিতার উপর বীতশ্রদ্ধ হলেও কবি আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করলেন যে, তথাপি জীবনের সকল ইতিকথার সকল পরিণাম হল কবিতা। জীবনের সমস্ত অন্ধকার-অত্যাচার-অনাচার-অবিচার-বৈষম্য-মেকি-ভণ্ডামী-দূর করে এক সুখী সমৃদ্ধ শ্রেণী শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করার সংগ্রামের শরিক হয়ে উঠলেন কবি। শুনতে পেলেন :

> "বিশ্বজয়ী স্নেহের দাবিতে বাপ ভাই আত্মীয় সুহৃদ
> আমারে করেছে আমন্ত্রণ।"

চাইলেন :

> "মহা সম্ভাবনাময় যে মহাবিপ্লব
> আমি তারই আত্মীয়তা চাই
> তার পিতা, তার ভ্রাতা, তার সার্থকতাদাতা
> একমাত্র আমি, আমি তারে বাঁচাব আঁতুড়ে,
> আমি চিকিৎসক।"

কবি অনুভব করলেন :

> "ওরা আমায় বলল মূক তো কেউ নয় ?
> মেয়ে-মাঝি, চাষী, বস্তির ছেলে ?
> ওরা হাসে কথা কয় সুরে গান গায়
> যুদ্ধের ভাষায়।"

কে যেন ডেকে বলল : "এসো সাথী, একার আলাপ ছেড়ে এসো"। একার আকাশ থেকে নেমে এলেন কবি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুঝলেন "এবার লিখতেই হবে কবিতা আর সময় নেই।"

তিন ॥ তখন সমগ্র পৃথিবীতে এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। পৃথিবী জুড়ে

সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিবাদী শক্তি বীভৎস চেহারা নিয়ে তার কালো হাতের থাবা বিস্তার করেছে। ফ্যাসিস্ট ইতালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করলো। পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মুসোলিনীকে সমর্থন জানালো। ঘৃণ্য জাতি বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে দেওয়া হল। জার্মানীর চান্সেলার হয়ে গদিতে বসলো আর এক ফ্যাসিস্ট নেতা হিটলার। হিটলারের নাৎসী বাহিনী জার্মান পার্লামেণ্ট রাইস্টাগে আগুন লাগিয়ে দেশের কমিউনিস্ট ও গণ-তান্ত্রিক শক্তির উপর দোষ চাপিয়ে গণহত্যা স্বরু করল। পৃথিবীর সমস্ত বিবেকী শিল্প সাহিত্যের বহ্ন্যুৎসব করা হল। জাপান সাম্রাজ্যবাদের চীন আক্রমণ। এরই পাশাপাশি সারা বিশ্বের বিবেকবান বুদ্ধিজীবী মানুষেরা প্রতিবাদ ধ্বনিত করলেন। ১৯৪১ সালে হিটলারের রাশিয়া আক্রমণ। বিশ্বের দিকে দিকে সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনের ভয়াবহ চেহারা দেখে বিশ্ব জনমত গঠনের কাজে উদ্যোগ নিলেন রলাঁ-বারবুস-রবীন্দ্রনাথ-গর্কি-আইনস্টাইন প্রমুখ বিশ্বনন্দিত মনীষীগণ। ভারতের মাটিতে ইত:পূর্বে মীরাটের আদালতে মুজফ্ফর আহমদ প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতাদের কণ্ঠের ঘোষণা ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিশেষ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। রাজ্যে রাজ্যে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অমোঘ প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে দেখা দিল ভয়াবহ মন্বন্তর, শহরের রাজপথে সহস্র সহস্র মানুষের ভিক্ষাবৃত্তি। রিলিফের কাজে এগিয়ে এলো কমিউনিস্ট পার্টি। ভারতবর্ষের নানা স্থানে গড়ে উঠলো ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘ, প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ, সোভিয়েত সুহৃত সমিতি, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ইত্যাদি। তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রগতি লেখক সংঘের নেতা। মধ্যবয়সে মানিক সরাসরি কমিউনিস্ট-পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করলেন। সে সময় বাংলা সাহিত্যের আর এক নবীন কবি-প্রতিভা সুকান্ত ভট্টাচার্য কবিতা লেখার সাথে সাথে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়ে রিলিফের কাজে শ্রমিক বস্তিতে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ঘোষণা করলেন এক নতুন ছাড়পত্রের দলিল :

> "এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি
> নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।"

এই কবির জন্য মানিকের অপেক্ষা ছিল বহুদিনের। মার্কসবাদের

বৈজ্ঞানিক দর্শনে দীক্ষিত লেখকের এতাবৎকালের বস্তুবাদ ও ভাববাদের দ্বন্দ্ব কেটে গেল, একাকীত্বের একটুকরো আকাশ ছেড়ে বিশ্বের বিশাল নীলাকাশের তলায় এসে দাঁড়ালেন। মানিকের তখন কবিতায় আহ্বান :

"গাহে পাখি গান গা, দেরে ফুল গন্ধ
শিশির-ভেজা ঘাস বেঁচে থাক
বেঁচে থাক জীবনের রসঘন কবিতা।"

মানুষ তার দুর্দমনীয় চিন্তা-চৈতন্য, বেঁচে থাকার যে দীর্ঘকালীন রক্তাক্ত-সংগ্রাম, মানব চিন্তার সংকট ইত্যাদি মানিকের কবিতার মৌলিক উৎস স্থল। মানিক জীবনের একেবারে সুরুর দিনটি থেকে পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা দুর্ঘটনা, সামঞ্জস্যহীনতা আবার পারম্পর্যময় পদ্মানদীর মাঝির বিশাল ব্যাপ্তি, পুতুলনাচের সুতো হাতে শহরতলীর গলি ঘুঁজিতে ভ্রাম্যমান মানিকের পক্ষে বৈজ্ঞানিক মতাদর্শের শরিক হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। তাই ছিল তাঁর পক্ষে অমোঘ স্বাভাবিকতা। তাছাড়া সে সময় বাংলাদেশে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে হলেও শ্রেণী সংকট দানা বাধছে। পৃথিবীর যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির ক্রূরতা সাধারণ মানুষের চোখ কান খুলে দিচ্ছে। চারি-দিকেতেই তখন কাজের ডাক এসেছে। এ কাজে মানিক সাথে পেলেন কিশোর সুকান্তকে। মানিকের সমগ্র সাহিত্য সাধনার জগতে সুকান্ত নামের এই দুর্দান্ত-মায়াবী-কিশোর মুখের ছবি বারবার ভেসে উঠেছে। প্রথম কবিতার কাহিনীর সূত্রপাত থেকেই দেখা যাচ্ছে :

"তখন আশ্বাস এল একদল বাস্তব কবির
ইতিহাসের সুতোয় যারা মালা গাঁথছে মানের,
জীবন-যুদ্ধের, জয়লাভের, অগ্রসরের, কাজের।"

চার ॥ 'স্বাধীনতার স্বাদ' ও 'ছন্দপতন' উপন্যাসেও একজন কবির কথা আছে, যে কবির স্নায়ু ভাবাবেগে প্লাবিত নয়, জীবন ও জগৎটা যাঁর কাছে শুধুমাত্র স্বপ্নের মায়াময় প্রদোষবেলার আলো আঁধারির খেলা নয়, পরন্তু বেলা দ্বিপ্রহরে ঝাঁ ঝাঁ রোদে পুড়তে পুড়তে পথ হাঁটা বা শ্রাবণ রাতের ঘনঘোর বর্ষণে পরিবার নিয়ে উৎকণ্ঠায় জেগে থাকার মতোই সমগ্র ব্যাপারটা কঠিন কঠোর বাস্তব। 'ছন্দপতন' উপন্যাসের তরুণ কবি নবনাথ বা ,শাধীনতার স্বাদের' মনসুর ও গোকুলের মধ্যে

কৈশোর-উত্তীর্ণ সুকান্তকে যেন আমরা বারবার দেখতে পাই। মানিক বলেছেন: "কবি ছাড়া কবিতা হয় না, কবিতায় আত্মপ্রকাশ না করে কবির উপায় নেই। যে কোনো কবির কবিতা পড়ে বলে দেওয়া সম্ভব কবি আসলে কি রকম মানুষ।" 'স্বাধীনতার স্বাদে' কবি গোকুল একটি কারখানায় ধর্মঘট ও গুলি চালনা নিয়ে লিখতে বসে বলছেন: "প্রাণে আমার আগুন ধরে গেল, রাত্রে কবিতা লিখতে বসলাম প্রাণের সেই আগুনকে একটা কবিতায় পরিণত করব।" এই কবির মুখের এই ঘোষণা তাই আমাদের একান্ত স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। যখন শুনি:

"আমি কবি, শুঁড়ি নই
সস্তা-মদ তৃষ্ণা নিয়ে এ লেখা প'ড়ো না।" বা
"জীবনের সব তৃষ্ণা, সব ঋণ শুধে
সৃষ্টির পেয়েছি অধিকার, দখল করেছি ভবিষ্যৎ।"

কবিতার এইসব আগুনের ফুলকির রমণীয় উত্তাপ ছড়িয়ে আছে নবীন-কবি-সৈনিক সুকান্তের অসংখ্য কবিতায়। এই কবিতা মাটির পৃথিবীতে মানুষেরই জীবনের ঘাম-রক্ত-মাংস-অস্থি দিয়ে গড়া। ভাব-চিন্তা-আবেগ অনুভূতি সবই পার্থিব জীবনের রঙে রসে পরিপুষ্ট। মাত্র একুশ বছরের এঁক নবীন কবি যোদ্ধার অকাল জীবনাবসানে অগ্রজ লেখক কবি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একান্ত কাতর হয়েছেন। লেখক কে? এই প্রসংগে মানিক লিখেছেন:

"দেশের মানুষের মন যোগাতে চেয়েছিল বলে কি আমাদের কিশোর কবি সুকান্তকে দেশের আবাল বৃদ্ধ বণিতা এত ভালবাসে এত সম্মান করে? দেশের মানুষকে সন্তানের মতো দেখে কাব্যের মারফতে তাদের মানুষ করার ব্রত নিয়েছিল বলেই কিশোর কবিকে জাতি পিতার আসনে বসিয়েছে।" একজন অনুজ কবি সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত অগ্রজ সাহিত্যিকের এমন ভালবাসা আস্থা ও শ্রদ্ধার প্রকাশ পৃথিবীর ইতিহাসেও একান্ত দুর্লভ। সুকান্তের জীবনাবসানে 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় প্রকাশিত মানিকের সেই অবিস্মরণীয় কবিতা:

"আমরা রোদ এনে দেব ছেলেটার গায়ে
আমরা চাঁদা তুলে মারব সব কীট
কবি ছাড়া আমাদের জয় বৃথা।

বুলেটের রক্তিম পঞ্চমে কে চিরবে
ঘাতকের মিথ্যা আকাশ ?
কে গাইবে জয়গান ?
বসন্তে কোকিল কেসে কেসে রক্ত তুলবে
সে কিসের বসন্ত ?"

এ কবিতা বাংলা কবিতা পাঠকের মুখে প্রাবচনিক খ্যাতি অর্জন করেছে। অর্জন করেছে শারীরিক রক্তের শরিকানা। সমাজদেহের রক্ত-চোষা কীটগুলিকে মারার জন্যে রোদ্দুরের আবাহন করেছেন কবি। রোদ্দুর আর সূর্য বন্দনা মানিকের কবিতায় ছড়িয়ে আছে আদিগন্ত সোনালী ফসলের মতো। আর শ্রেণী শত্রুর প্রতি প্রকাশিত হয়েছে হৃদয়ের তিক্ততম ঘৃণা। যেমন :

(ক) "হে সূর্য, উত্তাপে শাস্তি পাও! আমারও পাঁজরে কোটি বজ্রের সন্তোষ।"

(খ) "আমারও অত্যাগ্র শাস্তি অনন্ত ঘৃণায়। আমার জনতা ঘৃণা চায়।"

(গ) "তাপদগ্ধ হে সূর্য। শীতে মরা আঁধারকে এত ঘৃণা কর ?"

(ঘ) "আরও কিছু ঘৃণা ধার দাও। আরো দগ্ধ করো/ঘৃণার কবিতা লিখি।"

(ঙ) 'এত রোদ, অগ্ন্যুৎপাত।'

(চ) "মরণেরে ঘৃণা করা প্রাণের আগুনে। জয় চেয়ে চেয়ে।"

(ছ) "লেলিহান শিখার মতো পুঁই ডগা।"

(জ) "তুষের আগুন জ্বলছে ধিকিধিকি।"

এমন উদাহরণ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হওয়াই সম্ভব। সূর্য, আলো, রোদ্দুর, বসন্ত, ঘৃণা শব্দগুলি মানিক-কবিতার নিজস্ব জগতের প্রিয় শব্দাবলী। মানিকের কবিতায় ঘৃণা শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী পবিত্র ঘৃণা। এ ঘৃণা শ্রেণী-শত্রুর বুক বারবার বিদ্ধ করে।

মানিক জীবনের শেষ পর্বের গল্প-উপন্যাসের মতো তাঁর কবিতার জগৎও কিছুটা অগোছালো, অবিন্যস্ত। খুব গোছগাছ করে কিছু ক'রে ওঠা ব্যাপারটাই তাঁর ধাতের বাইরে। সমগ্র মানিক সাহিত্যের সাথে "পৃথিবীর পথে" পরিক্রমারত বিশ্ব পথিক ম্যাক্সিম গর্কীর জীবন দর্শনের অনেক সাদৃশ্য লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যে মানিক ও সুকান্তের মধ্য দিয়ে

ম্যাক্সিম গর্কীর শিল্প-সাহিত্য ও জীবনাদর্শের উত্তরাধিকার বাংলার মাটিতে প্রতিদিনই বেড়ে উঠছে এ সত্য অনস্বীকার্য। মানিকের কবিতায় তাঁর জীবনের দুটি পর্ব অর্থাৎ কমিউনিস্ট হবার আগে ও পরের এই দুই পর্বের চিহ্ন সুস্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান। দুই পর্ব নিয়েই বাংলা সাহিত্যের অপ্রতিরোধ্য যোদ্ধা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

কখনও কবিতার ভাব ও ভাষার সাথে ছন্দের মিল ঘটিয়েছেন আবার কখনও কাটাকাটা লৌকিক ও দেশজ শব্দের ব্যবহারে করেছেন গদ্যধর্মী। কবিতার ছন্দ-মাত্রার শৃঙ্খলা সর্বাংশে মেনে চলার মানুষ তিনি নন। তিনি যা অনুভব করেছেন কত দ্রুত তা মানুষের দরবারে পৌঁছে দিতে পারেন এই যেন তাঁর কাম্য। কি গদ্য সাহিত্যে আর কি কবিতায় মানুষের প্রতি ভালবাসা আর বিজ্ঞাননির্ভর দার্শনিক প্রতীতিবোধেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একক ও অনন্য একথা বারবার উচ্চারণ করতে হয়। বাংলা সাহিত্যে মানিকের প্রসিদ্ধি সন্দেহাতীত ভাবেই তাঁর গল্প ও উপন্যাসে তথাপি তাঁর কবিতার জগতের মানচিত্র সীমাবদ্ধ হলেও তাঁর পর্বতসমান উচ্চতা এবং সাগর সদৃশ গভীরতা সাহিত্যের ইতিহাসে নতুন উদ্যমে মূল্যায়নের অপেক্ষা রাখে। কবিতায় কবি দেখতে চান :

"এবার চাষ করো। গজাও। গজাও বিদ্রোহ
রাশি রাশি। সবাই বাঁচুক—বিদ্রোহে।"

এই বিপ্লবী ভাবনার জন্যই লেনিনের ভাষায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় "an artist truly great".

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

গতানুগতিক ধারায় প্রবন্ধ বলতে যা বোঝায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ ঠিক সে জাতের নয়। প্রবন্ধ সাধারণত হয় মননধর্মী, জ্ঞানাত্মক, জগত ও জীবন সম্পর্কীয় বিচিত্র বিষয় সমৃদ্ধ ব্যক্তিনিরপেক্ষ রচনা। অপরাপর শিল্পকর্মের মত প্রবন্ধকেও মনে করা হয় আদি মধ্য অন্ত্য সমন্বিত নিটোল শিল্পকর্ম। বিশ্ব সাহিত্যে এ পর্যায়ের রচনা মূল্যবান সাহিত্যকর্ম হিসেবে স্বীকৃত।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মূলতঃ বাস্তববাদী সাহিত্যশিল্পী বলে প্রবন্ধ সাহিত্যের এই ধরা-বাঁধা নিয়ম মেনে চলেননি। তাঁর গল্প-উপন্যাসে আমরা যেমন একজন মৌলিক সৃজনশীল শিল্পীর সাক্ষাৎ পাই তেমনি তাঁর প্রবন্ধেও দেখি একজন মননশীল জীবনশিল্পীকে। তাঁর গল্প উপন্যাস যেমন পূর্ব নজীর বিহীন অভিনব জীবন চেতনার দিশারী, তেমনি তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যও স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য উপস্থাপনার মোহ অতিক্রম করে লেখক তাঁর স্বল্পসংখ্যক প্রবন্ধে সাহিত্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কীয় স্বীয় প্রবল প্রত্যয়ের জয়ধ্বজা বহন করে সবলে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাঁর গল্প উপন্যাসে আসন্ন যুগ জীবন এবং যুগমানসের তর্কাতিক্রান্ত জীবনচিন্তাকে আমাদের খুঁজে নিতে হয়, কিন্তু প্রবন্ধ সাহিত্যে সে প্রগতিশীল চিন্তাধারা উজ্জ্বল সূর্যালোকের মত স্বয়ম্প্রকাশ। সে চিন্তার অভিব্যক্তি কোথাও ধোঁয়াটে বা অস্পষ্ট নয়। শাণিত তরবারির বিদ্যুৎঝলক তাঁর প্রতিটি প্রত্যয়দীপ্ত কথায়। তাঁর প্রতিটি প্রবন্ধ বক্তব্যপ্রধান। সে বক্তব্য একান্তভাবে লেখকের সাহিত্যজীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। অভিজ্ঞতার আলোকে লিখিত বলে তাঁর প্রতিটি প্রবন্ধই সত্যোপলব্ধিজাত সুতরাং মূল্যবান। গতানুগতিক প্রাবন্ধিকের মত তিনি কথায় কথায় কোন পূর্ব নজীরের উল্লেখ করেননি, কিংবা রচনাকে ফুটনোট কণ্টকিত করে পাণ্ডিত্য প্রকাশের প্রয়াস পাননি। স্বচ্ছন্দ সাবলীল বক্তব্য উপস্থাপনায় প্রবন্ধ সাহিত্যেও তিনি শিল্পী। প্রতিটি বক্তব্য রাখবার আগে মনে হয় তিনি ভাবছেন। চিন্তাপ্রধান বলে তাঁর প্রত্যেকটি কথা পাঠককেও

ভাবিয়ে তোলে। সাহিত্য চিন্তায় নতুন ভাবনা ও চেতনার জগতে বিচরণ করেছেন বলে তাঁর মুষ্টিমেয় সাহিত্যসম্পর্কীয় প্রবন্ধ এমন একটি দুর্লভ স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বাংলা সাহিত্য জগতে যা অনন্য। এই অনন্যতার জন্যই তাঁর সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি বিস্তৃত বিশ্লেষণ এবং আলোচনার দাবী রাখে।

২

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র প্রবন্ধ গ্রন্থ 'লেখকের কথা' প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯৫৭ সনে। গ্রন্থখানি ক্ষুদ্রকায়, মাত্র ১৩২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। বিভিন্ন সময়ে লিখিত ছোট বড় মাত্র ষোলটি প্রবন্ধ নিয়ে গ্রন্থখানি সংকলিত হয়েছে। আকারে ক্ষুদ্র হলেও গ্রন্থখনি ওজনে ভারী। আধুনিক যুগের একজন মৌলিক প্রশ্নমনস্ক সাহিত্যিকের চিন্তাসমৃদ্ধ বলে গ্রন্থখানি বিশেষ মূল্যবান।

লেখকের কথার প্রবন্ধগুলি মুখ্যত আধুনিক সাহিত্যের সমস্যা সম্পর্কিত। প্রবন্ধগুলি আত্মজৈবনিক পদ্ধতিতে লিখিত হওয়ায় লেখকের বক্তব্যের আবেদন পাঠক মনের ওপর প্রত্যক্ষ ও তাৎক্ষণিক। প্রথম প্রবন্ধ 'গল্প লেখার গল্প' যদিও কথাশিল্পী হিসেবে লেখকের প্রথম আত্মপ্রকাশের বিবরণ নিয়ে লিখিত তথাপি তাঁর বাস্তববাদী জীবনকাহিনী রচনার উৎস হিসেবে উল্লেখযোগ্য। কলেজ জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ প্রসঙ্গে মানিক লিখছেন :

"কলেজ থেকে তখনকার বালিকা-বালীগঞ্জের বাড়ীতে ফিরতাম, আলোহীন পথহীন অসংস্কৃত জলার মতো লেকের ধারে গিয়ে বসতাম—চেনা অচেনা কোন একটি প্রিয়ার মুখ স্মরণ করে একটু চলতি কাব্যরস উপলব্ধি করবার উদ্দেশ্যে। ভেসে আসতো নিজের বাড়ীর আত্মীয়-স্বজন আর পাড়া প্রতিবেশীর মুখ, জীবনের অকারণ জটিলতায় মুখের চামড়া যাঁদের কুঁচকে গিয়েছে। ভেসে আসতো স্টেশনে এবং ট্রেনে ডেলি প্যাসেঞ্জারদের মুখ—তাদের আলাপ আলোচনা, ভেসে আসতো কলেজ সহপাঠিদের মুখ—শিক্ষার খাঁচায় পোরা তারুণ্য-সিংহের সব শিশু, প্রাণশক্তির অপচয়ের আনন্দে যারা মশগুল। তারপর ভেসে আসতো খালের ধারে, নদীর ধারে, বনের ধারে বসানো গ্রাম—চাষী, মাঝি, জেলে, তাঁতিদের পীড়িত ক্লিষ্ট মুখ।...আর ওই মুখগুলি মধ্যবিত্ত আর চাষাভুষো—ওই মুখগুলি আমার মধ্যে মুখর অনুভূতি হয়ে চ্যাঁচাতো—ভাষা দাও—ভাষা দাও।"

[গল্প লেখার গল্প, পৃঃ ৪-৫]

মধ্যবিত্ত জীবনের জটিলতা এবং সমাজের সর্বনিম্নস্তরের শ্রমিক, চাষী-মজুর জীবনের অন্তস্পর্শী বেদনা ও রিক্ততা লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই সহৃদয় শিল্পী মানিকের মনকে নিভৃত মুহূর্তে কিভাবে আলোড়িত করে তুলত তার অভ্রান্ত দলিল এই স্বীকারোক্তি। বস্তুতপক্ষে জীবনে বৃহত্তর অভিজ্ঞতার পুঁজি, মননশীল জীবনভাবনা এবং অতলান্ত সংবেদনশীলতার সাহায্যে মধ্যবিত্ত সমাজের 'জীবনের জটিলতা'-কে ওই নামের উপন্যাসে শিল্পরূপ দিয়ে পরবর্তীকালে তিনি বাস্তবধর্মী সাহিত্যের নবদিগন্ত উন্মোচন করেছেন, অখ্যাত অবজ্ঞাত ধীবর জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা বেদনাকে তুচ্ছ মানুষগুলির প্রাকৃত ভাষায় শিল্পরূপের প্রেক্ষাপটে বিধৃত করে উপন্যাসশিল্পী হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন (পদ্মানদীর মাঝি দ্রষ্টব্য)। কলে কারখানায় খেটে-খাওয়া শোষিত বঞ্চিত মানুষের মর্মান্তিক জীবনের ট্র্যাজিক হাহাকার তখনও তাঁর সংগ্রামী চেতনাকে স্পর্শ করেনি। দ্বান্দ্বিক সমাজচিন্তা জগতে প্রবেশের পর সে চেতনাও তাঁর জাগ্রত শিল্পী সত্তাকে আলোড়িত করেছে এবং সেই নিপীড়িত শ্রমিক জীবনের দ্বান্দ্বিক জীবন সমস্যা নিয়ে পরবর্তীকালে যে সমস্ত উপন্যাস রচনা করেছেন বাস্তবধর্মী উপন্যাস জগতে সেগুলি নিঃসংশয়ে অভিনব সংযোজন (বিশেষভাবে উল্লেখ্য সহরতলী)।

গল্প লেখার গল্প-এ মানিক '. স্তব জীবনে নাটকীয় প্রেমের চরম অভিজ্ঞতা'র কাহিনী 'অতসী মামী' নিয়ে বাংলা কথাসাহিত্য জগতে প্রথম আবির্ভাবের কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা দিয়েছেন। সে বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছেন, সমকালীন রোমান্টিক লেখকদের মত গতানুগতিক ফেনানো ন্যাকামিপূর্ণ পচা দুর্গন্ধ ছ্যাবলামিতে ভরা সস্তা রোমান্টিক প্রেমের গল্প লিখতে তাঁর তরুণ শিল্পী মন সায় দেয়নি। প্রথম গল্প লিখতে গিয়েও তিনি নির্বাচন করেছিলেন তাঁর নিজের চোখে দেখ' এক বংশীবাদক শিল্পীর ট্র্যাজিক জীবন—উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য সত্ত্বেও যে জীবনবোধে আছে কথাশিল্পীর চেতনার গভীরতা—যা তৎক্ষণাৎ দরদী কথাশিল্পী সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সশ্রদ্ধ মনোযোগী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

যে কোন নতুন লেখকের পক্ষে সেকালের একজন বহুখ্যাত প্রবীণ সম্পাদকের দেওয়া এই সম্মান তাঁর মাথা গুলিয়ে দেবার পক্ষে ছিল যথেষ্ট। কিন্তু ভবিষ্যৎ মননশীল শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন এই অপ্রত্যাশিত

সম্মান প্রাপ্তিতে বিচলিত হয়নি। সাহিত্যজগতে অভিনব মূল্যবান কিছু দিতে গেলে যে লেখকের অক্লান্ত সাধনার প্রয়োজন—এই সত্যোপলব্ধিকে বেশ জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন মানিক প্রবন্ধের শেষাংশে :

"হঠাৎ একটা গল্প লিখে মাসিকে ছাপিয়ে কি কেউ লেখক হতে পারে? হাত মক্স করতে হয়—কঠিন সাধনায় জীবনপাত পরিশ্রমে মক্স করতে হয়। কেরাণীর বেশী খেটে লিখতে না শিখে জগতে আজ পর্যন্ত একটি ছোট খাট লেখকও লেখক হতে পারেন নি। হঠাৎ কি কেউ লিখতে শেখে, না পারে? সাহিত্য সাধনার জিনিস। এ সাধনার সূত্রপাত কিভাবে হয় অনেক সাহিত্যিকের জীবনে তার চমকপ্রদ উদাহরণ আছে।" [গল্প লেখার গল্প, পৃঃ ৯]

গল্প লেখার গল্প মানিকের সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাতের একটি চমকপ্রদ বিবরণ হলেও এ আত্মজৈবনিক রচনাটির মধ্যে লেখক অর্থপূর্ণ মূল্যবান সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

'কেন লিখি' প্রবন্ধটি আকারে ক্ষুদ্র হলেও (দুই পৃষ্ঠায় সমাপ্ত) জীবনশিল্পী মানিক সৃজনকর্ম সম্পর্কে কতগুলি মৌলিক বক্তব্য উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, সৃজনকর্ম মাত্রেরই প্রেরকশক্তি বহুল-প্রচারিত প্রতিভা নয়, মানসিক অভিজ্ঞতা। লেখকের এ ধরনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের এষণার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে এবং তার কারণও বিশ্লেষণ এবং অনুধাবনযোগ্য। তাঁর মতে কোন লেখক অলৌকিক কোন প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন না। 'প্রতিভা জন্মগত'—প্রতিভাবানদের এ প্রত্যয়ের মূলে আছে 'আত্মজ্ঞানের অভাব আর রহস্যাবরণের লোভ ও নিরাপত্তা।'

বহুকাল-প্রচলিত 'প্রতিভা'-তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দিয়ে বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন সৃজনশিল্পী মানিক সৃষ্টিকর্মের উৎস কোথায় অতঃপর তা নির্ণয় করবার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি বলেছেন, ব্যবহারিক জীবনে আর দশটা নেশার মত সৃজনকর্মও একটা নেশা। নেশা বলতে মানিক বলতে চেয়েছেন অন্তর্নিহিত উন্মাদনা। তাঁর মতে ভাল লেখা নির্ভরশীল লেখকের সেই উন্মাদনা এবং একাগ্রতার ওপর। তিনি মনে করেন, বক্তব্যহীন রচনাকর্ম মাত্রই মূল্যহীন। যে লেখকের মনে বক্তব্যের সঞ্চয় যত বেশী, অপরের মনে তা সঞ্চার করে দেবার জন্য তিনি তত বেশী উন্মাদনা অনুভব করেন।

মানিকের এই সৃষ্টিপ্রেরণাতত্ত্ব জগদ্বিখ্যাত মননশীল শিল্পসমালোচক লিও টলস্টয়ের Infection Theory-র প্রায় অনুরূপ। টলস্টয়ের মত মানিকও মনে করেন, নিজের অভিজ্ঞতার সাহায্যে উপলব্ধ জীবন প্রত্যয়কে অপর মনে সার্থকভাবে সঞ্চারিত করে দেওয়াই আর্ট—Art is Communication। সৃষ্টিপ্রেরণার লক্ষ্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মানিক বলেন:

"জীবনকে আমি যেভাবে এবং যতভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি।...সকলের সঙ্গে আমার জানার এক শব্দার্থক ব্যাপক সমভিত্তি আছে। তাকে আশ্রয় করে আমার খানিকটা উপলব্ধি অন্যকে দান করি।

"দান করি বলা ঠিক নয়—পাইয়ে দিই। তাকে উপলব্ধি করাই। (টলস্টয় কথিত Infection—লেখক)। আমার লেখাকে আশ্রয় করে সে কতগুলি মানসিক অভিজ্ঞতা লাভ করে—আমি লিখে পাইয়ে না দিলে বেচারী যা কোনদিন পেতো না।" [কেন লিখি, পৃঃ ১২]

এই সামাজিক দায়িত্ববোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে শক্তিমান সাহিত্যিক মানিক বিনয় বশতঃ লেখক মাত্রকেই চিহ্নিত করেছেন, 'কলম-পেষা মজুর' বলে। তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি লেখকদের উদ্দেশ্যে এই সাবধান বাণীও উচ্চারণ করেছেন, তাঁর সৃষ্টিকর্ম যদি পাঠকের কোন কাজে না আসে তবে তাঁর লেখনী চালনা নিরর্থক।

এখানে সমাজসচেতন কথাশিল্পী মানিক আধুনিক সাহিত্যিকের কলা-কৈবল্যবাদী (Art for art's sake) শিল্পমতবাদের প্রতিবাদে মননশীল শিল্পী টলস্টয়ের মত উদ্দেশ্যমূলক (Purposive) শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছেন।

'সাহিত্য করার আগে' প্রবন্ধে প্রশ্নমনস্ক সাহিত্যিক মানিক একটি গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন: 'কোন রকম প্রস্তুতি ছাড়াই কি একজন লেখকের সাহিত্য জীবন শুরু হয়ে যেতে পারে?'

এ প্রশ্নের সুচিন্তিত উত্তরও দিয়েছেন মানিক উক্ত প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন: "না, এ রকম হঠাৎ কোন লেখকই গজান না। রাতারাতি লেখকে পরিণত হওয়ার ম্যাজিকে আমি বিশ্বাস করি না। অনেক কাল আগে থেকেই প্রস্তুতি চলে। লেখক হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসতে আসতেই কেবল একজনের পক্ষে হঠাৎ একদিন লেখক হিসাবে আত্ম-প্রকাশ করা সম্ভব।" [সাহিত্য করার আগে, পৃঃ ১৩]

মানিক মনে করেন, এই প্রস্তুতি ক্রিয়াটা চলে লেখকের অলক্ষ্যে—যেহেতু সে ক্রিয়া লেখকের সামগ্রিক জীবনচর্চার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মানিক বলেন, "সাহিত্য জীবন আরম্ভ হওয়ার পর সংস্কার ও স্বপক্ষপাতিত্ব বর্জন করে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে নিজের অতীত জীবন বিশ্লেষণ করলে প্রস্তুতিটা কিভাবে ঘটেছিল তা কম বেশী জানা প্রত্যেক লেখকের পক্ষেই সম্ভব।" [তদেব, পৃঃ ১৩-১৪]

সাহিত্যিকের প্রস্তুতির জন্য বৈজ্ঞানিক জীবন-জিজ্ঞাসাটাই যথেষ্ট নয়, জীবনঘনিষ্ঠ সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিতিও অত্যাবশ্যক। মানিকের মতে সাহিত্য জীবন সংগ্রামের হাতিয়ার। সে হাতিয়ারের সাহায্যে জীবন-সংগ্রামকে সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নেবার জন্য সমাজের উত্থানপতনশীল দ্বান্দ্বিক ইতিহাসের সঙ্গেও লেখককে পরিচিত হতে হবে। আলোচ্য প্রবন্ধে মানিক স্বীকার করেছেন, মার্কসবাদে দীক্ষিত হবার পর নিজের সৃষ্টির ভ্রান্তি, বিভ্রান্তি এবং মূল্যহীনতা সম্পর্কে তিনি সচেতন হয়েছেন। এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, একমাত্র মার্কসবাদই মানুষকে অগ্রগতির নির্ভুল পথ-নির্দেশে সক্ষম। এই মার্কসবাদ চর্চাই নিজের সৃষ্টির অপূর্ণতার দিকে তাঁর মনোযোগী-দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

বাল্যকাল থেকে জীবন-বাস্তবতা সম্পর্কে মানিকের মনে যে অতৃপ্ত জিজ্ঞাসা জাগ্রত হয়েছিল তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন 'সাহিত্য করার আগে' প্রবন্ধে। নেহাৎ বালক বয়সে ভদ্র জীবনবৃত্তের বাইরে শ্রমজীবী দরিদ্র জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচিতি মানিককে বাস্তবতার উলঙ্গ রূপের একেবারে মুখোমুখি করে দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রজীবনের অনেক বাস্তবতা যে কৃত্রিমতার আড়ালে আবৃত থাকে সে সম্পর্কেও তিনি অবহিত হন। অকৃত্রিম বাস্তববোধের প্রভাবে শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মীর প্রেমের অবাস্তবতা তাঁর নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালার শোষক রূপ কবির সৃষ্টিধর্মী চেতনাকে জাগ্রত না করে শুধুমাত্র পিতৃ-হৃদয়ের বেদনাকে কেন স্পর্শ করল এ নিয়ে তাঁর জিজ্ঞাসা জেগেছিল মনে। কল্লোল-কালিকলমীয় আধুনিক সাহিত্যিকের বিদ্রোহের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন শুধু একটু ভাববাদী আদর্শ। এমনকি শৈলজানন্দের গ্রাম্য জীবন এবং কয়লাখনির জীবনের ছবির চিত্রময়তা এবং বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে সংঘাতের অভাব তাঁর বাস্তববাদী চেতনাকে পীড়িত করেছিল। তিনি

উপলব্ধি করেছিলেন, সেকালের আধুনিকপন্থী লেখকের রচনায়, বস্তির জীবন ও পরিবেশকে আশ্রয় করে রূপ নিয়েছে মধ্যবিত্তেরই রোমান্টিক ভাবাবেগ। আলোচ্য প্রবন্ধে মানিক স্বীকার করেছেন, 'ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সাহিত্যে আমাকে বাস্তবকে অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিল।'

বলাবাহুল্য, মানিকের সমাজ বাস্তবতাবাদী প্রগতিশীল সাহিত্যের মর্মমূলে প্রবেশ করার চাবিকাঠি নিহিত রয়েছেন তাঁর এই স্বীকৃতির মধ্যে।

৩

লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর বাঙালী লেখকের বহুমুখী বাস্তব সমস্যা চিন্তাশীল মানিকের মনে আলোড়ন তুলেছিল। সুশৃঙ্খলভাবে গ্রথিত না হলেও 'লেখকের সমস্যা' প্রবন্ধে তিনি সে মৌলিক সমস্যাগুলিকে নিঃসংকোচে উপস্থাপিত করে লেখক ও পাঠকের চিন্তা জাগ্রত করেছেন।

মানিক বলেছেন, লেখক জীবনের অস্তিত্বের সমস্যাটা খুব প্রকট হয়ে দেখা দেয় সে দেশে যেখানে নামী লেখকদেরও বই কাটতির সংখ্যা খুব কম এবং বই বিক্রী হয় খুব ধীর প্রক্রিয়ায়। নামী লেখকের পক্ষে এই বাস্তব সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় সাহিত্যিক আদর্শ বিসর্জন দিয়ে তাঁর সৃষ্টি পাঠকপ্রিয় করে তোলা। আদর্শবাদী সাহিত্যিক মানিকের দৃঢ় বিশ্বাস, শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনের জন্য লেখা আদর্শচেতনাহীন সাহিত্যের মান নিম্নাভিমুখী হতে বাধ্য। তবে নিছক অর্থলালসাহীন লেখা মাত্রই কলাকৈবল্যবাদী লেখার সগোত্র নয়। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যাবে না, যে মুহূর্তে লেখক সাহিত্যরচনা কর্মকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন তখনই তাঁর স্বাধীনতা বহুলপরিমাণে সংকুচিত হয়। যেহেতু পেশাদারী লেখককে মালিক-প্রকাশকের স্বার্থ সংরক্ষণ করে লিখতে হয়।

সাহিত্যকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলেও মানিক ছিলেন শিল্পীর স্বাধীনতার একান্ত সমর্থক। তাঁর বিশ্বাস, শিল্পীর স্বাধীনতার সমর্থক লেখক নেহাৎ অস্তিত্বরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের বেশী উপার্জন করতে পারেন না। এ অবস্থায় স্বাধীনতা প্রয়াসী লেখক মালিক-প্রকাশকের নিকট কলম-পেশা কেরাণীর মত শ্রমটুকু মাত্র বিক্রী করতে পারেন, পক্ষপাতিত্ব নয়। এতে স্বাধীনতাকামী বিবেকী শিল্পীর আয়ের অংক হয়তো খুবই

সংকুচিত হবে। কিন্তু তাতে শিল্পীর স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকবে বলেই মানিকের সান্ত্বনা।

এই তো গেল লেখকের জীবন সমস্যার ব্যবহারিক দিক। এখন মানিক সার্থক জীবনশিল্পী হবার জন্য লেখকের যে প্রস্তুতির কথা বলেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে সার্থক লেখক হবার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন লেখকের নিজস্ব একটা জীবনদর্শন। এরূপ জীবনদর্শনের অধিকারী হবার জন্য তাঁকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবন তরঙ্গের ওপরও নিরবচ্ছিন্ন অক্লান্ত পর্যবেক্ষণী জীবনদৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে জীবনকে কিভাবে দেখা হয়েছে তার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে হবে। জীবনদর্শনের স্তরে পৌঁছ'বার জন্য এ শুধু কায়িক শ্রম নয়, এটা লেখকের একটি অক্লান্ত সাধনা। এ সাধনায় শিথিলতা এলে লেখক এবং তাঁর রচনা উভয়েরই অধঃপতন ঘটবে।

মানিককে যাঁরা শুধুমাত্র বাস্তববাদী শিল্পী বলে ঘোষণা করেন তাঁরা তাঁর এই সমুচ্চ সাহিত্যদর্শনের কথা নিশ্চয়ই ভুলে যান।

অতঃপর মানিক প্রতিষ্ঠিত লেখকদের কতগুলি বাস্তব সমস্যার উল্লেখ করেছেন আলোচ্য প্রবন্ধে। লেখককে তাঁর রচনার জন্য যথাযোগ্য মূল্য দিতে পত্রিকা প্রকাশক এবং পুস্তক প্রকাশকদের কার্পণ্য প্রতিষ্ঠিত লেখকদের জীবনে সব চাইতে বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। কিন্তু সাহিত্যিকদের স্বাধীনতা হরণ করবার জন্য মুখ্যত দায়ী বৃহত্তর পাঠক-পাঠিকা গোষ্ঠী, যেহেতু পত্রিকার মালিক এবং প্রকাশকদের মারফতে তাঁরাই তো লেখকের পারিশ্রমিকের জোগান দেন।

লেখকের স্বাধীনতা হরণ ব্যাপারে পাঠক-পাঠিকার কার্যকরী ভূমিকার উল্লেখ করে মানিক লেখক জীবনের সমস্যার ওপর নতুন আলোকপাত করেছেন। মানিকের ধারণায়, লেখক মাত্রই বুদ্ধিজীবী উৎপাদক। উৎপাদক এবং ক্রেতার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ বলে পেশাদারী সাহিত্যিকের নিকট তাঁর সৃষ্ট রচনার চাহিদাটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। সাময়িক পত্রে লিখিত রচনার দক্ষিণা সামান্য বলে পেশাদার লেখককে অনেকগুলি পত্রিকায় লিখতে হয়। বই বিক্রীর সংখ্যা কম বলে তাঁকে ক্রমাগত বহু বই লিখে যেতে হয়।

এই দুই চাপের নিকট নতি স্বীকার করতে হয় বলে লেখকের স্বাধীন সৃষ্টির স্বাধীনতা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। যেহেতু ক্রেতার সংখ্যা বাড়াবার

জন্য লেখকের নিজস্ব বিবেক এবং স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়ে পাঠকপ্রিয় রচনাকর্মে আত্মনিয়োগ করতে হয়। এছাড়া মাত্রাতিরিক্ত লিখতে বাধ্য হওয়ার মানেই হল প্রতিভার অপচয়। সঞ্চিত পুঁজি নিয়ে বেশী লিখতে গেলে পুরানো কথাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নতুন করে বলা ছাড়া আর উপায় থাকে না। এ পর্যায়ের রচনায় আর যাই থাক সাহিত্য সাধনার কোন পরিচয় থাকে না। আমাদের দেশের পেশাদার লেখকের রচনায় সৃষ্টিধর্মিতা এ কারণে খুবই কম। যে সমস্ত দেশে প্রতিষ্ঠিত লেখকদের বইয়ের বিক্রীর পরিমাণ বেশী, জীবিকার জন্য যাঁদের ভাবতে হয় না, একমাত্র তাঁরাই নিশ্চিন্ত মনে সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন। তবে মানিক এ কথাও স্বীকার করেছেন, সে সব দেশের লোকেরাও যদি সাহিত্য সৃষ্টি করে যে পরিমাণ অর্থ পান তাতে সন্তুষ্ট না থেকে ক্রেতার মন যোগাবার জন্য মাত্রাতিরিক্ত রচনা করেন তবে তাঁদের রচনারও সৃষ্টিধর্মিতা ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য।

বাংলা দেশে লেখক জীবনের বাস্তব সমস্যা হল, রচনা কর্মের সাহায্যে জীবিকার সংস্থান করা যায় না বলে লেখককে বাধ্য হয়ে লেখা ব্যতীতও অন্য কর্মে নিযুক্ত থাকতে হয়। তবে জীবিকার জন্য লেখককে অন্য কাজে যে শ্রম ও সময় দিতে হয়, অর্থোপার্জনের জন্য লেখককে সেই অতিরিক্ত শ্রম ও সময় দিতে হবে। বাংলা দেশের বিশেষ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতিতে এ ছাড়া আর অন্য উপায় নেই বলেই মানিকের ধারণা।

মানিকের বিশ্বাস, পশ্চাৎপদ মানুষকে প্রগতির পথে আকর্ষণ করাই সাহিত্যিকের সাহিত্যসাধনার মুখ্য কৃত্য। জীবিকার জন্য লেখা হলেও রচনায় প্রগতিপন্থী চিন্তাধারার পরিচয় থাকা প্রয়োজন। অবসর কালে সাহিত্য রচনা না করে যাঁরা সর্বক্ষণ সাহিত্য রচনায় যত্নশীল, একমাত্র সে পর্যায়ের সাহিত্যিকই দেশের পশ্চাদ্‌পদ মানুষের জন্য সাহিত্যিক কর্তব্য পালনে উদ্দীপনা পান। রচনাকে পণ্য করে যাঁরা স্বাচ্ছন্দ্যলাভের জন্য সক্রিয় তাঁদের বেলায় সাহিত্যের নীতি ও আদর্শনিষ্ঠার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অপরপক্ষে প্রগতিপন্থী বস্তুবাদী লেখক পদে পদে সমালোচনার সম্মুখীন হন। সে সমালোচনায় ভয় পাবার অবশ্য কোন কারণ নেই।

মানিকের লেখক জীবনের সমস্যা বিষয়ক আলোচনা খুব বিস্তৃত,

পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং সুশৃঙ্খলভাবে গ্রথিত না হলেও সে সমস্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে তিনি যে মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন তার উপযোগিতা শুধু বর্তমান কালে নয়, ভবিষ্যতেও স্বীকৃত হবে।

প্রতিভা দৈবপ্রদত্ত কোন ক্ষমতা নয়, কোন বিশেষ কাজে দক্ষতা অর্জন—এমন একটা ধারণার অবতারণা করেছিলেন মানিক ইতঃপূর্বে 'কেন লিখি?' নামক প্রবন্ধে। 'প্রতিভা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি সে ধারণার আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে প্রতিভার স্বরূপ এবং অভিব্যক্তি সম্পর্কে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। মানিকের মতে প্রতিভার মূল কথা হল মনোনিবেশের শক্তি। এই শক্তি বৈজ্ঞানিক এবং লেখকের বেলায় সমানভাবে আত্মপ্রকাশ করে। বৈজ্ঞানিকের মত লেখকও মনেরই চর্চা করেন। মনের সাহায্যেই আধুনিক লেখক আধুনিক বৈজ্ঞানিকের মত মানুষের দাবী সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। নিছক রোমাণ্টিক ভাবাবেগ কিংবা ভূমা তত্ত্ব আজ ভুখা রোগজর্জর মানুষের দাবী মেটাতে যে সমর্থ নয়—এ সত্যের আবিষ্কার আধুনিক লেখকের নতুন অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতার প্রভাবেই আধুনিক লেখক প্রতিভার অলৌকিক মহিমাকে অস্বীকার করে নিজেকে বৃহত্তর গণসমাজের একজন বলে ভাবতে শিখেছেন। মানিকের মতে এতে প্রতিভার মাহাত্ম্য খর্ব হয় না। এ সম্পর্কে তাঁর অকাট্য যুক্তি হল: 'জনসাধারণ না থাকলে কারখানায় উৎপাদনের যেমন মানে হয় না, প্রতিভার উৎপাদনও তেমনি অর্থহীন হয়ে যায়।' [দ্রঃ প্রতিভা পৃ ৫৪] এ কারণে মানিকের একান্ত প্রত্যয়, প্রতিভার জাগরণের জন্য প্রতিভাবানদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল গণমানুষকে আন্তরিক ভাবে ভালবাসতে হবে।

দেশের বৃহত্তর গণজীবনকে মানব মাহাত্ম্যের সমুচ্চ মর্যাদা দিয়ে গণমুখী সার্থক সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা মানিক কিভাবে লাভ করেছিলেন তাঁর উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে প্রতিভা সম্পর্কীয় তাঁর এই তাৎপর্যময় মৌলিক ধারণার মধ্যে।

'উপন্যাসের ধারা' প্রবন্ধে মানিক বর্তমান যুগে সাহিত্যিকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাবে অধ্যাত্ম ও ভাববাদের মোহ কাটিয়ে মানব-জীবনকে তার বাস্তব স্বরূপে উপলব্ধি করা সহজতর হয় বলেই তাঁর সুদৃঢ় প্রত্যয়। বিশেষতঃ ঔপন্যাসিকের বৈজ্ঞানিক বিচারবোধের উপর মানিক

বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন আলোচ্য প্রবন্ধে। নব নব আবিষ্কারে সাহায্যে বিজ্ঞান সমাজ, জীবন, এমন কি *চেতনাকেও নিত্য পরিবর্তনমুখী* করে তুলেছে। এই পরিবর্তিত চেতনা সাহিত্যের নিকট নতুন প্রত্যাশা করছে। মানিক বলেন, আধুনিক যুগের নতুন আঙ্গিকের উপন্যাস মানুষের পরিবর্তিত চেতনাজগতের প্রত্যাশা পূরণের দলিল।

বর্তমান যুগে বস্তুবাদের আশ্রয়ে মানুষের চেতনা বিবর্তিত হয়েছে। এই বিবর্তিত চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে আধুনিক বাস্তববাদী উপন্যাসে। যে কোন ভাব ও ভাবনার বিস্তার উপন্যাসের বৈচিত্র্য বিধান করুকনা কেন, এ যুগের উপন্যাসের ভিতটা যে খাঁটি বাস্তবতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে—এ বিষয়ে মানিক নির্বন্ধ। উপন্যাসের কোন কোন চরিত্র খাপছাড়া উদ্ভট হলেও তাকে মাটির পৃথিবীর মানুষ হতে হবে। সম্ভাব্য ঘটনাকে আশ্রয় করেই ঔপন্যাসিককে অসম্ভাব্যতার স্তরে যেতে হবে। লেখকের কল্পনার সীমা যত সুদূরবিস্তারীই হোক বাস্তবজীবনের আশ্রয়েই সে কল্পনাকে রূপ দিতে হবে। নিজের 'প্রথম গল্প 'অতসী মামীর' রোমান্টিক কল্পনাতিশয্যের কথা স্বীকার করেও মানিক এ সত্য গোপন করেননি যে, এর ভিত্তিমূলে রয়েছে 'মাটির পৃথিবীর দুটি মানুষের বাস্তব প্রেম'।

'সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গ' কিছু বিতর্কমূলক কথাবার্তা দিয়ে শুরু হলেও প্রবন্ধটির মধ্যে লেখক-এর আদর্শ সম্পর্কে মানিক যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষভাবে শ্রদ্ধাযোগ্য। মানিকের মতে সে ব্যক্তিই প্রকৃত লেখক নামের যোগ্য 'পিতার মতো যিনি দেশের মানুষকে সন্তানের মতো জীবনাদর্শ বুঝিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করার ব্রত নিয়েছেন। পিতার মতো, গুরুর মতো জীবনের নিয়ম অনিয়ম, বাঁচার নিয়ম অনিয়ম শেখান বলেই অল্পবয়সী লেখক-শিল্পীও জাতির কাছে পিতার মতো, গুরুর মতো সম্মান পান।' (দ্রঃ, সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গ, পৃঃ ৮৩)। তাঁর মন্তব্যের সমর্থনে মানিক শক্তিমান কিশোর কবি সুকান্তের মানবহিতৈষণাকে নজীর হিসেবে উপস্থিত করেছেন: 'দেশের মানুষের মন যোগাতে চেয়েছিল বলে কি আমাদের কিশোর কবি সুকান্তকে দেশের আবালবৃদ্ধবণিতা এত ভালবাসে এত সম্মান করে? দেশের মানুষকে সন্তানের মতো দেখে কাব্যের মারফতে তাদের মানুষ করার ব্রত নিয়েছিল বলেই কিশোর কবিকে জাতির পিতার আসনে বসিয়েছে।' (দ্রঃ, তদেব, পৃঃ ৮৩)।

লেখক জীবনের পবিত্র কর্তব্য এবং গুরুতর দায়িত্বের কথা মানিকের মত এত গংভীর সুরে এ যুগে খুব বেশী লেখক বলেছেন বলে আমাদের জানা নেই। লেখকের কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা খুব উচ্চ ছিল বলে মানিক বলেছেন,—"দেশের লোকের সস্তা খাতিরকে লেখক-শিল্পী খাতির করেন না। দরকার হলে দেশের মানুষকে কান মলে শাসন করার অধিকার খাটাতে লেখক-শিল্পীর দ্বিধা বা ভয় হবার কথা নয়।" (দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৮৩)। আমাদের যে সমস্ত নামী লেখক সস্তা জনপ্রিয়তার লোভে সাহিত্যের মৌল আদর্শকে অবলীলাক্রমে বিসর্জন দেন তাঁদের নিকট মানিকের এই নির্ভীক মনোভাব হয়ত গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না। কিন্তু প্রবল সত্যনিষ্ঠা এবং দেশের মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার জোরেই লেখক-শিল্পী মানিক নিঃসন্দেহে এমন বলিষ্ঠ উক্তি করতে সাহসী হয়েছিলেন সন্দেহ নেই।

মানিক ছিলেন আধুনিক বস্তুবাদী প্রগতিশীল সাহিত্যের একজন বড প্রবক্তা। এ পর্যায়ের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এবং লেখকের কর্তব্য সম্পর্কে মানিক আলোচ্য প্রবন্ধে যে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন তা অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলেছেন: "বস্তুবাদী প্রগতিশীল লেখক বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন না। বস্তুবাদী লেখক অবশ্যই বাস্তবতার রিপোর্টার নন, তিনি শিল্পী—তিনিও কল্পনার রঙে-রসেই তাঁর কাহিনী রূপায়িত করবেন, কিন্তু মিথ্যার সঙ্গে তাঁর কল্পনার কারবার থাকবে না। এই জন্যই তাঁর বাস্তবজীবনের গতি-প্রকৃতি ভালো করে জানা দরকার—তাঁর কল্পনা যাতে বাস্তবতাকে অতিক্রম করে ফাঁকা আদর্শবাদিতার মিথ্যায় পর্যবসিত না হয়, জীবনবিরোধী হয়ে না ওঠে।" (দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৯১)।

মানিক এখানে বাস্তববাদের সঙ্গে কল্পনার যে সামঞ্জস্যের কথা বলেছেন শিল্পীজীবনে তা কঠিন পরীক্ষার বিষয়। বলাবাহুল্য, মানিক তাঁর নিজের উপন্যাসে সে দুরূহ সামঞ্জস্যবোধের পরিচয় দিয়ে আধুনিক বাংলা উপন্যাসের নবদিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন।

অভিযোগ উঠেছে, প্রগতি সাহিত্য প্রচারধর্মী। মানিক বলেন, 'জীবন বিরোধী' মিথ্যা আদর্শবাদিতা থেকে আত্মরক্ষার জন্যই প্রগতি সাহিত্য প্রচারধর্মী ভূমিকা নিতে বাধ্য হয়েছে। বাংলার সমাজজীবনে যে বৈপ্লবিক রূপান্তর সংঘটিত হতে চলেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রগতি সাহিত্যের

বর্তমান রূপটি অনিবার্য ছিল বলেই মানিকের বিশ্বাস। মানিকের দৃঢ় প্রত্যয়, প্রগতি সাহিত্য প্রচুর সম্ভাবনাময়, দুর্গম পথে সে সাহিত্যের যাত্রা হলেও তার অগ্রগতি সন্দেহাতীত।

প্রগতি সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মানিকের প্রত্যয় দৃঢ় ছিল বলে মানিক এ পর্যায়ের সাহিত্য রচনায় মৌলিক শক্তির পরিচয় দিতে পেরেছিলেন।

'ভারতের মর্মবাণী' প্রবন্ধটি ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়ে রচিত হলেও মানিক লেখক-পাঠক সম্পর্ক নিয়ে একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, পাঠককে স্থূলবুদ্ধি এবং একরোখা ভাববার ফলে লেখকের মানসিকতায় কতগুলি পরিবর্তন সূচিত হয়। এরূপ ভাবনা রচনার সময় তাঁকে নানাভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে বাধ্য করে, ফলে সে রচনায় বলিষ্ঠ অভিব্যক্তির অভাব ঘটে। বস্তুতপক্ষে পাঠকের বিরুদ্ধে যে সংকীর্ণতা ও বিরোধিতার অভিযোগ আনা হয় তা অনেক সময় ভিত্তিহীন। লেখক যদি নিজের এই মানসিক ভীরুতা সম্পর্কে সচেতন হন তবে রচনার মান উন্নত হবে।

'পাঠক গোষ্ঠীর আলোচনা' বিতর্কমূলক হলেও রচনাটির মধ্যে প্রগতি সম্পর্কে মানিকের ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মতে বাংলার চাষী গরীবদের জীবন সাহিত্যের বি.্রবস্তুতে পরিণত করার ওপরই প্রগতি সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। ভাব, ভাবনা ও চিন্তার জগতে ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা বিসর্জন দিয়ে ব্যাপক গণজীবনের অভীপ্সাকে সাহিত্যের পাতায় সার্থক অভিব্যক্তি দিতে পারলে তবেই সে সাহিত্য প্রগতির দিকে অগ্রসর হবে।

'প্রগতি সাহিত্য' প্রবন্ধটিতে নানা আঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রগতিবাদী সাহিত্য আন্দোলনের জয়যাত্রা কী দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে—সে বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন মানিক। মানিক মনে করেন, সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ভাবধারা তখনি শক্তিশালী হয়ে ওঠে যখন শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণ বিপ্লবী চেতনায় উদ্দীপ্ত হন।

পরিশেষে বক্তব্য, আধুনিক মৌলিক চিন্তাশক্তির অধিকারী মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রগতিবাদী জীবনভাবনার প্রতিফলনে বাংলা গল্প-উপন্যাসের ফরম ও কণ্টেণ্টে যে দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তন আনয়ন করেছেন তার উৎসের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে 'লেখকের কথা'য় প্রকাশিত তাঁর ভাব ও ভাবনা-জগতের সঙ্গে প্রথমেই পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। সে হিসেবে 'লেখকের কথা'র প্রবন্ধগুলি মানিকের সৃজনধর্মী শিল্পীমনকে বোঝবার পক্ষে অপরিহার্য উপাদান বলে বিবেচিত হবার যোগ্য।

